

পবিত্র রমজানে ৭৯৩ ইউনিট রক্ত সরবরাহ

পবিত্র রমজান মাসে কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে ৭৯৩ ইউনিট রক্ত সরবরাহ করা হয়েছে। এর মধ্যে হোল সেল ব্লাড ৩৯৬ ইউনিট, রেড সেল কনসেন্ট্রেট (আরসিসি) ২৫৬ ইউনিট, প্লাটিলেট কনসেন্ট্রেট ৬৭ ইউনিট, ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা (এফএফপি) ৪৪ ইউনিট এবং প্লাটিলেট রিচ প্লাজমা ৩০ ইউনিট। রমজানে সংগৃহীত হয়েছে ৪৮২ ইউনিট রক্ত, যার মধ্যে ৬১ ইউনিট সংগৃহীত হয় দু'টি ব্লাট ক্যাম্প থেকে।

বুলেটিন এখন ওয়েবসাইটে

এখন থেকে কোয়ান্টাম বুলেটিনের নতুন যে কোনো সংখ্যা ওয়েব সাইটে পড়া যাবে এবং ডাউনলোড করা যাবে। ওয়েব সাইট : www.quantummethod.org

১৪ জানুয়ারী শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান

আগামী ১৪ জানুয়ারী বুধবার বিকেল ৪টায় কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে প্রথম শত রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এখন থেকে প্রতি মাসেই নতুন একশত আজীবন রক্তদাতাকে আনুষ্ঠানিক সম্মাননা প্রদান করা হবে। উল্লেখ্য যে, দেশে প্রথমবারের মতো সহস্র আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় গত ৬ জুলাই ২০০৩ সালে ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে।

ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসের কর্মসূচি

সিলেটে গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ :
২৯ ডিসেম্বর, ২০০৩ (সোমবার)
সিলেটে ১৭২ ব্যাচের পরিচিতি সভা :
৩০ ডিসেম্বর, ২০০৩ (মঙ্গলবার)
চট্টগ্রামে গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ :
২ জানুয়ারী, ২০০৪ (শুক্রবার)
চট্টগ্রামে ১৭৪ ব্যাচের পরিচিতি সভা :
৩ জানুয়ারী, ২০০৪ (শনিবার)
ঢাকায় ১৭৩ ব্যাচের পরিচিতি সভা :
৭ জানুয়ারী, ২০০৪ (বুধবার)
জানুয়ারীতে মেধায়ন ও সাফল্যায়ন :
৭, ৮, ১৪ ও ১৫ জানুয়ারী, ২০০৪ (বুধ, বৃহস্পতি, বুধ ও বৃহস্পতিবার)
সিলেটে ১৭২ ব্যাচের কোর্স :
৯, ১০, ১১ ও ১২ জানুয়ারী, ২০০৪ (শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)
ঢাকায় ১৭৩ ব্যাচের কোর্স :
১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ জানুয়ারী, ২০০৪ (শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)
চট্টগ্রামে ১৭৪ ব্যাচের কোর্স :
২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬ জানুয়ারী, ২০০৪ (শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)



ভলান্টারী সেফ ব্লাড এপ্রিসিয়েশন কোর্স

১০ হাজার আজীবন রক্তদাতার ডোনার পুল গঠন রক্ত কার্যক্রমের তৃতীয় ধাপ



এপ্রিসিয়েশন কোর্সে আলোচনা করছেন কো-অর্ডিনেটর পাবলিক রিলেশন অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব।

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমকে তৃতীয় ধাপে উন্নীত করার জন্যে ১০ হাজার আজীবন রক্তদাতার এক শক্তিশালী ডোনার পুল গঠনে সর্বাঙ্গিক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বিভিন্ন শাখার ক্যাম্পে রক্ত দানকারীদের নিয়মিত ল্যাবে এসে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে আগামী ২ বছরের মধ্যেই এই লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। তখন ল্যাব থেকে অনায়াসেই প্রতি মাসে কমপক্ষে আড়াই হাজার ব্যাগ রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহ করা যাবে।

গত ৫ ডিসেম্বর ঢাকার সেগুনবাগিচাস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে অনুষ্ঠিত ভলান্টারী সেফ ব্লাড এপ্রিসিয়েশন কোর্সে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে এ কথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। প্রতিষ্ঠার মাত্র তিন বছরের মধ্যে কোয়ান্টাম ল্যাব রক্তের আন্তর্জাতিক মানের আধুনিক ল্যাবে উন্নীত হওয়ায় শুক্রিয়া আদায় করে তিনি বলেন যে, এটা পরম করুণাময়ের অনুগ্রহ এবং

স্বেচ্ছাকর্মীদের নিরলস শ্রমের ফল।

এ কোর্সের মাধ্যমে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট স্বেচ্ছাসেবীগণ এ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও করণীয় ছাড়াও এ কাজের ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা লাভ করেন।

কোয়ান্টাম ল্যাবের কনসালটেন্ট ডা. মুন্সী এম হাবীবুল্লাহ, স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের কো-অর্ডিনেটর পাবলিক রিলেশন অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব, কো-অর্ডিনেটর মোটিভেশন জনাব জহিরুল ইসলাম খ্রিস এবং ডাক্তার মনিরুজ্জামান এতে মূল্যবান বক্তব্য রাখেন।

সারাদিনব্যাপী এই কোর্সে প্রায় দেড়শত প্রো-কোয়ান্টামিয়ার ও অগ্রসর গ্রাজুয়েট অংশগ্রহণ করেন। স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমকে আরো সুষ্ঠু, সুন্দর এবং গতিশীল করতেই এই উদ্যোগ নিয়েছিল কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। সকলের ব্যাপক সাড়া সেই উদ্যোগকে সফলতা দান করেছে।

প্রতিবেদক : মীর নাহিদ মাহমুদ

পরমুখাপেক্ষিতা দূর করতে হবে মোলাজেম হোসেন সাচ্চু

পেশাগত জীবনে আমি একজন সাংবাদিক। গত ৩০ বছরে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন



পেশার লোকের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছে। আমাদের অনেকেই অনেক কিছু করেছি কিন্তু কেউই দেশটাকে সঠিকভাবে গড়তে পারি নি। একটি জাতিকে কিভাবে ঘুরে দাঁড়াতে হবে সেই শিক্ষাই গুরুজী কোর্সের মাধ্যমে দিলেন। বৈদেশিক সাহায্য বা বৈদেশিক ঋণ নয়, আমাদের নিজেদের স্বাবলম্বী হতে হবে। এ চেতনা আমি কোর্সের মাধ্যমে পেলাম। আমাদের পরনির্ভরশীলতার মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে।

[মোলাজেম হোসেন সাচ্চু রাজশাহী থেকে প্রকাশিত দৈনিক সোনালী সংবাদ-এর নির্বাহী সম্পাদক, ১৬১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

তের বছরের ব্যথা উপশম এবং অতিরিক্ত ওজন হ্রাস উন্মে সালমা বেগম

তের বছর ধরে সর্বাঙ্গে ব্যথা এবং অতিরিক্ত মেদের কারণে ফিগারের অসা-মঞ্জস্যতা ও



অধিক ওজনে আমি ছিলাম বিপদগ্রস্ত এবং বিব্রত। অথচ কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে নিয়মিত খাবার নিয়ন্ত্রণ, হিলিং এবং কোয়ান্টাম ব্যায়াম করে ৬ মাসে ১০ কেজি ওজন কমিয়েছি। মাত্র ৪/৫ দিন হিলিং করে ১৩ বছরের শরীর ব্যথা সম্পূর্ণ সেরে গেছে।

উল্লেখ্য মেডিটেশনের মাধ্যমে আমি খাবার বিষয়ে সংযত হয়েছি। এখন আমি অনেক কম খাবার খেয়েও সবসময় একটা সুস্থতার অনুভূতিতে থাকি। সুস্থতার দিক থেকে নিজেকে ২০ বছরের তরুণী মনে হয়। সর্বোপরি ফিগারের সামঞ্জস্যতা ফিরে আসায় মেদভাঁড়ির কারণে বিব্রতকর পরিস্থিতি থেকে মুক্ত থাকার আনন্দ লাভ করছি।

[উন্মে সালমা বেগম ১১৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি ও সংস্কৃত বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল একসময় বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত ‘পবিত্র গীতা পাঠ’ অনুষ্ঠানের নিয়মিত আলোচক হিসেবে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করেছিলেন। সুবক্তা, প্রাবন্ধিক, গবেষক এবং স্বনামধন্য শিক্ষক— এই বহুমুখী পরিচয়ের অধিকারী শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বকে নিয়ে আমাদের এবারের সাক্ষাৎকার প্রতিবেদন।

ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল আত্ম উপলব্ধির পথে প্রশান্ত অভিযাত্রী

তঁার জন্ম এক সাধারণ হিন্দু মধ্যবিত্ত পরিবারে। জন্মস্থান মানিকগঞ্জে। ম্যাট্রিক ও ইন্টারমিডিয়েট পাশের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে আসেন তরুণ মেধাবী ছাত্র হিসেবে। তৎকালীন বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান মো. আব্দুল হাই সেই তরুণকে বললেন, ‘তুমি সংস্কৃত নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছ, নম্বরও ভালো। তুমি আরও কয়েকজনসহ ভর্তি হতে চাইলে আমি বন্ধ হয়ে যাওয়া সংস্কৃত বিভাগ আবার চালু করবো। সে হিসেবে তুমি হবে প্রথম ব্যাচের ছাত্র। আমার বিশ্বাস তুমি ভালো করবে এবং আমি তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে নিতে পারবো।’ শিক্ষকের কথায় পূর্ণ আস্থা রেখে দর্শনে পড়ার ইচ্ছা বাদ দিয়ে সেই তরুণ ভর্তি হলো সংস্কৃত বিভাগে। বাকিটুকু ইতিহাস।

অনার্স-মাস্টার্স দুই পরীক্ষাতেই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ এবং তারপর ভারত সরকার প্রদত্ত বৃত্তি পেয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি ডিগ্রী লাভ করলেন তিনি। প্রথমে ছাত্র এবং পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষক হিসেবে পান মো. আব্দুল হাই এবং বরেন্দ্র দার্শনিক ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেবের অমূল্য সাহচর্য। অন্যান্য জ্ঞান চর্চার ফলশ্রুতিতে সেদিনের সেই তরুণ হয়ে উঠলেন সুবক্তা, প্রাবন্ধিক, গবেষক, সর্বোপরি সবার প্রিয় শিক্ষক ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল।

বিশ্ববিদ্যালয়ে মেধাবী ফলাফলের পর ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল কর্মজীবন শুরু করেন প্রথমে গোপালগঞ্জে এবং পরবর্তীতে রাজশাহী সরকারি কলেজের শিক্ষক হিসেবে। ১৯৬৭ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মজীবনের শুরু থেকেই তাঁর কর্ম ক্ষেত্র হতে থাকে ব্যাপক। শুরু থেকেই তিনি জগন্নাথ হলের আবাসিক শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। এরপর প্রায় দীর্ঘ ২৫ বছর তিনি এ পদে বহাল ছিলেন। এর মাঝে ছ’বছর তিনি হলের প্রাধ্যক্ষের সম্মানিত পদে দায়িত্ব পালন করেন। সংস্কৃত বিভাগেও তিনি অন্যান্য দায়িত্বের পাশাপাশি তিন বছর বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

সুদীর্ঘ কর্মজীবনে তিনি রচনা করেছেন ২টি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ। তাঁর রচিত (সর্বমোট ২০টি) বই স্কুল পর্যায়ে পাঠ্য হয়েছে। মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন ৮টি, ধর্ম বিষয়ে রচিত প্রবন্ধের সংখ্যা চল্লিশোখান। এছাড়া সুবক্তা এবং আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে তিনি বহু ধর্মীয়, সামাজিক আলোচনায় তাঁর প্রজ্ঞার পরিচয় রেখে চলেছেন।

ইন্টারমিডিয়েট পড়ার সময় থেকেই পাঠ্যপুস্তক হিসেবে তিনি সনাতন ধর্মের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ শ্রী গীতার প্রতি আকৃষ্ট হন। এ গ্রন্থের মহান বাণী ড. পরেশকে আলোড়িত করে, তাঁর কৌতূহল বাড়ায়। ছাত্র জীবন ও পরে শিক্ষক জীবনে সাধন তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর কৌতূহলও একইভাবে বাড়তে থাকে। এমন অবস্থায় বড় ছেলে আশুতোষ মণ্ডলের কাছে কোয়ান্টাম মেথডের নাম শুনে ভাবলেন, গিয়ে দেখি কি হয়। রোগমুক্তি, বিশেষ সাফল্য লাভ বা সমস্যা মুক্তির জন্য নয়, বরং জানার আগ্রহে মুক্ত মন নিয়ে তিনি কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশন কোর্সে অংশগ্রহণ করেন।

কোর্সের মাধ্যমে, তিনি দীর্ঘ দিনের কৌতূহল মেটানোর রাস্তা খুঁজে পেলেন। ভারতীয় দর্শন নিজে পড়ার বা ছাত্রদের পড়ানোর সময় ‘যোগ’ এর কথা বারবার এসেছে। সেই তত্ত্বকে বাস্তব অভিজ্ঞতায় আনার কিশিৎ আভাস তিনি পেলেন এতে।

প্রকৃত জ্ঞানী মাত্রই আগ্রহী ছাত্র।



স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ এবং নাতিকে নিয়ে মেডিটেশনে মগ্ন অধ্যাপক ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল



প্রাজ্ঞ পরেশ চন্দ্র মণ্ডলও বুঝলেন, আরো জানার আছে, আরো জানতে হবে। মেডিটেশন চর্চায় তাঁর আগ্রহ আরও গভীর হলো। এ আগ্রহ থেকেই ৭ম ব্যাচের উচ্চতর কোর্সে তিনি অংশ নিলেন। এ ব্যাপারে ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডলের উপলব্ধি, সাধনার পথের শেষ নেই, তবে যতটুকু আমি এ কোর্সে অনুভব করতে পেরেছি, আমার অধীত বিদ্যার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং গুরুজীর প্রদর্শিত পথে চলে তাতে আমি অনেকখানি আত্মশুদ্ধি লাভ করেছি। আমার দীর্ঘদিনের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা কিশিৎ হলেও তৃপ্ত হয়েছে।

তাঁর পরিবারে বড় ছেলে আশুতোষ মণ্ডল একজন কোয়ান্টাম মাস্টার, তাঁর স্ত্রী-পুত্রবধূও প্রাজ্ঞয়ে। ছোট ছেলে কানাডা থাকে। পরিবারের সদস্যদের সাথে একমাত্র নাতি অনিন্দ্য ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে মেডিটেশনে অংশ নেয়।

সংস্কৃত ভাষার ছাত্র এবং শিক্ষক হিসেবে সনাতন ধর্মের তাত্ত্বিক দিক সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান সুগভীর। স্যারের ভাষায় ‘দর্শনীয় বাণী ও কোয়ান্টাম মেথড পরস্পর সম্পূরক।’ আমার ধারণা, যে-ই ধর্ম পথে আছেন, মেডিটেশনের মাধ্যমে তাঁর সেই ধর্ম পালন আরও সুন্দর হবে, সহজ হবে।

দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনে তিনি তরুণ প্রজন্মকে দেখেছেন খুব কাছে থেকে। তিনি বলেন, সমাজে বিপথগামী হবার বহু উপকরণের মাঝে কোয়ান্টাম মেথডের মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা নিজেদের আত্মিক উন্নতি করতে পারবে। এরাই হবে অনন্য মানুষ। একদিকে আসবে সাফল্য, অন্যদিকে আসবে উন্নত মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা— এটি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ড. পরেশ চন্দ্র মণ্ডল। কোয়ান্টাম মেথডের চর্চা তাঁকে দিয়েছে মানসিক প্রশান্তি, জীবনে এসেছে গভীর স্থিরতা। প্রো-অ্যাকটিভ হবার বাণীতে নতুনভাবে উৎসাহিত হয়েছেন, এর চর্চা তাঁর কাজে এনেছে নিপুণতা। সুবক্তা হিসেবেও তাঁর দক্ষতা বেড়েছে। তাঁর ভাষায়, গুরুজীর পথকে অবলম্বন করে কিছু বলতে গেলে বলাটা সহজ হয়, লোকে বলে ভালো বলেছেন। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সদস্যদের কাছ থেকে পাওয়া শ্রীতি এবং শ্রদ্ধা তাঁর জীবনে এক বাড়তি আনন্দের উৎস।

সামনের অবসর জীবনে তিনি মেডিটেশনের চর্চা আরও নিবিড়ভাবে করতে চান। কিন্তু আমরা জানি, একজন পরেশ চন্দ্র মণ্ডল আক্ষরিক অর্থে কখনোই অবসর নেন না। বর্তমান সময়ে তাঁদের অবসর নিতে হয় না। আমরা তাঁর দীর্ঘ কর্মমুখর জীবন কামনা করি।

প্রতিবেদক : সুমন ধর

মান্যবরেণ্য,

আমার শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার গ্রহণ করবেন। আসিফের কাছে আমাদের কথা শুনে থাকবেন। আসিফ আমার স্বামীর প্রিয় ছাত্রদের একজন। আমি যদিও বিজ্ঞানের কিছুই বুঝি না তবুও এই গবেষণাগারে এসে খানিকক্ষণ সময় কাটাই, সেই সূত্রেই ওকে চিনি। ওর মত নম্র, শান্ত, বিনয়ী ছেলে অল্প সময়ের জন্য হলেও কাছে পাওয়া খুবই আনন্দের। আসিফের সাথে আলাপ হবার পর থেকে আপনার কথা অনেক শুনেছি। জানি না আপনার সাথে দেখা হবার সুযোগ, সৌভাগ্য আমার কোনদিন হবে কি না?

আসিফ আমাকে আপনার বই ‘কোয়ান্টাম মেথড’ এবং ২টি ক্যাসেট উপহার দিয়েছে। আপনার নির্দেশ অনুসরণ করে আজ আমার জীবনের এলোমেলো ভাবনাগুলি গুছিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে। আমি যে কতটা তৃপ্তি এবং শান্তি লাভ করেছি চিঠি লিখে সে কথা বোঝাবার ক্ষমতা আমার নেই। প্রতিদিন মনে মনে আপনাকে প্রণাম জানাই। ল্যাব-এ কিছুক্ষণ সময় আমি ‘কোয়ান্টাম মেথড’ বইটি পড়ি প্রায় প্রতিদিনই এবং সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পর ক্যাসেট চালিয়ে আপনার সাথে সাথে নিজের মনের বাড়িতে যাই আলফা স্টেশন থেকে শীতল নীল স্নিগ্ধ আলোর পথ ধরে। এই সমস্ত যাত্রা এবং ফিরে আসাটা আপনি এত সহজ ও সুন্দর করে দিয়েছেন, যেখানে মন-নিয়ন্ত্রণ বা মেডিটেশন করা তেমন কঠিন হয় না।

আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি আপনার অনুমতি ছাড়াই আমার দাদা যিনি ক্যালিফোর্নিয়াতে থাকেন—তাকে বইটির কিছু অংশ লিখে পাঠিয়েছি, আমার পরিচিত অনেককেই বইটি পড়তে এবং অংশবিশেষ লিখে দিয়েছি, ক্যাসেট থেকে রেকর্ড করে দিয়েছি। আমার ইচ্ছা ঘরে ঘরে আপনার বইটির প্রচার এবং সমাদর হোক, সকলে আজকের এই টেনশনময়

প্রবাস থেকে গুরুজীকে লেখা চিঠি

জীবন থেকে বের হয়ে শান্তির সহজ পথ খুঁজে পাক।

আশা করি আপনি ও বাড়ির সকলে ভাল আছেন। সকলকে আমার যথার্থ সম্ভাষণ জানাই। যদি এদেশে আসার কোনো সম্ভাবনা থাকে এবং আমরা যদি আপনার কোনো কাজে লাগি নিজেকে ধন্য মনে করবো।

শিখা সেন

আইআইটি

খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

.....

শ্রদ্ধেয় গুরুজী

আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনি ও মা-জী

ভালো আছেন। মা-জীকে আমার সালাম জানাবেন।

বেশ কিছুদিন পর আজ লিখছি। গত রাতে আপনাকে স্বপ্নে দেখার পর থেকেই চিঠি লেখার জন্যে মনটা অস্থির হয়ে উঠেছে।

আমার লেখাপড়া ও গবেষণার কাজ ভালো চলছে। মাঝে কিছুদিন নামাজ ও মেডিটেশন অনিয়মিত হলেও আবার শুরু করেছি।

গুরুজী, গত ক’মাস ধরে আমার ডান কব্জিতে বেশ ব্যথা অনুভব করছি। ডাক্তার দেখিয়ে ওষুধও খেয়েছি। কিন্তু পুরোপুরি ভালো হয় নি। প্রায়ই ব্যথা ও অস্বস্তি বোধ করি। গুরুজী, আমার জন্যে

দোয়া করবেন।

গুরুজী, বিদেশ থেকে আপনাকে এবং কোয়ান্টাম পরিবারকে যে কী পরিমাণ মিস করি তা ভাষায় বোঝানো যাবে না। উচ্চ শিক্ষার জন্যে বিদেশে এসে আমি যেন আমার পরিবার এবং শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। এতে আমার আত্মিক, আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়তো পিছিয়ে যাচ্ছে। আমার মনে হয় ‘সৎসঙ্কে’ আমার আরও একাত্ম হওয়া প্রয়োজন। মাঝে মাঝে নিজেকে খুবই একা ও দুঃখী মনে হয়।

গুরুজী, কয়েক সপ্তাহ আগে আমার আগেকার ‘লামার’ ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে দেখা পেলাম শাহজাদা মোহাম্মদ ইমরানের। বহুদিন পর একজন কোয়ান্টাম থ্রাজুয়েটকে পেয়ে খুব ভালো লাগছিলো। গুরুজী, আমি জানি, আমেরিকায় অনেক কোয়ান্টাম থ্রাজুয়েট এবং মাস্টার আছেন। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ হলে এবং কথা বলতে পারলে খুব ভালো লাগতো। গুরুজী, যদি সম্ভব হয়, আমার ঠিকানা-ফোন নম্বর তাদেরকে দিতে পারেন।

সকলকে আমার সালাম ও ঈদের শুভেচ্ছা জানাবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন যেন লেখাপড়া ও গবেষণায় চমৎকার ফলাফল করতে পারি।

আপনার স্নেহের,

মোহাম্মদ আখতার হোসাইন

Mohammad Akhtar Hossain

Department of Chemistry

Texas A & M University

College Station Texas

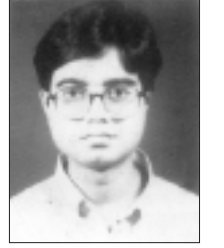
Mailing Address :

402 Nagle St Apt 116

College Station

TX 77840

USA



সফলতার পথে শারীরিক অক্ষমতা কোনো বাধা নয়

ফজলে আকবর তরফদার

জীবনে সফলতার পথে শারীরিক অক্ষমতা কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে না। প্রয়োজন শুধু মনোবল ও ঐকান্তিক ইচ্ছা। এরই বাস্তব প্রমাণ ১৬৭ বছরের থ্রাজুয়েট ফজলে আকবর তরফদার। শুধুমাত্র মনোবলের জোরে শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে সঙ্গী করেই একেবারে সাধারণ অবস্থা থেকে উঠে এসেছেন। পরিণত হয়েছেন একজন সফল ব্যবসায়ীতে।

জার্মানিতে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর উপর পড়াশোনা করছিলেন। কিন্তু হঠাৎ বাবা মারা যাওয়ায় পড়াশোনার পাট না চুকিয়েই তাকে দেশে ফিরে আসতে হয়। বাবা ছিলেন সরকারী চাকরিজীবী। তিনি তার জন্যে কিছুই রেখে যেতে পারেন নি। ২ বছর বেকার থাকার পর ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করেন। ধীরে ধীরে উত্তরণ ঘটতে থাকে। প্রথম দিকে ব্যবসার উন্নতির জন্যে অমানুষিক পরিশ্রম করেন। ফলে Gulen Bare Syndrome নামক ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেহের সকল কর্মশক্তি হারান। দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা চলে যায়। চারদিক থেকে বিপর্যয় নেমে আসে। কিন্তু তিনি মনোবল হারান নি। এক পর্যায়ে

তিনি তাঁর মা এবং স্ত্রীকে নিয়ে পরিজনহীনভাবে একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন। যেহেতু কারো সহযোগিতা তেমনভাবে পান নি— এটাই তার মধ্যে জেদ হিসেবে কাজ করেছে। তাই তিনি আজ একজন সফল ব্যবসায়ী।

নিজের কাজ তিনি নিজেই করতে চেষ্টা করেন। সারাজীবন দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। কিন্তু নিয়তি তাকে এখানে টেনে নিয়ে এসেছে। ঘুরে বেড়াতে তিনি খুব পছন্দ করতেন। হাঁটতে না পারার দুঃখ তিনি সারা দেশে গাড়িতে করে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়ে ভুলেছেন।

প্রয়োজনে এখনও তাকে ৭ তলা পর্যন্ত উঠতে হয়। মিটিং-এ যেতে হয়। সংসারও দেখতে হয়। সবসময় তিনি মনোবল নিয়ে কথা বলেন। গল্পে-হাসিতে মাতিয়ে রাখেন চারপাশের সবাইকে।

কোর্সে তিনি এসেছিলেন কৌতূহলবশত। অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ তার খুব প্রিয়



স্ত্রী ও পুত্র-কন্যার সঙ্গে জনাব ফজলে আকবর তরফদার

শিক্ষক। গত ৬ জুলাই রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে স্যারের উপস্থিতি তাকে কোর্সে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তবে তিনি কোনো সমস্যা নিয়ে কোর্সে আসেন নি। এসেছিলেন কৌতূহল মটোনের জন্যে। কোর্সে গুরুজীর ব্যক্তিত্ব তাকে আকর্ষণ করলো। কোর্সের মাধ্যমে জীবনে চলার যে সূত্রগুলো ও দৃষ্টিভঙ্গি পেয়েছেন তা তার ভালো লেগেছে।

পারিবারিকভাবে তিনি একজন সুখী মানুষ। তিনি ২ সন্তানের জনক। স্ত্রী-পুত্রও কোয়ান্টাম থ্রাজুয়েট। তারা সবাই মিলে প্রতি শুক্রবার শাখায়

যৌথ মেডিটেশনে অংশ নেন। তার মতে, এ কোর্স থেকে জীবনে উপকৃত হওয়া চর্চার উপর নির্ভরশীল। তিনি মনে করেন, মেধা ও দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে কম পরিশ্রমে বেশি সাফল্য লাভ কোর্সের দিক-নির্দেশনাগুলো অনুসরণের মাধ্যমেই সম্ভব।

প্রতিবেদক : সাইফুদ্দিন হাওলাদার অপু

কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনে অংশগ্রহণকারীদের অনুভূতি

কোরআনের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক বিশ্বাসী নর-নারীর জন্যে ফরজ। কিন্তু শুধু তেলাওয়াতের মাধ্যমে এই ফরজ আদায় অসম্ভব। কারণ না বুঝে আরবী তেলাওয়াত করে সওয়াব পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এ বাণীকে যথাযথভাবে অনুধাবন করে এর শিক্ষা জীবনের কাজে লাগানোর যে উদ্দেশ্যে কোরআন নাজিল হয়েছে তা কখনো এতে অর্জিত হয় না। এই উপলব্ধিটা এর আগে কখনো এভাবে হয়নি যা হলো এবার প্রথমবারের মতো কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনে অংশ নিয়ে। কথাগুলো বলছিলেন ১৬৯ ব্যাচের নবীন গ্রাজুয়েট সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব ওসমান আমীন। তিনি আরও বলেন, এ ব্যাপারে আমাদের সচেতনতার যে কী দারুণ অভাব, তার প্রমাণ হচ্ছে জীবনের এতটা বছর শিক্ষাগত বা পেশাগত জীবনের প্রয়োজনে বিশাল বিশাল গ্রন্থ পড়ে শেষ করলেও মহাগ্রন্থ কোরআনকে বুঝে পড়ার জন্যে সময় দিতে পারি নি। এমনকি আমাদের ছেলে-মেয়েদেরও আমরা শুধু তেলাওয়াতই শেখাই। অথচ ধ্যানের স্তরে কোরআন অনুধাবনের এই ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠানে এসে আমার কোরআনকে জানার এবং মানার আকৃতি বেড়ে গেছে।

জানার এবং মানার আকৃতি সৃষ্টির যে অনুকূল পরিবেশ দরকার তার আদর্শ রূপ যেন খতমে কোরআনে র আশ্রয়ের আয়োজন। বললেন কম্পিউটার বিজ্ঞানের ছাত্র নাকিস ফারুক। কারণ প্রতিদিন সাড়ে ছয় ঘণ্টা করে



নাকিস ফারুক

আটদিনে ৪৫ ঘণ্টার এই প্রোগ্রামে অংশগ্রহণকারীরা কোরআনকে অর্থসহ শোনেন ধ্যানের স্তরে এবং পূর্ণ মৌনতার মধ্যে। বিস্ময় মৌনতার এই ফ্রিকোয়েন্সিই হয়তো হৃদয়ের দরজা উন্মুক্ত করে। যে কোরআন নাখিল হয়েছিলো মহানবী (স.)-এর হৃদয়ে, ধ্যানের স্তরে, সেই কোরআনের বাণী তাই তখনই মানার আকৃতি জাগায় যখন তা একজনের হৃদয়ে পৌঁছায়— বলেন নাকিস ফারুক।

সেইসাথে প্রয়োজন মুক্ত মন। কারণ মুক্ত মনের বদলে নিজস্ব ধ্যান-ধারণা দিয়ে যদি কোরআনকে বুঝতে যাই তবে তা হয়তো সংশয়কেই বাড়াবে। এ অনুভূতিই ব্যক্ত করলেন শিক্ষার্থী তসলিমা নাসরীন। কারণ নিজস্ব ধ্যান-ধারণা আসলে গড়ে ওঠে পরিবার বা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার আদলে যা বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী ও



ওসমান আমীন

শোষণ চক্রের হীন স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্যেই পরিকল্পিত হয়েছে। কাজেই অনেক বিতর্কিত বিষয় নিয়ে লিখিত টেক্সটবুকের বক্তব্যকে আমরা অবলীলায় মেনে নিলেও সংশয় এবং প্রশ্ন ব্যক্ত করি কেবল কোরআন শুনতে গিয়ে। গুরুজীর এ বক্তব্যকে সমর্থন করে তসলিমা নাসরীন বলেন, মুক্ত মনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণের ফলে প্রথমবার খতমে কোরআনে অংশ নিয়ে আমার মনে যে প্রশ্ন ছিলো ২য় বার তার অনেকগুলোই আর হয় নি। কোরআনের মাধ্যমে আমি যেন আমার জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছি।

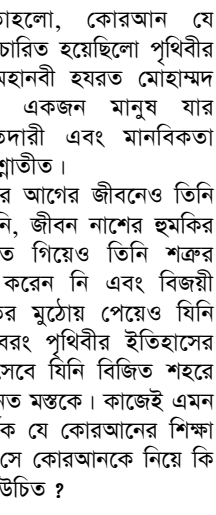
কোরআন সম্পর্কে কৌতূহলী মানুষদের আশ্বস্ত করার জন্যে যে অকাটা যুক্তি নতুনভাবে উপলব্ধি করলেন আখেরী দোয়ার অনুষ্ঠানে গুরুজীর বক্তব্য থেকে, সে সম্পর্কে বলেন ‘এ’ লেভেলের ছাত্র কাজী নেওয়াজ ইবনে মাহতাব ইবনে মাহতাব। তাহলো, কোরআন যে মহামানবের মাধ্যমে প্রচারিত হয়েছিলো পৃথিবীর মানুষের কাছে সেই মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স.) ছিলেন এমন একজন মানুষ যার সত্যবাদিতা, আমানতদারী এবং মানবিকতা ছিলো শত্রুর কাছেও প্রশংসিত।

স্রষ্টার বাণী প্রচারের আগের জীবনেও তিনি কখনো মিথ্যে বলেন নি, জীবন নাশের হুমকির মুখে দেশত্যাগ করতে গিয়েও তিনি শত্রুর আমানতের খেয়ানত করেন নি এবং বিজয়ী হিসেবে শত্রুকে হাতের মুঠোয় পেয়েও যিনি প্রতিশোধ নেন নি। বরং পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম সমর নায়ক হিসেবে যিনি বিজিত শহরে প্রবেশ করেছিলেন অবনত মস্তকে। কাজেই এমন একজন মহামানব কর্তৃক যে কোরআনের শিক্ষা বাস্তবায়িত হয়েছিলো, সে কোরআনকে নিয়ে কি আর কোনো প্রশ্ন থাকা উচিত?

আসলে মানুষের জীবনকে জ্ঞানী করা এবং তাকে জীবনের দিক-নির্দেশনা দানই কোরআনের উদ্দেশ্য। এ সত্যটি খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করলাম গুরুজীর আলোচনা থেকে। বললেন তরুণ শিক্ষার্থী নাহিয়ান বিন জলিল। আর বুঝলাম, কোরআন বিজ্ঞান বিরোধী কোনো বিষয় নয়। বরং বিজ্ঞান যেরকম মানুষের জীবনকে সহজ, বর্ণাঢ্য ও আরামদায়ক করে, কোরআনও তেমনি জীবনকে সহজ, সুন্দর, ইনসাফপূর্ণ ও প্রশান্তিময় করে।



কাজী নেওয়াজ ইবনে মাহতাব



নাহিয়ান বিন জলিল

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং পবিত্র কোরআনকে বিজ্ঞানময় কোরআন বলে অভিহিত করার তাৎপর্য হয়তো এখানেই।

গৃহিণী সাদিয়া শবনম শাহু এই উপলব্ধিকেই খুব সংক্ষেপে বললেন, কোরআনে বার বার সহজ সরল পথে চলার জন্যে উদ্বুদ্ধ করে বলা হয়েছে এটাই আল্লাহর পথ। আমিও এটা বিশ্বাস করি কারণ বিভিন্ন সময় অন্যভাবে চলতে গিয়ে সমস্যা-আক্রান্ত হয়ে আবারও বুঝেছি আল্লাহ নির্দেশিত সোজা পথই সাফল্যের সঠিক পথ।

শিক্ষার্থী ফাহিমা বলেন, কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনের মাধ্যমে আমার জীবনের অন্ধকার দিক আজ আলোকিত। আল্লাহর কালাম থেকে আমি শিখেছি ইহসান, পরোপকারিতা, অন্যের প্রতি মমত্ববোধ। আমি জেনেছি মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, ভাই-বোন এবং এতিমদের প্রতি আমার কর্তব্য সম্পর্কে। সীমাহীন কৃতজ্ঞ হয়েছি আমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ দেখে।

গৃহিণী নাজমা বেগম বলেন, কোরআন থেকে হেদায়েত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কারা অগ্রবর্তী হবে তা কোরআনেই আল্লাহ বলে দিয়েছেন— যারা অদৃষ্টে বিশ্বাস করে, সংকাজ করে, নিজের উপার্জন থেকে খরচ করে এবং নামাজ আদায় করে। অর্থাৎ কোরআন থেকে উপকৃত হওয়ার শর্তের মধ্যে একটি হলো সদকা বা দান এবং এটি ফরজ হিসেবে গণ্য।

খতমে কোরআনে অংশ নিয়ে এই বিষয়টি উপলব্ধি করার পর দানের ব্যাপারে আমি এখন অনেক সচেতন।

নামাজ নিয়ে উপলব্ধির কথা বলেছেন গৃহিণী বাহালী ইফতেখার। তিনি বলেন, গুরুজীর আলোচনা থেকে যখন জানলাম, কোরআনের শিক্ষায় করণীয়ের মধ্যে নামাজ হলো প্রথম। কিন্তু আমরা কেন নামাজ পড়তে হবে তা-ই বুঝি না। আমরা নামাজ পড়ি শান্তি থেকে মুক্তি লাভের জন্যে। কিন্তু নামাজ যে আল্লাহর সাথে দেখা করার, কথা বলার মাধ্যম— এই সচেতনতা যদি আসতো, যদি মনে করতে পারতাম এই সিজদাই হয়তো আমার শেষ সিজদা, আর সুযোগ হয়তো না-ও পেতে পারি, তখন প্রতিটি সিজদাই যেন হতে পারতো মেরাজ। স্রষ্টাকে তখন অনুভব করতে পারতাম আমাদের কপালে, হৃদয়ে, সব জায়গায়।



ফাহিমা



নাজমা বেগম

ডিগ্রী পরীক্ষার্থী এমএস আজিজ বলেন, যাকাতের উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র্য বিমোচন আর সংঘবদ্ধভাবে যাকাত আদায়ের মাধ্যমেই একমাত্র তা সম্ভব— এ উপলব্ধি হয়েছে এখানে এসে।

কোরআন একটি সার্বজনীন গ্রন্থ। যুগে-যুগে কালে-কালে মহামানবরা যে বাণী নিয়ে এসেছেন, তারই আধুনিকতম এবং পরিপূর্ণ রূপ হলো কোরআন। তাই এর বাণী থেকে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষই হেদায়াত লাভের সুযোগ নিতে পারেন। কারণ কোরআন নাখিল হয়েছে মানব জাতির কল্যাণের জন্যে। এই সার্বজনীন আবেদনের জন্যেই বরাবরের মতো এবারও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্যেও উন্মুক্ত ছিলো এ অনুষ্ঠান।

যেমন— চন্দ্রজিৎ কুমার বলেন, বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে সাত দিনের প্রোগ্রামটায় অংশ নিতে পারি নি। কিন্তু মোনাজাতে অংশ নেয়ার সুযোগ হাতছাড়া করি নি। কোরআনে র আবেদন যে সার্বজনীন, সে ধারণা আগেও ছিলো, কিন্তু এবার ধারণা আরও পরিষ্কার হয়েছে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী বছর কোয়ান্টায়নে অংশ নেবো এবং তার আগে নিজে নিজে অর্থসহ কোরআন পড়ে দেখতে চাই।

আলোচনা শেষে গুরুজী খতমে জালালি পরিচালনা করেন। স্রষ্টার নিকট ক্ষমা প্রার্থনার আকুলতায় কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন হলভর্তি অংশগ্রহণকারীরা। এক হৃদয়স্পর্শী প্রার্থনার মেডিটেশনে একাত্ম হওয়ার আনন্দ ও তৃপ্তি নিয়ে শেষ করেছেন তারা এই আখেরী দোয়ায় অংশগ্রহণ।

প্রতিবেদক : ফেরদৌসী সুলতানা

আগের প্রক্রিয়া ছিলো গতানুগতিক মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ নূরী

মাদ্রাসা পড়য়া ছিলাম বলে ছোটকাল থেকে কোরআন পড়তাম। এক পর্যায়ে এসে কোরআন থেকে আলোচনা নোট করতাম, বক্তৃতা আকারে পেশও করতাম। কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনের পর মনে হলো আগের প্রক্রিয়া ছিলো গতানুগতিক। ধ্যানের স্তরে কোরআন খতম হলো আমার জীবনের অনন্য অনুভূতিময় উপলব্ধি।

মনে হলো এ কথাগুলো আল্লাহ নতুনভাবে এখনই বলছেন। আমার জন্যেই বলছেন, আমাকে লক্ষ্য করই বলছেন। তাই ধ্যানের স্তরে কোরআন শোনার মজাই আলাদা। *[মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ নূরী হাজী মোহাম্মদ মহসীন কলেজের অর্থনীতি বিভাগে অধ্যয়নরত, ১৬৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]*



চন্দ্রজিৎ কুমার



জানার আগ্রহ পূরণ হয়েছে শ্যামল কৃষ্ণ সরকার

অনেকদিন থেকে সবগুলো ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে জানার এক ব্যাকুলতা ছিলো। কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনে অংশ নিয়ে তাই আমার বহুদিনের একটি স্বপ্ন পূরণ হয়েছে।

বিজ্ঞানের অগ্র-গতির কারণে কোয়ান্টায়নে যে সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত ও তার অনুবাদ শুনতে পেরেছি— এ ব্যাপারটি আমাকে ভীষণভাবে মুগ্ধ করেছে। নবীজীর মতো সদগুণাবলি ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ সম্পর্কে জেনেও মুগ্ধ হয়েছি, যিনি আসলে তুলনাহীন। মোনাজাতের অভিজ্ঞতাও প্রাণ উজাড় করা কল্পনার স্মৃতিতে ভাস্বর।

কোরআনকে জানার তাগিদ বেড়েছে রোকসানা বিলকিস

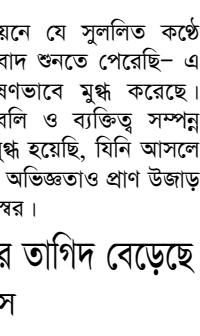
আমি এবার নিয়ে তৃতীয়বারের মতো খতমে কোরআনে অংশ নিলাম। কোরআনের মাধ্যমে আল্লাহ যে নির্দেশনা-গুলো দিয়েছেন, তা পালনের দায়িত্ব আমার— এবারই এ উপলব্ধিটি যেন অনেক দৃঢ় হলো।

কোরআন নারীকে যে মর্যাদা দিয়েছে, তা আজ পর্যন্ত কোনো দেশ, কোনো সভ্যতা, কোনো ধর্মগ্রন্থ দেয় নি। শিক্ষার অধিকার, জীবন-জীবিকার অধিকার, সম্পদের অধিকার, মাতৃভূের অধিকার— ইত্যাদি এমন কোনো অধিকার বাকি নেই যা কোরআন নারীকে দেয় নি। কোরআনে জ্ঞানের এই বিশালতাকে অনুধাবন করার ফলে কোরআনকে জানার তাগিদও বেড়েছে, যার ফলে পুরো কোরআনের ক্যাসেট সংকলনটি যোগাড় করে প্রতিদিন কিছু সময়ের জন্যে ধ্যানের স্তরে তা শুনছি।

[রোকসানা বিলকিস জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমীর সহকারী পরিচালক]

দোয়ার মেডিটেশনে কান্না পেয়েছে –মৌ

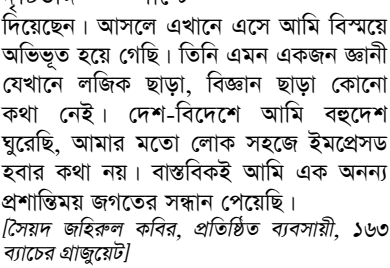
স্কুল পড়য়া ছোট্ট মেয়ে মৌ আখেরী দোয়া অনুষ্ঠানে আলোচনা ও মেডিটেশন খুব ভালো লেগেছে বলে জানিয়েছে। গুর ভাষায়— আলোচনাটা আমি খুব ভালো বুঝেছি আর দোয়ার মেডিটেশনে ভীষণ কান্না পেয়েছিলো।



প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গেছে সৈয়দ জহিরুল কবির

কোর্সে এসে আমার মনে হচ্ছে, প্রতিটি কথা আমি জীবনে প্রথম শুনছি। কেন না গুরুজী তার জীবনের গভীরতম অভিজ্ঞতার কথামালা দিয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিয়েছেন। আসলে এখানে এসে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেছি। তিনি এমন একজন জ্ঞানী যেখানে লজিক ছাড়া, বিজ্ঞান ছাড়া কোনো কথা নেই। দেশ-বিদেশে আমি বহুদেশ ঘুরেছি, আমার মতো লোক সহজে ইমপ্রেশড হবার কথা নয়। বাস্তবিকই আমি এক অনন্য প্রশান্তিময় জগতের সন্ধান পেয়েছি। *[সৈয়দ জহিরুল কবির, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, ১৬৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]*



নামাজে প্রশান্তি পেয়েছি তারেক ফয়েজুর রসুল

আগে নামাজে আমি ম্যাথসের কঠিন সমস্যার সমাধান করতাম। নামাজ পড়ে কখনও আলাদা প্রশান্তি অনুভব করি নি। কিন্তু কোর্সে এসে গুরুজীর কথা মতো মনের বাড়িতে কাবা শরীফ নির্মাণ করে নামাজ পড়েছি। এখন মনে হচ্ছে, আমার জীবনে যত নামাজ পড়েছি, তার মধ্যে এখানকার নামাজই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। এখন নামাজে আমি অন্য রকম প্রশান্তি অনুভব করছি। আগে প্রোগ্র্যাকটিভ দৃষ্টিভঙ্গির চেয়ে নেতিবাচক চিন্তাটা বেশি চলে আসতো। এখন আমি তা দূর করতে পারছি। আমার জীবনের সুন্দর দিক নির্দেশনা দেবার জন্যে গুরুজীকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

[তারেক ফয়েজুর রসুল, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সাইন্সের ছাত্র, ১৬৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ভাইভা-ভীতি দূর হয়েছে আবুল হাসানাত

স্টুডেন্ট ভালো হওয়া সত্ত্বেও আমি ভাইভায় সবসময় খারাপ করি। কেন না শিক্ষকদের সামনে গেলেই আমি সবকিছু গুলিয়ে ফেলি। খুব কষ্ট করে ভাইভায় সেকেন্ড ক্লাসের মার্কস পেতাম। এ নিয়ে আমি সবসময় দুশ্চিন্তা করতাম। কিন্তু এখানে এসে আমার সেই



দুশ্চিন্তা দূর হয়েছে। এখন আমি আত্মপ্রত্যয়ী। আমার ধারণা আরো দু’বছর আগে এ কোর্সটি করা হলে আমি পরীক্ষায় চতুর্থ না হয়ে অবশ্যই প্রথম হতাম।

[আবুল হাসানাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল’ এর ছাত্র, ১৬৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

পরিবারে একাত্মতা বেড়েছে নাজমুন নাহার

গত সাত-আট মাস ধরে পারিবারিক এবং বিভিন্ন সমস্যার কারণে আমার ব্যবহার দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছিলো। বাবা-মার সাথে কেমন যেন একটা দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছিলো। আমি অন্তর দিয়ে ব্যাপারটি অনুভব করতাম কিন্তু তা দূর করার কোনো পথ পাচ্ছিলাম না। কোর্সের প্রথম দিন থেকেই আমার ব্যবহার অনেকটা ইমপ্রুভড হয়েছে। গত রাতে আমি আবার সাথে সুন্দর করে কথা বলেছি এবং আকাঁও আমার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছেন। গত সাত-আট মাস আমি যে কষ্ট বয়ে বেড়াচ্ছিলাম এখানে এসে আমার সে কষ্ট দূর হয়েছে। আগে আমি প্রচণ্ড নার্ভাস ছিলাম। এখন আমি সাহসী এবং আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছি।

[নাজমুন নাহার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.বি.বি.এ-র ছাত্রী, ১৬৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

দেশপ্রেম বেড়েছে ফারাহ বিনতে সাদেক

বর্তমানে আমি বিদেশে লেখা পড়া করছি। আগে ভাবতাম, আমাদের দেশে কোনো ভালো চাকরির সুযোগ নেই, আমি দেশে ফিরে এসে কি করবো। কিন্তু এই চারদিনের কোর্স আমার আগের চিন্তাধারার ভিতটাকে নাড়িয়ে দিলো। এখন মনে হচ্ছে দেশের জন্য আমার অনেক কিছু করার আছে। কেউ দেশে ফিরে আসুক বা না আসুক লেখা-পড়া শেষ করে আমি অবশ্যই দেশে ফিরে আসবো।

এছাড়াও কোর্সে এসে আমি প্রথম উপলব্ধি করলাম, মানুষের জীবনে পরিবার অনেক বড় ব্যাপার। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যে মায়া-মমতা থাকা দরকার এ কথাটি অন্য কাউকে এত সুন্দর করে বলতে শুনি নি। আমি বিশ্বাস করি নিজেকে তৈরি করার জন্য এটি একটা অত্যন্ত চমৎকার কোর্স। শুধু ক্যারিয়ার গঠনের জন্য নয় বরং দেশকে ভালবাসার জন্য এটি একটি অনন্য কোর্স।

[শিক্ষার্থী ফারাহ বিনতে সাদেক ১৬৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



প্রশ্ন : বাবা-মার প্রতি যে ক্ষোভ ছিলো সেগুলো মেডিটেশনের মাধ্যমে দূর করতে পেরেছি। এই ক্ষোভগুলো ছিলো পাওয়া-না-পাওয়া নিয়ে। কিন্তু আমার মায়ের প্রতি বাবার আচরণের কারণে এখন নতুন করে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। মায়ের সঙ্গে বাবা কখনো ভালো ব্যবহার করেন না, সবসময় রেগে কথা বলেন, কখনো কখনো শারীরিকভাবে প্রহার করেন। অন্যদিকে মা-ও ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন না। বাবার সাথে মানসিক দূরত্বের কারণে এসব নিয়ে কথা বলতেও সাহস পাই না। কীভাবে এই সমস্যার সমাধান করবো?

উত্তর : এটি আমাদের অনেক পরিবারের ছেলে-মেয়েদের সমস্যা। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের সামনে নিজেদেরকে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। তোমার বাবাকে সরাসরি বলতে যাওয়া অর্থহীন। তাদেরকে মেডিটেশনে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝাও যাতে তাদের পরস্পরের প্রতি মমতা এবং দায়িত্ববোধ বাড়ে। আর এ ঘটনায় নিজে উত্তেজিত হয়ে বা কষ্ট পেয়ে কোনো লাভ নেই। কারণ বাবা-মার মধ্যকার বগড়া দ্বারা আবেগগতভাবে প্রভাবিত হলে তোমার পড়াশোনা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তোমার দৃষ্টিভঙ্গি হবে, বাবা-মার মধ্যে সম্পর্ক যা-ই থাকুক জীবনে সফল এবং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার যে মিশন তোমার সামনে তা যেন কোনোভাবেই বিঘ্নিত না হয়। কারণ কেবলমাত্র তখনই তুমি তাদেরকে প্রভাবিত করার যোগ্যতা অর্জন করবে।

প্রশ্ন : আমি আমার মাকে নিজের জীবনের চেয়ে ভালবাসি। কিন্তু ততটাই ক্ষোভ-ঘৃণা বাবাকে ঘিরে। আমি যতবারই পারিবারিক মেডিটেশনের মাধ্যমে বা ক্ষোভ ও ক্ষমার মেডিটেশনের মাধ্যমে তার প্রতি আমার ক্ষোভ দূর করতে চাই, দূরত্ব কমাতে চাই, কিন্তু ততবারই তিনি এমন কিছু করেন যাতে আমার ক্ষোভ-ঘৃণা আরও বেড়ে যায়। তিনি আবারও দূরে সরে যান। এ অবস্থায় আমার কি করণীয়?

উত্তর : তুমি বলেছ, তোমার মাকে জীবনের চেয়ে বেশি ভালবাস, কিন্তু ততটাই ঘৃণা করো তোমার বাবাকে। তোমার এই কথাই বাবার প্রতি তোমার অবচেতন আকর্ষণকে প্রমাণ করে। বাবাকেও তুমি তোমার মায়ের মতোই ভালবাস, কিন্তু প্রকাশটা নেতিবাচক। ভালবাসাটা মায়ের কাছে যেভাবে প্রকাশ করতে পেরেছ বাবার কাছে সেভাবে প্রকাশ করতে পার নি বলেই মনে হচ্ছে তোমার বাবাকে তুমি ঘৃণা করো। আর তার বিরুদ্ধে তোমার মনে জমিয়ে রাখা ক্ষোভের কারণেই তোমার বাবাকেও বাস্তবে এমন আচরণ করতে দেখ যা তোমাদের দূরত্বকে আরও বাড়িয়ে দেয়। তাই এই ক্ষোভকে দূর করতে হবে, আর প্রো-অ্যাকটিভ হতে হবে। অর্থাৎ বাবা বাস্তবে যে আচরণই করুন না কেন তোমার লক্ষ্য হবে তাতে কোনরূপ প্রভাবিত না হয়ে বরং তার সাথে সম্পর্কোন্নয়নের জন্যে যা যা করা দরকার তার সব করা।

প্রশ্ন : আমার বাচ্চার বয়স এক বছর। মানুষ করার জন্যে কীভাবে এখন থেকে শিক্ষা দেব জানালা উপকৃত হবে।

উত্তর : এখন থেকে যখনই তাকে কোলে নেবেন, মাথায় হাত বোলাবেন বা তার কাছে থাকবেন, তাকে বলবেন, ‘তুমি খুব ভালো’। সবসময় তার সামনে ভালো কথা বলবেন, বকা দেবেন না বা ‘দুষ্টু’ বলবেন না। বুদ্ধিমান বাচ্চাদেরকে আমরা ‘দুষ্টু’ বলে বলবো না। বুদ্ধিমান বাচ্চাদেরকে আমরা ‘দুষ্টু’ বলে বলবো করে ফেলি। যাকে আমরা দুষ্টুমি বলি তা

অবিদ্যা বিষয়ক আপনার প্রশ্ন

উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

আসলে বাচ্চার দুরন্তপনা। বাচ্চার এনার্জি আছে বলেই এবং সে বাচ্চা বলেই ওভাবে ছুটছে, দৌড়াচ্ছে। বুড়ো হলে তো সে ওরকম করবে না। আপনিও তাই বাচ্চার দুরন্তপনার সঙ্গী হয়ে যান।

এক্ষেত্রে নবীজীর চমৎকার শিক্ষা আছে। একবার তিনি যখন সেজদায় গেলেন, তাঁর নাতি শিশু হাসান এবং হোসেন তার পিঠে চড়ে বসলো। ঘোড়া বানিয়ে দিবা চুল ধরে টানতে লাগলো। নবীজীও তাদের এই আনন্দকে প্রশ্রয় দিয়ে যতক্ষণ তারা নিজেরা না নেমে গেল ততক্ষণ তিনি আর সেজদা থেকে মাথা তোলেন নি। অর্থাৎ তিনি শিক্ষা দিলেন যে, শিশুর সাথে শিশুর মতোই মিশতে হবে।

আর আপনার বাচ্চা যখন একটু বড় হবে তখন তাকে প্রার্থনা করতে শেখাবেন, এতে তার ভালো হবার আগ্রহ ও আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে।

প্রশ্ন : অবিদ্যা পর্ব-২-এ অংশগ্রহণ করার পর থেকে আমার চৌদ্দ বছরের মেয়ে স্কুলের সহপাঠীদের সাথে মিশছে না। ক্লাসে একা একা থাকে। কারও সাথে কথা বলে না। সে বলে ‘বন্ধুত্ব’ করবো না। তার এই আচরণ কি ঠিক হচ্ছে?

উত্তর : সহপাঠীদের সঙ্গে না মেশার ফলে এই মেয়েটি একদিক থেকে গীবত এবং অন্যের আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হওয়া থেকে বিরত থাকতে পারছে। কিন্তু কাউকে বন্ধু মনে না করেও তার সাথে সহজ-স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখা যায়। কেন না এই স্বাভাবিক সম্পর্ক না রাখলে সে কিছুদিন পর একঘরে হয়ে যাবে। অহেতুক কিছু শত্রু বানিয়ে তাদের হিংসা ও বিদ্বেষের স্বীকার হবে। তখন তার নিজের সম্ভাবনাও বিঘ্নিত হতে পারে।

তাই সহপাঠীদের বন্ধু মনে করে তাদের কথায় নাচা নয়, বরং স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত এবং এটাই অনন্য মানুষের বৈশিষ্ট্য।

প্রশ্ন : মা-বাবা অবশ্যই সন্তানদের মনিটর করবেন। কিন্তু তারা যদি আমাদের সব বিষয়েই অহেতুক সন্দেহ করেন তাহলে একসময় দেখা যায় আমরা অন্যায্য কাজটাই করতে শুরু করি। এক্ষেত্রে কি করণীয়?

উত্তর : সন্দেহ নয়, জবাবদিহিতা থাকা প্রয়োজন। এই জবাবদিহিতা হতে পারে মা-বাবার কাছে বা অন্য কারও কাছে বা এমনকি নিজের কাছে। কারণ জবাবদিহিতা যদি না থাকে তাহলে একজন মানুষের সৎ থাকার সম্ভাবনা খুব কম। কিন্তু এই জবাবদিহিতার বিষয়টি অভিভাবকদের নিশ্চিত করতে হবে কৌশলে। কারণ সেই অভিভাবকই সবচেয়ে ভালো মনিটর করতে পারেন, যিনি বুঝতে দেন না যে, তিনি মনিটর করছেন।

আর সন্তানের সঙ্গে যখন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলবেন তখন তাকে আর মনিটরও করতে হচ্ছে না, সে নিজে থেকেই এসে আপনাকে বলবে।

প্রশ্ন : আমার কখনও মনে হয় নি যে, বাবা-মা আমাকে বোঝেন না বা ভালবাসেন না। তাই এ বিষয়ে আমার কোনো ক্ষোভ নেই। কিন্তু বাবাকে নিয়ে আমার ক্ষোভ অন্যখানে। তিনি কারণে-অকারণে প্রায়ই বাসার যে কোনো সদস্যকে বা গৃহকর্মীকে মারধর, গালিগালাজ করেন। ছোটবেলায় একবার তিনি আমার হাত রেড দিয়ে কেটে লবণ-মরিচ লাগিয়ে বিবস্ত্র করে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলেন। আরেকবার এমনভাবে প্রহার করেছি-লেন যে, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিলো। বাবার এই নৃশংস আচরণের জন্যে তাকে আমি ক্ষমা করতে পারছি না।

উত্তর : এক্ষেত্রে বোঝা যায় তিনি মানসিকভাবে সুস্থ নন। কারণ মানসিকভাবে অসুস্থ না হলে কেউ নিজের সন্তানের সাথে এরকম আচরণ করতে পারে না। তিনি হয়তো ‘সিজোফ্রেনিক’ বা ‘মানসিক পাসেনালিটি ডিসঅর্ডার’-এ আক্রান্ত। হয়তো সুস্থ আচরণ করছেন, আবার যখন রেগে যান বা ভিন্ন সত্তা তার উপর চড়াও হয়, তিনি নৃশংস আচরণ করেন। কাজেই এরকম একজন মানসিক রোগীর উপর আর যা-ই হোক রাগ করা যায় না। বরং তার সুস্থতার জন্যে, ক্ষমার জন্যে স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করতে হবে।

প্রশ্ন : আমি যে বন্ধুদের সঙ্গে মিশি তারা মনে করে কাউকে আকর্ষণ করতে না পারাটা আমার যোগ্যতার অভাব। এক্ষেত্রে আমার কি করা উচিত?

উত্তর : এক্ষেত্রে তোমার মনে করতে হবে যে, তারা লেজ কাটা শেয়ালের মতো নিজেরা লেজ হারিয়ে এখন তোমাকেও মন্তব্য দিচ্ছে লেজ হারানোর ফাঁদে পা দিতে।

বস্তৃত, বিপরীত লিঙ্গকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা হলো পশুর বৈশিষ্ট্য। যেমন, একটি কাক, কুকুর বা ময়ূর করে থাকে। কিন্তু একজন মানুষের বৈশিষ্ট্য হলো, সে মনে করে তার গুরুত্ব বা আকর্ষণ নির্ধারিত হবে তার গুণ, যোগ্যতা ও মেধা দ্বারা। বিপরীত লিঙ্গের কারও তাকানো বা স্বীকৃতির উপরে নয়। যার আত্মবিশ্বাসের অভাব আছে, সে-ই অন্যের স্বীকৃতি চায় বা বিপরীত লিঙ্গকে আকর্ষণ করাকে যোগ্যতা বলে ভাবে।

প্রশ্ন : কম্পিউটার ল্যাভে ক্লাস করতে গিয়ে ইন্টারনেটের ভয়াবহ ব্যবহার দেখে শিউরে উঠেছি। এখন আমার ভয় হচ্ছে, আমি নিজেও যদি এতে জড়িয়ে যাই। কারণ ক্লাস করতে ল্যাভে যেতেই হবে আবার নিজেকেও বাঁচাতে হবে। সব মিলিয়ে খুব চিন্তায় আছি।

উত্তর : অন্য সবকিছুর মত কম্পিউটার বা ইন্টারনেটেরও ভালো-খারাপ দুই দিকই আছে। তুমি শুধু ভালোটুকু গ্রহণ কর, যেমন হাঁস দুধের পানি রেখে ছানাটুকু খেয়ে নেয়, ঠিক তেমনি।

একজন কোয়ান্টাম থ্রাজুয়েটের এটুকু আত্মবিশ্বাস থাকা উচিত যে, আমি অনন্য মানুষ হওয়ার অভিযাত্রী। আমি পাপে ডুববো না। যে অপজ্ঞান আমার জানার দরকার নেই, তা জানবো না। বরং বড় কিছু, মহৎ কিছু করার জন্যে আমার জন্ম হয়েছে। ভেড়া-ছাগলের মতো জীবন যাপন নয়, মানুষের জীবন যাপন করতে হবে আমাকে। সেই মানুষ যে এই পৃথিবীকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে বাসযোগ্য করে তুলতে সচেষ্ট। এই বিশ্বাস রাখলেই দেখবে সমস্ত পঙ্কিলতার উর্ধ্বে তুমি উঠতে পারছ। যে কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছো।

ফাউন্ডেশন সংবাদ

চট্টগ্রামে প্রথম গ্রাজুয়েট পুনর্মিলনী

‘উপলব্ধি লালনই মুক্তি’- এ বাণীকে প্রতিপাদ্য করে গত ১৭ অক্টোবর কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন চট্টগ্রাম সেন্টারের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গ্রাজুয়েট পুনর্মিলনী ২০০৩। এ পর্যায়ে ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৫ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত ৯টি ব্যাচের গ্রাজুয়েটদের সম্মানে পুনর্মিলনীর আয়োজন করা হয়। ফাউন্ডেশনের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের ইতিহাসে এবারই প্রথম এরকম একটি ভিন্নধর্মী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

চট্টগ্রামে কোয়ান্টাম চেতনা ক্রমবিকাশের সেই বৈরী পরিবেশে কোয়ান্টাম চেতনার সাথে একাত্ম হয়ে যারা মেডিটেশন চর্চাকে এগিয়ে নিয়েছিলেন মূলত তাদেরকে সম্মানিত করাই ছিলো এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। প্রধান অতিথি হিসেবে এতে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল জনাব সর্দার মু. নুরুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল জনাব মনির হোসেন মনির এবং সিলেট সেন্টারের পরিচালক সাংবাদিক সীতাব আলী।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রামের প্রথম গ্রাজুয়েট জনাব মাহমুদুর রহমান। ফাউন্ডেশনের সার্বিক কার্যক্রম বর্ণনা করেন উপদেষ্টা সমন্বয় জনাব মুজিবুর রহমান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম সেন্টারের অর্গানাইজার জনাব মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন।

আমন্ত্রিত অতিথিদের ফুল ও বিশেষ ক্রেস্ট দিয়ে বরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিলো পুনর্মিলনীতে আমন্ত্রিত গ্রাজুয়েটদের স্মৃতিচারণ।

আমন্ত্রিত গ্রাজুয়েট, দায়িত্বশীল ও অতিথিসহ অনুষ্ঠানে দেড় শতাধিক সদস্য উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কোয়ান্টামের ইরফান বিন ইব্রাহিম।

প্রতিবেদক : মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন

উত্তরা শাখার উদ্যোগে দু’টি ব্লাড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে ও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন উত্তরা শাখার সহযোগিতায় কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম গত ১৪ অক্টোবর এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ ধানমন্ডি ক্যাম্পাসে এবং ২৪ অক্টোবর উত্তরা ক্যাম্পাসে সারাদিনব্যাপী দু’টি স্বেচ্ছা রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করে। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-এর সকল ছাত্র/ছাত্রী ও অন্যান্য সকলের আন্তরিক ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ব্লাড ক্যাম্প দুটোতে মোট ১৬৪ ব্যাগ রক্ত সংগৃহীত হয়। ধানমন্ডি ক্যাম্পাসে ব্লাড ক্যাম্প উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ড. আব্দুল আউয়াল খান এবং উত্তরা ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. আবুল হাসান মোহাম্মদ সাদেক।

গুরুজীর সাথে ঈদ মোলাকাত

ঈদের দিন গুরুজীর সাথে বৃকে বৃক মিলিয়ে কোলাকুলি করার অভূতপূর্ব সুযোগ ছাড়তে চান নি কেউই। তাই পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন গুরুজীর চামেলীবাগের আবাসস্থলটি হয়ে উঠেছিলো হাসি, আনন্দ ও উৎসবের আমেজে ভরপুর। ঈদের নামায শেষে গ্রাজুয়েট ও মাস্টাররা সপরিবারে ও সবাক্বে আসতে শুরু করেন। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ে প্রায় দেড় সহস্রাধিক অতিথির সমাগম হয়। গুরুজী ও মা-জী আগত সবার সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং তাদেরকে



গুরুজীর কোলে অনুষ্ঠানের সর্বকনিষ্ঠ অতিথি আসিমা মুনীর। পাশে তার বাবা-মা

আপ্যায়িত করেন।

গ্রাজুয়েটদের সঙ্গে আগত বিপুল সংখ্যক ননগ্রাজুয়েট, আত্মীয় বন্ধু এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে এবারের ঈদ মোলাকাত হয়ে উঠেছিলো অসাধারণ প্রাণবন্ত এক মিলন মেলায়।

প্রতিবেদক : জহুর আল সাদাঈন সাবিত

রাজশাহী সেন্টারে সারাদিনব্যাপী বিশেষ দায়িত্বশীল ওয়ার্কশপ

গত ৫ ডিসেম্বর শুক্রবার কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন রাজশাহী সেন্টারে বিশেষ দায়িত্বশীল ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত পাঁচ ঘণ্টাব্যাপী এই ওয়ার্কশপে ৬৫ জন দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করে। ওয়ার্কশপে রাজশাহী সেন্টারের পরিচালক জনাব কায়সার পারভেজ মেহেদীর মূল বক্তব্য এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব ছাড়াও কয়েকজন নির্বাহী ও দায়িত্বশীল তাদের জীবনে সফলতার নেপথ্যে সৃষ্টির সেবায় নিবেদিত হওয়ার ভূমিকা সম্বন্ধে উপলব্ধি ব্যক্ত করেন। এছাড়াও রাজশাহী সেন্টারে আগামী বছরের কার্যক্রম দায়িত্বশীলদের সামনে তুলে ধরা হয়। এ ওয়ার্কশপ ফাউন্ডেশনের সাথে একাত্মতা বৃদ্ধি, মেধার বিকাশ এবং সৃষ্টির সেবায় নিজেদের নিবেদিত করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে অধিকাংশ দায়িত্বশীল তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন।

প্রতিবেদক : আহমেদ জুবাইর হাসান

গেঞ্জারিয়া শাখায় ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত

গত ১৫ নভেম্বর অর্থাৎ ১৮ রমজান গেঞ্জারিয়া শাখায় ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রথমে রোজার গুরুত্ব ও পর আলোচনা করা হয়। পানি ও খেজুর দ্বারা ইফতার গ্রহণ এবং নামাজের পর রাতের আহরার আয়োজন করা হয়। শাখার ২০ জন সদস্য এ ইফতার মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন।

সিলেট সেন্টারে ঈদ পুনর্মিলনী

গত ২৮ নভেম্বর ঈদের ২য় দিন সিলেট সেন্টারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় ঈদ পুনর্মিলনী। সিলেটের জাফলং-এর মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে এতে অংশ নেন ৭৬ জন গ্রাজুয়েট-মাস্টার।

পরিণীলিত আনন্দ আয়োজন, শৃঙ্খলা বোধ এবং মেডিটেশনে মগ্ন হতে দেখে জাফলং-এর অন্যান্য আনন্দ অভিযাত্রীদের চোখে এটি ছিলো একটি ব্যতিক্রমী দল।

শাখার অ্যাকটিভদের সাথে গুরুজীর ইফতার

পবিত্র রমজান মাসে বিভিন্ন শাখা ও সেলের অ্যাকটিভ গ্রাজুয়েট ও মাস্টারদের সাথে গুরুজী মত বিনিময় ও ইফতারে অংশ নেন। ভিন্ন ভিন্ন দিনে ভিন্ন ভিন্ন শাখার সাথে এ আলোচনায় গুরুজী কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন ও আখেরী দোয়া নিয়ে সকলের মতামত ও অনুভূতি জানতে চান। গুরুজীর সাথে ইফতারের মাধ্যমে এ কার্যক্রমসমূহ শেষ হয়।

আগ্রাবাদ সেলে ঈদ মোলাকাত

ঈদের আনন্দকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন সন্ধ্যায় আগ্রাবাদ সেলে অনুষ্ঠিত হলো ঊঠ বারের মতো ঈদ মোলাকাত। এবারের ঈদ মোলাকাত-এ ছিলো অন্যান্য বারের তুলনায় সর্বাধিক উপস্থিতি। সন্ধ্যা ৬টায় যৌথ মেডিটেশনের মাধ্যমে ঈদ মোলাকাত শুরু হয়।

মেডিটেশনের পর সেলের উপদেষ্টা প্রিন্সিপাল আলমগীর চৌধুরী ও আহ্বায়ক জনাব এস.এম. আলী নাদীম সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা, মোবারকবাদ জানান। গুরুজীর সাথে টেলিফোনে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানের আনন্দকে আরও বাড়িয়ে দেয়।



জাফলং-এর মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অনুষ্ঠিত সিলেট সেন্টারের ঈদ পুনর্মিলনীতে মেডিটেশন।

কোয়ান্টাম পরিবারের কয়েকজন সফল শিক্ষার্থীর কথা

দৃষ্টিভঙ্গি বদলান জীবন বদলে যাবে ফারহানা হাসান স্বাভী

“দৃষ্টিভঙ্গি বদলান জীবন বদলে যাবে”- এই বাক্যটি এখন আমার জীবনে প্রব সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে শ্রেফ কৌতূহলের বশে আমি মেডিটেশন কোর্সটি করি।



তারপর থেকেই আমার জীবনের মোড় বদলে যেতে শুরু করে। মেডিটেশনের মাধ্যমে আমি ছোট-বড় অনেক সাফল্য পেয়েছি। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো আমার চাকরি। আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের একজন শিক্ষিকা। গত বছর অক্টোবরের দিকে যখন সার্কুলার হলো তখন নেহাত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আবেদন করেছিলাম। কারণ আমার ধারণা ছিলো আমার চেয়েও আরও বেশি কোয়ালিফাইড যারা (অনেক ছিলো), তাদেরকে বাদ দিয়ে ডিপার্টমেন্ট নিশ্চয় আমাকে নেবে না। তাছাড়া শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নেয়ার কোনো ইচ্ছাই আমার ছিলো না। কিন্তু আবেদন করার পরে আমার কাছের মানুষদের উৎসাহ ও উদ্বীপনা আমার মাঝেও সঞ্চারিত হলো। ফলে আমি মনছবি দেখা শুরু কললাম যে, চাকরিটা আমি পাচ্ছি। পরিশেষে ২২ নভেম্বর হলো ভাইভা পরীক্ষা। আল্লাহর অশেষ রহমত, গুরুজীর দোয়া এবং আমার প্রিয় মানুষদের আশীর্বাদে আমার চাকরিটা হলো। আসলে মেডিটেশন করে আমার সবচেয়ে বড় যে লাভ হয়েছে তা হলো জীবনকে আমি দারুণভাবে উপভোগ করতে শিখেছি। কোনো সমস্যাকে আর সমস্যা মনে হয় না। এখন আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি এই পৃথিবী আমার, যেখানে দরকার সেখানে যাবো, যা চাই তা-ই পাবো।

[ফারহানা হাসান স্বাভী, প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ১২২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

শেষ পর্যন্ত প্রথম হলাম

ফারজানা কাওকব

বেশ ভালো রেজাল্ট করে অনার্স পাশ করলাম। তারপর অংশ নিলাম মেডিটেশন কোর্সে। এমবিএ-তে উঠে নানান পারিপার্শ্বিক জটিলতার পাকে পড়ে প্রথম সেমিস্টারে রেজাল্টটা আশানুরূপ হলো না। টার্গেট ছিলো প্রথম স্থান



অধিকার করার। হয়ে গেলাম তৃতীয়। মন বেশ ভেঙে গেলো। মন শক্ত করতে করতে চলে এলো দ্বিতীয় সেমিস্টার। পরীক্ষা দিলাম, এবারে পেলাম দ্বিতীয় স্থান। তা-ও মন খারাপ হলো কারণ এবারও আমি আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারলাম না। মেডিটেশন লেভেলে গিয়ে শুধু কাঁদতাম। মনে হতো কষ্টগুলো গলে গলে বের হয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার পড়তে বসতাম। তৃতীয় সেমিস্টার পরীক্ষায় আল্লাহর রহমতে প্রথম হতে পারলাম। তারপরও ভয় ছিলো শেষ পর্যন্ত কি হয়।

রাজশাহীতে এসময়ে মেধায়ন চালু হলো। পরীক্ষার মাঝের ছুটিগুলোতে বইপত্র বেঁধে নিয়ে চলে যেতাম ফাউন্ডেশনে মেধায়ন করার জন্যে। এভাবে শেষ হলো চতুর্থ সেমিস্টার পরীক্ষা। স্ট্রটার অপার অনুগ্রহে ‘এ’ গ্রেডে প্রথম স্থান পেলাম। ৭ আগস্ট আমার অফিসিয়াল রেজাল্ট বের হলো। আর ১০ আগস্ট আমার জীবনের প্রথম ইন্টারভিউ-এর সম্মুখীন হলাম। ঢাকায় ইন্টারভিউ দিয়ে রাজশাহী চলে এলাম। ২৫ আগস্ট আমার এ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এলো এশিয়ান ইউনিভার্সিটির ফুল টাইম লেকচারার পদে জয়েন করার জন্যে।

সবকিছুই স্ট্রটার অনুগ্রহ। আর মেডিটেশন আমাকে ভেঙে পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে। হাল ছেড়ে দিতে গিয়ে আরও শক্ত হাতে দাঁড় টানতে সাহায্য করেছে, বাড়িয়েছে আত্মবিশ্বাস।

[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রী ফারজানা কাওকব, ১১২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সাফল্য পেয়েছি

শাহজাদা এম. ইমরান

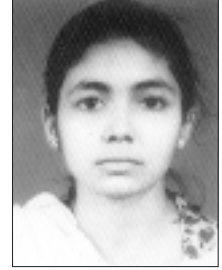
এ বছর যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস ‘এ এন্ড এম’ ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে আমি সিজিপিএ-৩.৯২ নিয়ে ইনফরমেশন সিস্টেম-এ এম এস সম্পন্ন করেছি। ১৯৯৯ সালে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাফল্যের সাথে বিবিএ করার পর ২০০২ সালে উচ্চ শিক্ষা অর্জনের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এর বিভিন্ন একাডেমিক কোর্সেও আমি অর্জন করেছি উল্লেখযোগ্য সাফল্য। গ্রাজুয়েশনের পর দেশে-বিদেশের নামকরা প্রতিষ্ঠানে কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করার সুযোগও হয়েছে। তবে আমার এসব সাফল্যের পেছনে আমার মেধা এবং শ্রমের ভূমিকার পাশাপাশি ১৯৯৪ সালে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে অংশগ্রহণও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কারণ কোর্সের ইতিবাচক শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে ফাউন্ডেশনের সেবামূলক কাজে জড়িত হবার সুযোগ আমার দক্ষতা কিছুটা হলেও বাড়তে সাহায্য করেছে।

[শাহজাদা এম. ইমরান ৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



আমি এখন আত্মবিশ্বাসী নমিতা দাশ সানি

আমি ডাক্তার হবো এ ছিলো আমার বহুদিনের লালিত স্বপ্ন। কিন্তু সময় যতো কাছে আসছে ততই একটু একটু করে হতাশায় ডুবে যাচ্ছিলাম। কারণ দিনে দিনে পড়ালেখায় মনোযোগ ক্রমশ কমে আসছিলো। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে। এই হতাশা আমার রাগী স্বভাবটাকে যেন উকে দিয়েছিলো। খুব সাধারণ ব্যাপার নিয়েই রেগে যেতাম। এরকম বিপর্যস্ত অবস্থায়ই আমার কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট বাবা আমাকে কোর্স করার জন্যে উদ্বুদ্ধ করেন।



কোর্স করার পর প্রথম সাফল্য হচ্ছে আমার রাগ অনেকটাই কমেছে। তাছাড়া আমি এখন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছি। লেখাপড়ায়ও মনোযোগ বেড়েছে। সবচেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে কোর্স করার পর থেকেই আমি নিয়মিত মেডিকেল কলেজে ভর্তি হবার মনছবি দেখতে থাকি। এ মনছবির চূড়ান্ত সাফল্য হচ্ছে আমি এখন মেডিকেল কলেজে পড়ছি। যা আমার কাছে অনেক মূল্যবান প্রাপ্তি। আমি এখন এই আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছি যে, জীবনের সবগুলো পরীক্ষায়ই সাফল্য অর্জন করতে পারবো যদি মনোনিয়ন্ত্রণের সর্বাধুনিক এবং যথার্থ এ পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগ করতে পারি।

[নমিতা দাশ সানি, শিক্ষার্থী, ১৩৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মনছবি পূরণ হলো

জিয়াউদ্দিন আহমদ

স্বপ্ন দেখতাম পাইলট হয়ে আকাশে উড়ছি। কিন্তু প্রথমবার এয়ার ফোর্সে চান্স পেলাম না। অবশ্য আমি ভেঙে পড়ি নি। কেন না আমি জানতাম, কোথায় আমাকে পৌঁছতে হবে। নিয়মিত মেডিটেশন



এবং মনছবি আমার লক্ষ্যকে আরো শাগিত করে দিলো। তাই খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সাথে সাথে ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে নিয়মিত অংশ নিতাম। ফলে সবসময় মনে হতো ফাউন্ডেশন আমার সাথে আছে। অবশেষে আমার স্বপ্ন পূরণ হলো। এয়ার ফোর্সে চান্স পেলাম।

এখন আমার বিশ্বাস, নিয়মিত মেডিটেশন এবং ফাউন্ডেশনের সাথে একাত্ম থাকলে যে কোনো চাওয়াই পাওয়ায় রূপান্তরিত হয়।

[জিয়াউদ্দিন আহমদ ১১২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

গুরুজীর সাথে উন্মুক্ত
সাক্ষাত প্রতি মঙ্গলবার
থ্রাজুয়েট, ননথ্রাজুয়েট নির্বিশেষে যে
কেউ এখন থেকে প্রতি মঙ্গলবার
সকাল ১০টা-১২টা, বিকাল ৪টা-৫টা
এবং সন্ধ্যা ৭টা-৮টা কেন্দ্রীয়
অফিসের সেমিনার কক্ষে গুরুজীর
সাথে সাক্ষাত ও যৌথ মেডিটেশনে
অংশ নিতে পারেন।

মঙ্গলবারের কোয়ান্টায়ন মেডিটেশন হলে

প্রতি মঙ্গলবারের কোয়ান্টায়ন
অনুষ্ঠিত হবে কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম
মেডিটেশন হলে। এছাড়া শুক্র ও
শনিবারের কোয়ান্টায়ন কার্যক্রম
যথারীতি কেন্দ্রীয় অফিসের সেমিনার
কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।

ধ্যান উৎসব ২০০৪

এবার লামা ধ্যান উৎসব অনুষ্ঠিত হবে
আগামী ৫-৭ মার্চ, ২০০৪। ধ্যান
উৎসবের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হবে ৪
মার্চ, বৃহস্পতিবার রাত্রে।

আগ্রহীদের জন্যে ধ্যান উৎসবের
অংশগ্রহণ ফি : সাধারণদের ১৫০০
টাকা এবং শিক্ষার্থীদের ১২০০ টাকা।

শীঘ্রই নাম অন্তর্ভুক্ত করে সীমিত
সংখ্যক যাত্রীর মাঝে নিজের যাত্রা
নিশ্চিত করুন।

ডিসেম্বরে রক্ত সংগ্রহ ১২৪৩ ইউনিট

২০০৩ সালের সর্বশেষ মাস
ডিসেম্বরে কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান
কার্যক্রমের মোট রক্ত সংগ্রহ ১২৪৩
ইউনিট এবং সরবরাহ ৯৫৫ ইউনিট।
এর মধ্যে ল্যাবের সংগ্রহ ৫১৮ ইউনিট।
এছাড়া মতিঝিল, হাতিরপুল,
মগবাজার, গেণ্ডারিয়া, মোহাম্মদপুর
এবং সবুজবাগ শাখার উদ্যোগে বিভিন্ন
স্থানে মোট ৯টি ক্যাম্পে সংগৃহীত হয়
৭২৫ ইউনিট রক্ত। সংগৃহীত রক্ত থেকে
বিভিন্ন রোগ সন্দেহে ৪২ ইউনিট রক্ত
বাতিল করা হয়।

ফেব্রুয়ারী-মার্চ ২০০৪ -এর কর্মসূচি

ঢাকায় ১৭৫ ব্যাচের পরিচিতি সভা :
১৮ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ (বুধবার) ৪:৩০টা
রাজশাহীতে থ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ :
২৩ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ (সোমবার)
রাজশাহীতে ১৭৬ ব্যাচের পরিচিতি সভা :
২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪ (মঙ্গলবার)
ঢাকায় ১৭৫ ব্যাচের কোর্স :
২৭, ২৮, ২৯ ফেব্রুয়ারী ও ১ মার্চ, ২০০৪
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)
রাজশাহীতে ১৭৬ ব্যাচের কোর্স :
১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ মার্চ



অবিদ্যা পর্ব-৪ ওয়ার্কশপে গুরুজী

নারীকে দিতে হবে উপযুক্ত মর্যাদা
ও আত্মপরিচয়ের অধিকার



১২ ডিসেম্বর

ওয়ার্কশপে

সমবেত

থ্রাজুয়েটদের

একাংশ।

পুরুষ পরিবারের প্রধান, কিন্তু
নারীই পরিবারের প্রাণ। কারণ
নারীকে কেন্দ্র করেই পরিবার টিকে
থাকে। এই নারীকে যখন অবজ্ঞা করা
হয়, তার উপর জুলুম করা হয়, তখন
সেই পরিবারে শান্তি থাকে না।

গত ১২ ডিসেম্বর বিসিআইসি
মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'পারিবারিক
জীবনে অবিদ্যা' শীর্ষক অবিদ্যা পর্ব-
৪ এর ওয়ার্কশপে এ কথাগুলো বলেন
গুরুজী শহীদ আল বোখারী
মহাজাতক।

গুরুজী বলেন, সকল অবিদ্যার
মূল কারণ হলো পারিবারিক জীবনে
অবিদ্যা। আর এর বেশিরভাগই হলো
নারীদের সম্পর্কে ভ্রান্ত বিশ্বাস ও
দৃষ্টিভঙ্গি।

'নারী সকল পাপের উৎস' এ
ধারণা আমাদের পারিবারিক
পরিমণ্ডলের প্রথম অবিদ্যা। পুরুষরা
এমনকি অনেক নারীও মনে করেন
আদমের স্বর্গ ত্যাগের জন্যে দায়ী
হাওয়া। ইউরোপে মধ্য যুগে নারীকে
'আদি পাপ' হিসেবে চিহ্নিত করা
হতো। গুরুজী বলেন, অথচ
কোরআনের এ সম্পর্কিত আটটি
আয়াতের কোথাও হাওয়াকে দায়ী
করা হয় নি বরং আদম ও হাওয়া
উভয়কেই দায়ী করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অবিদ্যা হিসেবে গুরুজী
চিহ্নিত করেন, 'নারী পুরুষের অর্ধেক'
এ ধারণাকে। অর্থাৎ নারীর বুদ্ধি
বিবেচনা কম, জ্ঞানার্জনের ক্ষমতা কম
তাই তাকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে দেখা
উচিত। অথচ পবিত্র কোরআনে
স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে 'বিশ্বাসী নর ও
নারীর পুরস্কার সমান'। আর নবীজী
(সা.) বলেছেন, 'নারী হচ্ছে পুরুষের
সহোদর'। অর্থাৎ নারী ও পুরুষ
পরস্পরের সমান।

'ছেলে আপন, মেয়ে পর'-এটি
তৃতীয় অবিদ্যা। মা-বাবার এই
মনোভাবের কারণে আমাদের সমাজের
মেয়েরা তাদের জীবনের প্রতিটি
ক্ষেত্রে বৈষম্যের শিকার হয়। অথচ
ছেলের মতো মেয়েরও শিক্ষা এবং
আত্মপরিচয়ের গুরুত্ব রয়েছে।

গুরুজী বলেন, বিয়ের মতো একটি
ধর্মীয় বন্ধনের মাধ্যমে পরিবারের
সূচনাই প্রমাণ করে যে এখানে
বৈষম্যের কোনো স্থান নেই, বরং নিজ
নিজ কর্তব্য ও অধিকারের ক্ষেত্রে
উভয়ই সমান গুরুত্বপূর্ণ। ফলে কোনো
এক পক্ষকে ক্রমাগত অবহেলিত ও
নির্ধাতিত রেখে কখনো সুখী পরিবার
গঠন করা যায় না। বরং পারস্পরিক
মমতা, সহানুভূতি ও শ্রদ্ধাবোধ সুখী
পরিবারের প্রধান শর্ত।

কোর্স দিয়েছে এক নতুন পথের দিশা ড. তাসলিমা মনসুর

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়ে
আইন বিভাগে
দীর্ঘ দিনের
শিক্ষকতার
অভিজ্ঞতা,
বিদেশে
উচ্চতর



গবেষণার অভিজ্ঞতা এবং আইন
অনুষদের দায়িত্বপূর্ণ ডিনের পদে
থাকার অভিজ্ঞতা থাকলেও এই
কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের মাধ্যমে
আত্মোপলব্ধির যে নতুন অভিজ্ঞতা
আমি পেলাম তা আমাকে দিয়েছে এক
নতুন পথের দিশা।

কোর্স করতে এসেছিলাম আমার
স্বামীকে নিয়ে। তিনি অসাধারণ এক
মানুষ। কিন্তু ইদানীং কিছুটা হতাশ হয়ে
পড়ছিলেন, যদিও আপাতদৃষ্টিে এর
কোনো কারণ নেই। কোর্সের পর তার
পরিবর্তন লক্ষ্য করছি। তিনি এখন
মানসিকভাবে অনেক উজ্জীবিত।

মেডিটেশন কোর্স খুলে দিয়েছে
আমার মনের চোখ। আমার জীবনের
নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য ছিলো না। নির্দিষ্ট
লক্ষ্য ছাড়াই অনেক দূর আসতে
পেরেছি। কিন্তু এখন আমি নতুন করে
জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারছি।
আমি বিশ্বাস করি, এ মনছবি পূরণ
করার মতো যোগ্যতা আমারও রয়েছে।
কোর্সের পারিবারিক মেডিটেশনটির
অভিজ্ঞতা না বললেই নয়। আমি
আমার বাবাকে হারিয়েছি ৩২ বছর
আগে। আর মা মারা গেছেন বছর
তিনেক। পারিবারিক মেডিটেশনে আমি
বাবা-মাকে এত বাস্তবভাবে অনুভব
করেছি যা হয়তো অন্য কোনোভাবেই
অনুভব করতে পারতাম না।

কোয়ান্টাম মেথডের এই কোর্সে-
নৈতিকতা, ধর্মীয় শিক্ষা, বিজ্ঞান, দর্শন
সবই রয়েছে। আমরা দৃষ্টিভঙ্গি
বদলাবার কথা বলি, কিন্তু কীভাবে তা
বদলানো যায় তা বলি না।
মেডিটেশনই হলো সেই পথ যা
নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে বদলে ব্যক্তির
মধ্যে আনে সত্যিকারের ইতিবাচক
পরিবর্তন। কোর্সের এই শিক্ষা থেকে
আমি নিজে যেমন সফলভাবে পথ
চলার অনুপ্রেরণা পেয়েছি, আমার ছাত্র-
ছাত্রীদেরও সেই অনুপ্রেরণায় চালিত
করার চেষ্টা করবো।

[শিক্ষাবিদ ড. তাসলিমা মনসুর আইন
অনুষদের সাবেক ডীন। তিনিই প্রথম
মহিলা যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ডীন
হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কোয়ান্টাম
মেথড কোর্সের ১৭১ ব্যাচে তিনি ও তার
স্বামী বিশিষ্ট প্রকৌশলী এ.আই.এম মনসুর
অংশগ্রহণ করেন]

ব্যস্ত জীবনের দোলাচলে এক কোয়ান্টাম দম্পতির কথকতা



দুই সন্তানের সাথে মেজর (অব.) মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন ও স্থপতি সাঈদা সুলতানা এ্যানি

উত্তর ৪ নং সেক্টর, ১০ নং সড়ক, ৩৪ নং বাড়ি। সহজে চোখে পড়বে এর সৌন্দর্য। ভেতরটা আরও সুন্দর। ২০০২ সালে ইটিভি-তে ইন্টেরিয়র ডিজাইনের অনবদ্যতার জন্যে এই বাড়িটির উপর একটি প্রতিবেদন প্রচার করা হয়। সাথে ছিলো এর রূপকার স্থপতি সাঈদা সুলতানা এ্যানির একটি সাক্ষাতকার। নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে আপন নীড়ের মূল নকশা ও ইন্টেরিয়র ডিজাইন করেছেন। সাধারণ ইটের এক অসাধারণ ব্যবহার তিনি করেছেন ঘরের মেঝে নির্মাণে। যা থেকে মার্বেলের ইফেক্ট পাওয়া যায়, মুক্ফতার আবেশ ছড়িয়ে দেয় মনে।

গৃহকর্তা এ্যানি ছাড়াও বাড়ির অপর বাসিন্দারা হচ্ছেন গৃহকর্তা মেজর (অবঃ) মুহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন এবং তাদের দুই সন্তান। পারস্পরিক পেশাগত সহযোগিতার এক সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এই দম্পতি। গড়ে তুলেছেন আর্কিটেকচারাল কনসাল্টিং প্রতিষ্ঠান 'লাইফ স্টাইল'। এর সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা করেন মেজর সাখাওয়াত এবং ডিজাইন ও পরিকল্পনায় স্থপতি এ্যানি।

স্বামীর অনুপ্রেরণায় '৯৪ সালে কোয়ান্টাম মেডিটেশন কোর্স করেন স্থপতি এ্যানি। যদিও তার স্বামী কোর্স করেছেন অনেক পরে, সাম্প্রতিক ১৬৯ ব্যাচে। তবে বরাবরই তিনি গুরুজীর একজন ভক্ত ছিলেন। গুরুজীর লেখা পড়তেন ও টিভি প্রোগ্রাম খুব আগ্রহ নিয়ে দেখতেন। মিসেস এ্যানি পেশাগত ও সাংসারিক নানা ঝামেলায় কিছুটা মানসিক অস্থিরতায় ভুগতে থাকলে স্বামী তাকে কোর্স করতে উদ্বুদ্ধ করেন।

স্থপতি এ্যানির কোর্সে ভর্তি হবার ঘটনাটি বেশ মজার। তিনি চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় এসে কোর্সের ব্যাপারে খোঁজ নিতে আসেন। তখন কোর্সগুলো হতো স্কাউট ভবনে। তিনি এসে দেখেন ঐ দিনই কোর্স। সকালে কোর্স শুরু হয়েছে এবং কোয়ান্টিয়াররা তাকে জানান এখন আর ভর্তির সুযোগ নেই। তবুও স্থপতি এ্যানি গুরুজীর সাথে দেখা করার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকেন। দুপুরের বিরতির সময় গুরুজী বের হলে তার আগ্রহের কথা বলেন। প্রচণ্ড আগ্রহ দেখে গুরুজী তাকে তখনই কোর্সে অংশ নেয়ার অনুমতি দেন। এভাবে তাৎক্ষণিক অনুমতি পাওয়ায় সকলে খুবই আশ্চর্য হয়েছিলেন।

কোর্স করার পর তিনি নতুন উদ্যম ফিরে পান। তার দীর্ঘ দিনের মাইগ্রেনের ব্যথা সম্পূর্ণ চলে গিয়েছিল। পেশাগত সাফল্যও আসতে থাকে। বর্তমান বিডিআর দরবার হলটি আমরা যে নান্দনিক অবয়বে দেখতে পাই— তারই নির্মাতা স্থপতি এ্যানি। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এর নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেন। অনেক রাত পর্যন্ত কাজ করতে হতো। দিন দিন দরবার হলের কাজের দ্রুত অগ্রগতি দেখে আর্মির সিনিয়র অফিসাররা অবাক হয়ে যেতেন এবং তাদের অধীনস্থদের ডেকে তা দেখাতেন।

কাজটি যখন সম্পন্ন হলো বিডিআর এর ডিজি অত্যন্ত খুশি হলেন এবং পরবর্তীতে এক অনুষ্ঠানে স্থপতিকে প্রধান মন্ত্রীর সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। এ

প্রসঙ্গে স্থপতি এ্যানি বলেন, আমি কাজটিকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিই এবং আপাত অসম্ভব বিষয়টিকে সফল করার জন্য নিয়মিত অটোসাজেশন দিতে থাকি। স্থপতি এ্যানির আরও একটি উল্লেখযোগ্য কর্ম হচ্ছে সাভার সেনানিবাসের প্রধান ফটকে নির্মিত 'শহীদ মুন্সী আব্দুর রউফ' তোরণটি।

ছাত্র জীবনে তিনি দু'বার বুয়েট ছাত্রী হলের ভিপি ছিলেন। শেষের বার তার বিপুল জনপ্রিয়তার কারণে একমতের ভিত্তিতে ছাত্রীরা তার বিরুদ্ধে প্রার্থী দেয় নি। উল্লেখ্য তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে জড়িত ছিলেন না।

জনাব সাখাওয়াত হোসেন সব সময়ই একজন ইতিবাচক মানুষ। টিভিতে বিজয় দিবসের কুচকাওয়াজ দেখতে দেখতে তিনি এর ধারাভাষ্যকার হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। যা পরবর্তীতে সফল হয়েছিলো। তার আর একটি স্বপ্ন ছিলো, তিনি শিক্ষকতা করবেন। আত্মপ্রত্যায়া এই মানুষটি সেনাবাহিনীর চাকরি ছেড়ে দিয়ে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে এমবিএ করেন। একই সঙ্গে ২টি মেজর কোর্স নিয়ে দ্রুত পড়াশোনা শেষ করার জন্যে তিনি শেষ সেমিস্টারে এসে এক সঙ্গে ৮টি কোর্স নেন। তার শিক্ষক বলেন এটা অসম্ভব। কিন্তু মেজর সাখাওয়াত অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে কোর্স সমাপ্ত করেন। বিশ্ববিদ্যালয় তাকে শিক্ষকতার প্রস্তাব দেয়। তিনি তার স্বপ্ন পূরণ করেন।

জনাব সাখাওয়াত বলেন, কোয়ান্টাম কোর্স করে আমার বরাবরের ইতিবাচক মানসিকতা একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ পেয়েছে। এই দম্পতি সবসময় পরস্পরকে সকল কাজে সাহস জুগিয়েছেন। একবার তাদের ব্যবসায় একটি বড় ঝামেলার সৃষ্টি হয়। এজন্যে তারা অটোসাজেশন দিতে থাকেন। মেজর সাখাওয়াত মেডিটেশন লেভেলে গিয়ে সমস্যাটির সমাধানের জন্যে মনোবিদ্যে দেখেন। একদিন সকালে আশ্চর্য হয়ে দেখেন এক অপরিচিত ব্যক্তি তার কাছে এসেছেন ব্যবসার ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে। এ ব্যক্তিই তার মনোবিদ্যে ধরা দেয়া হুবহু একই চেহারার যাকে তিনি আগে কখনও সামান্য সামনি দেখেন নি। সে বার খুব সুন্দরভাবে তাদের সমস্যাটি মিটে যায়।

একবার এই দম্পতির কাছে একটা ব্যবসার প্রস্তাব আসে। কিন্তু স্থপতি এ্যানি উপলব্ধি করেন যে এখানে ফলাফল ভালো হবে না। পরবর্তীতে তাদের এক বন্ধু ব্যবসাটি করেন এবং এতে তার ৫ লক্ষ টাকা লোকসান হয়। নিজের মাঝে অন্তর্দৃষ্টির এক অপূর্ব ক্ষমতাকে তিনি অনুভব করেছেন কোর্স করার পর থেকে।

জীবন কখনো সমস্যা সংকটের বাইরে নয়। তাই সমস্যায় পড়লেই স্থপতি এ্যানি পবিত্র কোরআন পড়েন। ক্রমেই তিনি অনুভব করেন তার সমস্যাটি মিটে যাচ্ছে। তিনি বলেন, আমি সব সময়ই গুরুজীর একটি উপদেশ স্মরণ করি, তিনি আমাকে বলেছিলেন এমন কাজ করো যাতে লোক তোমার কাছে আসে। গুরুজীর এই কথা আমাকে ভালো কাজের অনুপ্রেরণা যোগায়।

গুরুজীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জনাব সাখাওয়াত বলেন, কিছু মানুষ আছেন যারা স্রষ্টা কর্তৃক নির্বাচিত। এদের হাতে প্রদীপ দেয়া হয়েছে যা চারদিক আলোকিত করে। আমার জীবনে গুরুজী 'লাইট হাউজের' মতই ভূমিকা রেখেছেন। তিনি হয়তো জানেন না। আমি দূর থেকেই তার কাছ থেকে আলো পেয়েছি।

শত ব্যস্ততার মাঝেও এই দম্পতি মেডিটেশনের শাস্ত্র চেননার সাথে একাত্ম আছেন। এভাবেই তারা অগ্রসর হচ্ছেন বৃহত্তর সাফল্যের দিকে।

প্রতিবেদক : মোহাম্মদ রায়হান



স্থাপত্য ডিজাইনে মগ্ন এ্যানি-সাখাওয়াত দম্পতি

শ্রদ্ধাভাজনেষু গুরুজী,
আসসালামু আলাইকুম।
গুরুজী আপনি কেমন
আছেন? আমি আপনার
দোয়া ও আল্লাহর
রহমতে ভালো আছি।

ইটালি আসার পথে
পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক
এই দেশগুলোতে নানারকম ভোগান্তি ও আইনী
ঝামেলায় পড়েছিলাম। দিনের পর দিন বন্ধুহীন
পরিবেশের সেই অসহায়তা, সেই কষ্টের মধ্যেও
আমি ধৈর্য ধরে থাকতে পেরেছিলাম শুধু আপনার
শিক্ষা মনে রেখে। শত ঝামেলার মধ্যেও নিয়মিত
দু'বেলা মেডিটেশন করছি।

দুঃখ-কষ্টের তীব্রতায় মাঝে মাঝে যখন ধৈর্যের
বাঁধ ভেঙে যেতে চাইতো তখনই আপনার
মমতাকে স্মরণ করতাম, আপনার জন্যে
ভালবাসায় হৃদয় ভরে যেতো। দেশে থাকতে
আপনার সাথে দেখা হলেই আমি যেমন
আবেগাপ্ত হয়ে পড়তাম, তেমনি বিদেশের পথে
পা দিয়েও স্বপ্নে বহুবার আপনাকে দেখে কেঁদেছি।
গুরুজী, আপনার মতো একজন জীবনের
শিক্ষককে পাওয়াই আমার জীবনের সবচেয়ে বড়
পাওয়া। দীর্ঘ দিনের অনিশ্চয়তা আর বিপদের পর
এতদিনে আমি সুস্থির হতে পেরেছি। তাই এখন
আমি নিয়মিতভাবে আপনার সাথে, ফাউন্ডেশনের



প্রবাস থেকে গুরুজীকে লেখা চিঠি

সাথে যোগাযোগ রাখতে চাই, ফাউন্ডেশনের
বিভিন্ন কাজে জড়িত হতে চাই। এ ব্যাপারে
পরামর্শ পেলে বাধিত হবো।

সবশেষে আপনাকে, মা-জীকে ও কোয়ান্টাম
পরিবারের সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে
বিদায় নিচ্ছি।

আপনার স্নেহের দীপু

[ইটালী প্রবাসী দেলোয়ার হোসেন দীপু ৮৪ বছরের গ্রাজুয়েট]

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহর রহমতে আর
আপনাদের দোয়ায় আমরা খুব ভালো আছি। বাস্তবে
অনেকদিন আপনার হাতের স্পর্শ আমার মাথায় পাই
নি। তাই মেডিটেশনে বসলেই সেই স্পর্শ অনুভবের
চেষ্টা করি। আশা করি, আগামী বছর রোজার আগে

আপনার হাতের
স্পর্শ পাওয়ার
সৌভাগ্য হবে।

আমার গবেষণার
কাজ ভালভাবেই
চলছে। আগামী বছর
মাঝামাঝি নাগাদ
থিসিস জমা দিতে
পারবো ইনশাআল্লাহ।

প্রবাসে কোয়ান্টাম
পরিবারের সদস্য এবং অন্যরাও এখন কোয়ান্টাম
সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। ওয়েব সাইট থেকে
প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ এবং ই-মেইলের মাধ্যমে
তারা যোগাযোগের চেষ্টা করে থাকেন।

এ চিঠি যার মাধ্যমে পৌঁছাচ্ছে; তিনিও সেরকম
একজন আগ্রহী ব্যক্তি। ডিসেম্বরের কোর্সে সম্ভবত
তিনি অংশ নেবেন। তার হাতে মাটির ব্যাংকের
জন্মে কিছু অর্থ পাঠালাম।

দোয়া করবেন। চিরদিন যেন আপনার স্নেহ
ছায়ায় থাকতে পারি।

আপনার স্নেহের আশিক
১৪ নভেম্বর, ২০০৩

[রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ প্রভাষক মোহাম্মদ
আশিক মোসাদ্দিক বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার সাউদার্ন ক্রস
ইউনিভার্সিটিতে উচ্চতর গবেষণায় নিয়োজিত। ৮৯
ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

প্রয়োজন ফাস্ট ফুড ও কোমল পানীয়ের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি

অধ্যাপক এ. কে আজাদ খান ও ফরিদ কবির

গত কয়েক দশকে প্রযুক্তির অভাবনীয় বিকাশ ও
উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে মানুষের কায়িক
শ্রম অনেকাংশে কমে গেছে। উন্নয়নশীল
দেশগুলোতে জীবন-পদ্ধতি যে দ্রুত বদলে যাচ্ছে
তার সাথে যুক্ত হচ্ছে ফাস্ট ফুড, বিভিন্ন রকম
কোমল পানীয় এবং সিগারেট। উন্নত বিশ্ব
এগুলোকে এখন 'জাংক ফুড' হিসেবে চিহ্নিত
করলেও এর আদর দিন দিন-ই বেড়ে চলেছে
বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। ফলে
ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেসার, হার্ট এ্যাটাক, স্ট্রোক
ইত্যাদি রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সিগারেটের প্রায় সব বিজ্ঞাপনেই সিগারেটের
সঙ্গে সম্পর্কিত করা হয়েছে বুদ্ধিবৃত্তি, সৌন্দর্য,
স্মার্টনেস আর রোমান্টিকতাকে। বলাই বাহুল্য
কিশোর-তরুণদের আকৃষ্ট করতেই এতসব
আয়োজন। এসব বিজ্ঞাপনের ভাষায় ভুলে
কিশোর-তরুণরা প্রথমে শখের বশে ধূমপান শুরু
করলেও ধীরে ধীরে তা অভ্যাসে পরিণত হয়।
এরপর এই অভ্যাস একসময় মানুষকে পরিণত
করে দাসে। তখন ধূমপান ত্যাগ করা অনেক কঠিন
হয়ে পড়ে। কাজেই সিগারেটের বিজ্ঞাপন প্রচারের
ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে হবে।
প্রয়োজনে অনেক উন্নত দেশের মতো এ দেশেও
জনসমক্ষে ধূমপান নিষিদ্ধ করতে হবে। ধূমপানের
ক্ষতিকর দিকগুলো সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি
করতে হবে। এর জন্যে সরকার ছাড়াও বিভিন্ন
সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে।

একই সঙ্গে ফাস্ট ফুড ও কোমল পানীয়ের

ক্ষতিকর দিকগুলো নিয়েও ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি
করা প্রয়োজন। কারণ ডায়াবেটিস, ব্লাড প্রেসার,
হার্ট এ্যাটাক, স্ট্রোকের ব্যাপকতা ক্রমেই বেড়ে
চলছে। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের এই
ক্ষতিকর অবস্থা থেকে বাঁচাতে এখনই সচেতন
হওয়া দরকার। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে এই
বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। ভবিষ্যতে
একটি সুস্থ জাতি উপহার দিতে হলে আমাদের
এখন থেকেই উপযুক্ত পদক্ষেপ নিতে হবে।

[অধ্যাপক এ. কে আজাদ খান : চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও
সমাজকর্মী। মহাসচিব, বাংলাদেশ ডায়াবেটিক সমিতি।
ফরিদ কবির : কবি ও প্রাবন্ধিক। উপ-পরিচালক
(প্রকাশনা ও জনসংযোগ) বাংলাদেশ ডায়াবেটিক
সমিতি]

—‘প্রথম আলো’ থেকে সংকলিত ও সংক্ষেপিত

সফট ড্রিংকস : শিশুর এক নীরব ঘাতক!

ডা. প্রণব কুমার চৌধুরী

সফট ড্রিংকস বা কোমল পানীয় এবং তার সঙ্গী
কিছু খাবার ইদানীং যুগলবন্দি হয়ে সারা পৃথিবীতে
ছড়িয়ে দিয়েছে অন্যরকম খাদ্য সংস্কৃতি। কোমল
পানীয় নামটি অত্যন্ত আদুরে হলেও এই পানীয়
আমাদের জন্যে কতটুকু কোমল সেটা নিয়ে শুরু
হয়ে গেছে দ্বন্দ্ব। তবুও সফট ড্রিংকসের চাহিদা
প্রতিটি দেশে হ্রস্ব করে বেড়ে চলেছে। ৪ থেকে ২০
বছর বয়সীদের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা অত্যধিক।
এমনকি এই কোমল পানীয় শিশু খাবার দুধের স্থান
পর্যন্ত টলিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু দুধের স্থান কি পূরণ
করতে পারছে এই সফট ড্রিংকস?

কী আছে এসব কোমল পানীয়তে? বিভিন্ন
সফট ড্রিংকসের উপাদানসমূহ বিশ্লেষণে বেরিয়ে
এসেছে অনেক তথ্য। এসব ড্রিংকসে মিষ্টতা

আনার জন্যে যেসব উপাদান ব্যবহৃত হয় তা হলো
সুক্রোজ, গ্লুকোজ, ফ্রুকটোজ ও ইনটেন্স। আর
থাকে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ফসফরাস, কেফিন।
পানীয়ের পিএইচও ধর্তব্যের মধ্যে থাকা একটি
বিষয়।

এখন দেখা যাক, এসব সফট ড্রিংকসে কী
কোনো পুষ্টি বার্তা নিহিত আছে? পুষ্টির প্রধান
মাধ্যম মূলত অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট একথা
মানতেই হবে। তবে যে শিশু দৈনিক আধা
লিটারের বেশি কোমল পানীয়তে পাকস্থলি পূরণ
করছে তার বেশি ওজন হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
তাই বাচ্চা বেশি ওজন হওয়ার কারণ হিসেবে
এদিকে অনেকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করছে।

সফট ড্রিংকস অন্যভাবেও শিশুকে ক্ষতিগ্রস্ত
করে। শিশু দেহের প্রয়োজনীয় সুষম খাবার
উপাদান যথা কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন,
ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক খাবার
গ্রহণ করা থেকে শিশুকে বঞ্চিত করে সফট
ড্রিংকস। কারণ সে আগেই পেটে ঢুকে পেটের
ক্ষিদ্রে মিটিয়ে দিচ্ছে। দস্ত ক্ষয়রোগ বা ডেন্টাল
কেরিজ রোগটি যে শিশু সুক্রোজ, ফ্রুকটোজ,
গ্লুকোজ ভরা পানীয় বারবার পান করে চলেছে তার
মধ্যে বেশি বাসা বাঁধে। ফ্রুকটোজযুক্ত খাবারে
সন্দেহাতীতভাবে দেহে হাইপার ট্রাইগ্লিসেরিডেমিয়া
ও হাইপার কোলেস্টেরোলিমিয়া সৃষ্টিতে ভূমিকা
পালন করে। তাছাড়া ফ্রুকটোজ বা
হাইফ্রুকটোজকরণ সিরাপ বা সরবিটল মেশানো
কোমল পানীয়গুলো শিশুর ডায়রিয়া সমস্যা সৃষ্টি
করে।

এসব বিবেচনা করে আজকের আধুনিক
অভিভাবক বাবা-মা'দের প্রতি জানাচ্ছি সাধু
সাবধান!

[ডা. প্রণব কুমার চৌধুরী শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ, চট্টগ্রাম
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল]

—প্রথম আলোর স্বাস্থ্য নকশা অবলম্বনে

মাটির ব্যাংকে দান : সমস্যা মুক্তির পথ করে দিয়েছে

আমি এখন সুস্থ

নাহীদ সুলতানা

বঞ্চিতের সেবায় মাটির ব্যাংকে অর্থ দানের সুফল অন্য দশজনের মতো আমিও পেয়েছি। কিছুদিন আগে হঠাৎ করে আমার কিডনীর সমস্যা দেখা দেয়। হাতে-পায়ে পানি জমতে শুরু করে এবং আমি বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ি। ডাক্তার বড় বড় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে আসতে বলেন। সবাই অনুমান করছিলো যে বড় ধরনের কোনো সমস্যা হয়েছে। ডাক্তারের ইঙ্গিতেও সেরকমটাই মনে হয়েছে। এবার নামিয়ে আনলাম মাটির ব্যাংক। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা নিয়ত করে ফেললাম ব্যাংকে। অথচ কোর্স করার পর ব্যাংকটি আমি উঠিয়ে রেখেছিলাম একটা তাকের উপর। ব্যাংকে টাকা ফেলার সুফল পেলাম খুব শীঘ্রই। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ডাক্তারের কাছে যেতেই তিনি বললেন, ছোট-খাটো ইনফেকশান, ভয়ের কিছু নেই। পরম করুণাময়ের অশেষ রহমতে আমি এখন সুস্থ।

[নাহীদ সুলতানা কামরুল্লাসা গার্লস স্কুলের শিক্ষিকা, ৯৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

বঞ্চিতের সেবায় আমাদের কল্যাণে মাটির ব্যাংক

মামুন ইসলাম

আমার ছোট বোনের দ্বিতীয় বাচ্চার ডেলিভারি হবে। ফোন পেয়ে ছুটে গেলাম ক্লিনিকে। সফলভাবে একটি পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে। কিন্তু আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলো কঠিন এক দুঃসময়। ১০ মিনিট পর তার তীব্র চাঁৎকার শুনলাম। জানতে পারলাম আরেকটি বাচ্চা রয়ে গেছে তার গর্ভে। ততক্ষণে স্টিচ দেয়া হয়ে গেছে। দেশের প্রখ্যাত একজন বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে থাকলেও আলট্রাসোনোগ্রামে কখনোই ধরা পড়ে নি শিশুটির উপস্থিতি। এই মুহূর্তে অপারেশন করা প্রয়োজন অথচ এ্যানেসথেটিস্ট নেই এবং তার আসতে দেরি হবে। বোনের জীবন আশঙ্কায় মাটির ব্যাংকে টাকা মানত করলাম। তবুও অস্থির লাগছিলো। নিচে গিয়ে ফোন করে তখনি টাকটা মাটির ব্যাংকে ফেলতে বললাম। উপরে এসে শুনি বাচ্চা হয়ে গেছে। অনুভব করলাম দুঃখী বঞ্চিত মানুষের জন্যে বাবলে, স্রষ্টা তাকে রক্ষা করেন। পরম করুণাময়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠলো। অসতর্কতায় বাচ্চার একটা পা ভেঙে গেছে। যেখানে তার জীবনাশঙ্কা ছিলো সেখানে মাত্রতো একটি পায়ের উপর দিয়ে গেছে। শুকরিয়া জানালাম বারবার, বিশ্বাস আরও দৃঢ় হলো মাটির ব্যাংকের কার্যকারিতায়।

সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ছেলের খোঁজ পেলাম

রাহেলা বেগম

মাটির ব্যাংক নিয়ে রয়েছে অসংখ্য বিস্ময়কর সাফল্যের ঘটনা। আমিও ভীষণভাবে উপকৃত হয়েছি বিভিন্ন সময়ে মাটির ব্যাংকে টাকা ফেলে। ক’দিন আগের কথা, আমার স্কুল-পড়ুয়া ছোট ছেলে বাসায় ফিরতে দেরি করছিলো। স্কুল থেকে যেখানে সকাল ১১টায় ফেরার কথা, সেখানে বিকেল ৪টা পর্যন্তও সে না ফেরাতে খুব অস্থির লাগছিলো। নিয়ত করে টাকা ফেললাম মাটির ব্যাংকে। ছেলের তখন কোনো খোঁজ-খবরই পাওয়া যাচ্ছিলো না, এমন সময় হঠাৎ আমার চোখ পড়ে নামহীন ফোন নম্বর লেখা এক টুকরো কাগজের উপর। ফোন করে জানতে চাই অমুক স্কুলের অমুক শ্রেণীর কোনো ছাত্র ঐ বাসায় থাকে কি না। আশ্চর্যজনক হলেও সত্যি যে, আমার ছেলেরই এক বন্ধু ঐ বাসায় থাকে এবং আমিও খোঁজ পাই আমার ছেলে কোথায় আছে, কেমন আছে, কার সাথে আছে। নিশ্চিত হয়ে কৃতজ্ঞতা জানাই পরম করুণাময়কে।

[রাহেলা বেগম, ব্যাংকার, ১০০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

রহমতের ব্যাংক মাটির ব্যাংক এন নাহার রিনা

মাটির ব্যাংককে অনেকে বলে ম্যাজিক ব্যাংক, আমি বলি রহমতের ব্যাংক। তাৎক্ষণিক সংকট থেকে মুক্তির জন্যে পরম করুণাময়ের নাম স্মরণ করার পাশাপাশি এটাকেই আমার মনে হয় সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। মাটির ব্যাংকের মাধ্যমে আমি বহু সাফল্য পেয়েছি। বছর দুয়েক আগে আমার মামাশুধর একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। ৮ ঘণ্টা যাবত তার কোনো জ্ঞান ছিলো না। আমি হাসপাতাল থেকে এসেই মাটির ব্যাংকে টাকা ফেলি তার সুস্থতার নিয়তে। আল্লাহর রহমতে তিনি সুস্থ হয়ে ওঠেন।

আমার অফিসের কাজে বাধা আসছিলো। অথচ কাজটা হলে কয়েক হাজার টাকা আয় সম্ভব। ১০০ টাকা ফেললাম ব্যাংকে, কাজ হলো না। আবার ফেললাম, কিন্তু ফল পেলাম না। তৃতীয়বারের মতো ১০০ টাকা ফেললাম এবং আল্লাহর রহমতে সফল হলাম।

[এন নাহার রিনা, চাকরিজীবী, ৮ম ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

প্রত্যাশিত উপায়ে সমাধান মায়মুনা বেগম

হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলাম ছোট ছেলেটিকে ইংলিশ মিডিয়াম থেকে এনে বাংলা মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করাবো। মাটির ব্যাংকে মানত করলাম যাতে ভালো একটি স্কুলে তাকে ভর্তি করাতে পারি।

সব স্কুলের ভর্তি পরীক্ষা ততদিনে শেষ, একমাত্র সেন্ট জোসেফ ছাড়া। সেখানেই পরীক্ষা দিলো কিন্তু সুযোগ হলো ওয়েটিং লিস্টে। শেষ পর্যন্ত ওয়েটিং লিস্টেও ডাকা হলো না। স্বভাবতই চিন্তিত হলাম। কিন্তু বিশ্বাস ছিলো কিছু একটা হবেই। এ সময় আকস্মিকভাবে প্রায় ১০/১২ বছর পর আমাদের এক আত্মীয় বাসায় এলেন। অফিসার এই আত্মীয় আমার ছেলের ভর্তির জন্যে চেষ্টা করলেন। তার সহযোগিতায় আল্লাহর অশেষ রহমতে আমার ছেলে এখন বিএএফ শাহীন স্কুল এন্ড কলেজের ৩য় শ্রেণীর ছাত্র। তাছাড়া স্কুলটি বাসার কাছে হওয়ায় যাতায়াত সুবিধাও পাচ্ছি যা অন্য কোথাও পেতাম না। মাটির ব্যাংকে মানতের উসিলায় আল্লাহর অশেষ রহমতের ফল পেলাম।

[মায়মুনা বেগম, গৃহিণী, ৮৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

বুকপকেটই হয়ে গেলো মাটির ব্যাংক

মো. সাকি মাহমুদ

সাফল্য জন্ম দেয় আত্মবিশ্বাস এবং আত্মবিশ্বাস জন্ম দেয় আরও সাফল্যের। মাটির ব্যাংকে আমার সাফল্য যেন দিনদিন বেড়েই চলেছে। গত জুন মাসের ঘটনা। এক দুপুরে রেস্টুরেন্টে বসে খাচ্ছি এবং পরবর্তী কাজের প্রোগ্রাম ঠিক করছি। হঠাৎ ঘটলো দুর্ঘটনা। অন্যমনস্ক অবস্থায় খাবারের সাথে ‘তার’ জাতীয় কোনো জিনিস গিলে ফেলেছি। গলায় আটকে গেলো এবং টের পেলাম সমূহ বিপদ। সঙ্গে সঙ্গে মানিবা্যাং থেকে টাকা বের করে বুক পকেটে রাখলাম। বুকপকেটই হয়ে গেলো আমার মাটির ব্যাংক। কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম বিপদ নামছে খাদ্যনালী দিয়ে এবং পেটের মধ্যেও ব্যথা অনুভূত হচ্ছিলো মাঝে মাঝে। কিন্তু টাকা ফেলে আল্লাহকে ডাকলাম। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলাম মহান স্রষ্টার কাছ থেকে নিরাময়ের জন্যে। পরদিন থেকে আমি সুস্থ। খাদ্যনালী বা পাকস্থলীতে কোনো সমস্যাই ঘটলো না। স্রষ্টার অপার রহমত অনুভব করলাম।

[মো. সাকি মাহমুদ, চাকরিজীবী, ১২৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ইসলামের দৃষ্টিতে সাদাকা বা দানের গুরুত্ব

মওলানা ছায়ীদুল হক

স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে মানুষের প্রধান দায়িত্ব হলো সৃষ্টির সেবা। সৃষ্টির এই সেবা যাতে যোগ্যতা এবং সততার সাথে করা যায় সেজন্যে স্রষ্টা প্রদান করেছেন নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাতের মতো ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা বা আত্মশুদ্ধিমূলক কার্যক্রম। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আমাদেরকে আত্মশুদ্ধি এবং হক্কুল ইবাদ– এই দুই ধরনের কাজেই সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দিচ্ছে। হক্কুল ইবাদের প্রধান চালিকাশক্তি হলো অর্থ। অর্থ আয় এবং ব্যয়– এই দুই ব্যাপারেই আমাদের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা উচিত।

আমরা মনে করি, মেধা ও শ্রম খরচ করে বৈধ পন্থায় আমি যে অর্থ উপার্জন করছি তার মালিক আমি। এটা খরচ করা, জমিয়ে রাখা বা কাউকে দেয়া সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছাধীন। কিন্তু সত্য হলো এই যে, নিজেকে যদি আমি স্রষ্টার প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করি, তাহলে আমার সং উপার্জনের মাধ্যমে যে সম্পদ আমার হাতে এসেছে তার শুধু প্রতিনিধি আমি, নিরংকুশ কোনো মালিক নই। এর উপরে ষোল আনা অধিকার আমি প্রয়োগ করতে পারি না। বরং এই অর্থের নিরংকুশ মালিক হলেন তিনি, যার প্রতিনিধিত্ব আমি করছি– অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা। এ ব্যাপারে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে “তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর পথে সম্পদ খরচ করছ না। অথচ আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের প্রকৃত মালিক আল্লাহ। *(সূরা আল হাদীদ, আয়াত ১০)।*

বস্তুত, আমরা নিজের সম্পদ বলে যাকে মনে করি সেটা আসলেই আমার সম্পদ কি না সে ব্যাপারে নবীজীর একটি বাণী উল্লেখযোগ্য। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে তার নিজের সম্পদের চাইতে উত্তরাধিকারদের সম্পদকে বেশি ভালবাসে? সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.), “এমন কেউ তো আমাদের মধ্যে নেই।” বরং তার নিজের সম্পদই তার নিকট প্রিয়। রাসূল (সা.) তখন বললেন, তার নিজের সম্পদ তো সেটাই যা সে আল্লাহর পথে খরচ করেছে আর যে সম্পদ জমিয়ে রেখেছে তাতো উত্তরাধিকারীর। অর্থাৎ আল্লাহর রাস্তায়, মানবতার সেবায় ব্যয়ের মাধ্যমে যে সম্পদ আমার পরিত্রাণের উপায় হবে, সেই সম্পদই আমার। সেই প্রকৃত সম্পদ বাড়ানোর দিকে খেয়াল না করে আমরা নিজের সম্পদ মনে করে উত্তরাধিকারীদের জন্যে সম্পদ সঞ্চয় করতে থাকি।

দানের গুরুত্ব সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে আল্লাহপাক বলেন, “যারা গোপনে ও প্রকাশ্যে খরচ করে, রাগ-ক্রোধকে দমন করে, মানুষকে ক্ষমা করে, আল্লাহপাক এরকম সং কর্মশীলদের ভালবাসেন।”

অন্যদিকে দান না করার পরিণাম সম্পর্কে

কোরআনে আল্লাহ বলেন, “তোমরা তো ঐসব লোক যাদেরকে বারবার ডাকা হচ্ছে যে আল্লাহর পথে খরচ করো, কিন্তু তোমরা বখিলি (কৃপণতা) কর। শুনে রাখো, এই বখিলির (কৃপণতার) ফল তোমরাই ভোগ করবে। কারণ আল্লাহ ধনী আর তোমরাই দরিদ্র। তোমরা যদি এভাবে বখিলি করতেই থাকো তাহলে তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে অন্য একটি সম্প্রদায়কে এই দায়িত্ব পালনের জন্যে আমি নিয়ে আসবো এবং তারা তোমাদের মতো বখিল (কৃপণ) হবে না।” *(সূরা আলে-ইমরান, আয়াত ১২)।*

দানের ব্যাপারে আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গিও বদলাতে হবে যে দান করতে হবে ছেঁড়া ফাটা, পুরনো কাপড়-জিনিস বা ময়লা নোট। কারণ আল্লাহ বলেন, “তোমার কাজে লাগবে সেই (জিনিসের) দান যা তোমার বেশি প্রিয় এবং পছন্দের। কারণ তুমি কি

দিচ্ছ, আল্লাহ তা

ভালোভাবেই

জানেন।”

(সূরা

আলে-

ইমরান,

আয়াত ৯২)

অর্থাৎ যেখানে

স্বয়ং আল্লাহ

এভাবে বলছেন

যে, দানের বস্তু

সম্পর্কে তিনি

জানেন, তখন কী

দান করতে হবে তা

সহজেই বোঝা যায়।

দান করার ব্যাপারে

আমরা কেউ কেউ এই

দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করি যে,

দান শুধু তারাই করবে যারা

বিত্তশালী, যারা যাকাত দিতে

সমর্থ। ফলে দানের প্রসঙ্গ এলে

আমরা যারা নিজেদেরকে

এক্ষেত্রে অসমর্থ মনে করি, তারা

সচেতন হই না।

অথচ সূরা বাক্বারার শুরুতেই

আল্লাহপাক পবিত্র কোরআন থেকে হেদায়াত

লাভকারীদের পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে

একটিকে বলেছেন এভাবে, যে সম্পদ আমি

তাদেরকে দিয়েছি তারা তা থেকে খরচ (দান)

করে। অর্থাৎ এখানে সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা

সাড়ে বাহান্ন তোলা রূপা ইত্যাদি শর্তের

কোনো উল্লেখ নেই। বরং যে সম্পদই

বান্দাকে দেয়া হয়েছে তা থেকেই তাকে দান

করতে হবে, তা গাছে যদি একটি আম হয়

তার এক টুকরো হলেও অন্যকে দিতে হবে।

আবার ছাত্র-ছাত্রী বা গৃহিণী যারা আছেন

তাদের নিজস্ব উপার্জন না থাকলেও খরচের



অংশ বাঁচিয়ে তারা দান করতে পারেন বা দানের ব্যাপারে অভিভাবক ও স্বামীকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। আর যে শিক্ষার্থীরা টিউশনী করে, তারা এই ক্ষুদ্র উপার্জনেরও কিছু অংশ সাদাকায় ব্যয় করলে অশেষ বরকতের অধিকারী হবেন।

এখন আসা যাক, ব্যয় বা দানের খাত সম্পর্কে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহপাক বলেছেন, “হে নবী, লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞেস করছে আমরা কি খরচ করবো? তাদেরকে

বলে দিন, কল্যাণকর পথে ব্যয় হচ্ছে বাবা-মার জন্যে ব্যয়, আত্মীয়-স্বজনের জন্যে ব্যয়, এতিমের জন্যে ব্যয়, দরিদ্রের জন্যে ব্যয় এবং পথিকের

জন্মে ব্যয়। আর যে কল্যাণকর কাজ তুমি করবে আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত আছেন।” *(সূরা বাক্বারা, আয়াত ২১৫)* এ প্রসঙ্গে নবীজী (সা.)-ও বলেছেন, “উত্তম সাদাকা হচ্ছে

নিজের পরিবারের জন্যে যে খরচ করা হয়।” এখানে লক্ষ্যণীয় যে, যাকাত দিতে গিয়ে

আমরা গরীব আত্মীয়-স্বজনদের অত্যধিক গুরুত্ব দিই। অথচ গরীব

আত্মীয়-স্বজনকে যাকাত নয়, সাদাকা দিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বরং যাকাতের ক্ষেত্রে এভাবে আত্মীয়-স্বজনদের ব্যক্তিগতভাবে প্রাধান্য দেয়ার চিন্তা সম্পূর্ণ অমূলক ও অবৈধ।

যাকাত এবং সাদাকার খাতের এই প্রসঙ্গের পর স্বাভাবিকভাবেই ফাউন্ডেশনের মাটির ব্যাংক কার্যক্রমের ধর্মীয় দিক সম্পর্কে কৌতূহল জাগবে। এ প্রসঙ্গে সূরা বাক্বারার ২৭৪ নম্বর আয়াতে আল্লাহপাক বলেছেন, “যারা তাদের সম্পদকে রাতের বেলা এবং দিনের বেলা খরচ করে অত্যন্ত গোপনে ও প্রকাশ্যে, তাদের এই দানের পুরস্কার তাদের

রবের নিকট রয়েছে। তাদের কোনো ভয় থাকবে না, তাদের কোনো ভয়ের বা পেরেশানীর কারণ নেই।”

অর্থাৎ এখানে মাটির ব্যাংকের সরাসরি প্রসঙ্গ না থাকলেও যখন বলা হচ্ছে দিনে, রাতে, গোপনে ও প্রকাশ্যে দান এবং এর মাধ্যমে ভয় ও পেরেশানী মুক্তি, তখনই আমরা এর বাস্তব দিকগুলো দেখতে পাই।

গভীর রাতে স্বামী বা সন্তান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা আপাতদৃষ্টে সমাধানের কোনো সহজ পথ নেই এমন গভীর বিপদে পতিত হলে, যে ভয় উদ্বেগ বা অস্থিরতা আমাদেরকে গ্রাস করে তা থেকে মুক্তি লাভের প্রার্থনা করে পরম করুণাময়ের উদ্দেশ্যে দানের সুযোগ আমরা তাৎক্ষণিকভাবে গ্রহণ করতে পারি এই মাটির ব্যাংকের মাধ্যমে। এর জন্যে আমাকে অন্য কোথাও যেতে হচ্ছে না বা দানের অর্থের সন্ধ্যবহার নিয়ে ভাবতে হচ্ছে না। আর সং নিয়ত এবং সজ্জবদ্ধ দানের সওয়াবের কারণে এই দানের বরকত এবং প্রতিদান প্রাপ্তির সাফল্যও অনেক বেশি।

দানের এই গুরুত্ব সম্পর্কে নিজেদের বুঝতে হবে এবং অন্যদেরকেও বোঝাতে হবে। এখানেও আমরা কেউ কেউ এই ভুল ধারণায় আক্রান্ত যে, আমরা নিজেরা যেহেতু দান করতে পারি না সেখানে অন্যদেরকে কীভাবে উদ্বুদ্ধ করবো।

এ প্রসঙ্গে, সূরা মাউনে আল্লাহ পাক বলেছেন, যারা বিশ্বাসী নয় তারা মিসকীনদের খাবার দেয়ার ব্যাপারে লোকদেরকে উদ্বুদ্ধ করে না। এখানে নিজেরা দেয় না সেকথা বলা হয় নি বরং বলা হয়েছে অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করে না। অর্থাৎ বিশ্বাসী হতে হলে দারিদ্র্য দূরীকরণে অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

দানের গুরুত্বের এই আলোচনা আমরা শেষ করবো নবীজী (সা.)-এর একটি হাদীস দিয়ে। একবার নবীজী (সা.) ওহুদ পাহাড়ের সামনে দিয়ে আবু হুরায়রা (রা.)-কে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আবু হুরায়রাকে জিজ্ঞেস করলেন, সামনে কী দেখা যায় ? তিনি উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা.) এটা ওহুদ পাহাড়। নবীজী (সা.) তখন বললেন, আমার যদি ঐ পরিমাণ স্বর্ণও থাকে, তবুও তা তিনদিনের বেশি থাকবে না! কারণ আমি তা দান করে দেবো। শুধু ঋণ থাকলে হয়তো কিছু থাকতে পারে।

অতএব, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সা.) যেখানে দানের ব্যাপারে এই দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করতেন, সেখানে আমাদের কতটা তৎপর এবং সচেতন হতে হবে তা সহজেই বুঝতে পারি। দান করতে সমর্থ হবার জন্যে একদিকে যেমন বিত্তবান হওয়ার প্রচেষ্টা চালাতে হবে, অন্যদিকে তার আগ পর্যন্ত সাধ্যমতো নিজের সামর্থ্য থেকেই দান করতে হবে এবং অন্যদেরকেও নিঃসঙ্কোচে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

[বিশিষ্ট খতিব ও ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মওলানা ছায়ীদুল হক পায়োনিয়ার ব্যাচের কোয়ান্টাম মাস্টার]

প্রশ্ন : আজ ৩২ বছর ধরে সংসার করছি। সামান্যতম কারণেও স্বামীর হাতে পিটুনি খেতে হয়েছে। এখনও হয়। শুধু সমাজে অপমানিত হবার ভয়ে নীরবে মুখ বুজে সহ্য করছি।

উত্তর : পুরুষ এবং নারীকে ঘিরে যে পরিবার গড়ে ওঠে, সেখানে পুরুষ পরিবারের প্রধান হলেও নারীই তার প্রাণ। কারণ পরিবার টিকে থাকে নারীকে ঘিরেই। কিন্তু গুরুত্বই গলদ। অর্থাৎ পরিবারের সবচেয়ে বিরক্তিকর এবং কষ্টকর কাজগুলো দিনের পর দিন করে গেলেও যেকোনো অপমানের বোঝা নিতে হবে নারীকে। স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে হবে দিনের পর দিন। নারীর প্রতি এই অন্যায় ও ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিই হলো পারিবারিক জীবনের অবিদ্যা যার অনিবার্য ফলাফল অশান্তি। কারণ পরিবারের একজন যদি অন্যজনের উপর জুলুম করেন সেখানে কখনো শান্তি থাকতে পারে না। অথচ পরিবার হচ্ছে এমন একটি জায়গা যেখানে সারাদিন কাজের পর, বন্ধুদের সাথে আড্ডা, ক্লাব-পার্টি, মদ এসব কিছুর পরও যেখানে তথাকথিত আধুনিক পুরুষকে ফিরতে হবে।

আপনার যে করুণ জীবনের কথা বললেন, ৩২ বছরের সংসারে অপমানের কথা বললেন, এটা কখনো হতো না যদি আপনার নিজের পরিচয় থাকতো, আপনার যে শেকড় অর্থাৎ পিতা-মাতার সংসারে আপনার ভিত্তি থাকতো। আমাদের সমাজে মেয়েরা সবসময়ই নিজস্ব পরিচয় সংকটে ভোগে। বিয়ের আগ পর্যন্ত বাবার অভিভাবকত্ব, বিয়ের পর স্বামীর এবং স্বামী মারা গেলে ছেলের অভিভাবকত্ব অর্থাৎ সবসময়ই একজন নারী অন্য কারও অধীনস্থ।

স্বামীর সংসারই মেয়েটির সব, বিয়ের পর তাকে পিতৃ পরিচয় ভুলে যেতে হবে ইত্যাদি সবই অবিদ্যা। বিয়ের মাধ্যমে দু'জন নারী-পুরুষ পারস্পরিক সমঝোতা ও সহযোগিতার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। নিজস্ব পরিচয় বিসর্জনের প্রশ্ন সেখানে অবাস্তব। নিজের পরিচয় সৃষ্টি ও তা ধরে রাখতে পারলে কাউকেই অপমানিত হতে হয় না।

প্রশ্ন : আমার স্বামী ব্যক্তিগত খুবই বদমেজাজী, আমার মান-ইজ্জতের কথা চিন্তা না করেই অনেক মানুষের মধ্যে আমাকে অপমান করে। আজ ১৫ বছর ধরে করছে। বারবার মনে হয় ডিভোর্স দিই।

উত্তর : দীর্ঘদিন ধরে নারীর প্রতি অন্যায় এবং ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিরই ফল এটি। নারীকে বলা হয়েছে ‘সকল পাপের উৎস’ হিসেবে। সাধারণভাবে আমরা জেনেছি যে হাওয়ার প্ররোচনায় আদম গন্ধম খেয়েছিলেন। অর্থাৎ আদমের স্বর্গচ্যুতির জন্যে দায়ী হচ্ছেন হাওয়া। তাই নারী যেহেতু পাপের উৎস, তাকে সবসময় দাবিয়ে রাখতে হবে। আর এজন্যে কতভাবে যে নারীকে অপমান করা হয়েছে তার শেষ নেই। যেমন, আমাদের বাংলায় বিখ্যাত ছড়া আছে, ‘আদা জন্ম শিলে, বউ জন্ম কিলে’ কিংবা ‘অভাগার মরে গরু, ভাগ্যবানের মরে জরু’ অর্থাৎ গরু মারা যাওয়াটা একটা ক্ষতি, কিন্তু জরু বা স্ত্রী মারা যাওয়াটা লাভজনক, কারণ তাতে নতুন স্ত্রী এবং বিয়ের সময় যৌতুক পাওয়া যাবে।

এমনকি আধুনিক সমাজের কবি সাহিত্যিকরাও নারীকে অশ্রদ্ধা করে সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু স্ত্রীকে এই দাসী বানিয়ে রাখার পরিণাম হচ্ছে সেই পরিবারে কখনো শান্তি বিরাজ করে না। তখন নারীর মধ্যে বিদ্রোহ প্রবণতা দেখা দেয়, সে পরিবার ভাঙতে উদ্বুদ্ধ হয়। পাশ্চাত্যে এখন এই সমস্যা প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে যেখানে প্রতি দশটি দম্পতির মধ্যে সাতটি দম্পতিই বিয়ে বিচ্ছেদের সম্মুখীন। আমেরিকায় প্রতি বছর ১৬ লক্ষ মহিলা স্বামীর হাতে

পরিবার ও সুসম্পর্ক বিষয়ক প্রশ্ন

উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

নির্মমভাবে প্রহৃত হন। পুরুষ ও নারী সেখানে এক চিরস্থায়ী সংঘর্ষে লিপ্ত। এই প্রহার সত্ত্বেও নির্যাতিতা নারীদের এক বিপুল অংশ ডিভোর্স থেকে বিরত থাকেন। এর কারণ হতে পারে দুটো। এক- নিজস্ব ‘শিকড়’ না থাকা; দুই- এরপরও স্বামীর প্রতি এক ধরনের আকর্ষণ।

প্রশ্ন : আমরা চার বোন, দুই ভাই। সবসময়ই দেখছি বোনদের চাইতে ভাইয়েরা সব ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাচ্ছে। তাহলে কি এটাই স্বাভাবিক?

উত্তর : আসলে আমাদের পারিবারিক জীবনের একটি অন্যতম অবিদ্যা হচ্ছে ছেলে আপন, মেয়ে পর এই দৃষ্টিভঙ্গি। এ নিয়ে ছড়াও আছে, ‘মেয়ের নাম ফেলি, পরে নিলেও গেলি, যমে নিলেও গেলি’। অন্যদিকে ছেলে যদি লম্পটও হয় মা-বাবা তার সাফাই গান। বলেন, আমাদের পরিবারের ছেলেরা এরকম একটু আধটু করেই। ছড়া হলো, ‘পুত্রের কালি, গঙ্গা জলের বালি’। অর্থাৎ গঙ্গার পানি প্রবাহে বালি যেরকম ভেসে চলে যায়, পুত্রের কালি অর্থাৎ কলঙ্কও সেভাবে ভেসে চলে যায়।

এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই বাবা-মায়েরা ছেলে-মেয়ের মধ্যে বৈষম্য করেন। খাবারে বৈষম্য করেন, শিক্ষায় বৈষম্য করেন। ছেলেকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করেন আর মেয়েকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিতে চান। কিন্তু একটি মেয়েরও যে শিক্ষার দরকার আছে, আত্ম পরিচিতির প্রয়োজন আছে, প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এই সচেতনতা তাদের হয় না। আর মা-বাবার এই বৈষম্যের কারণেই অধিকাংশ মেয়ে অনিশ্চয়তা এবং হীনম্মন্যতায় ভোগে। নিজের মেধা, যোগ্যতাকে খাটো করে দেখে। কারণ পিতামাতাই একজন নারীর আসল শেকড়। সেখানে যদি সে বঞ্চিত হয়, উপযুক্ত মর্যাদা ও আত্মবিশ্বাস না পায় তাহলে আর কোথাও সে মর্যাদা পেতে পারে না।

প্রশ্ন : বিয়ের জন্যে কনে বা বর পছন্দের ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি কি হওয়া উচিত?

উত্তর : বিয়ের ব্যাপারে অন্যতম ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি হলো অভিভাবকের পছন্দকে অগ্রাধিকার দেয়া। অনেক সময় পছন্দটা তারা ছেলে-মেয়ের উপর চাপিয়ে দেন। কিন্তু এর পরিণতি নিয়ে ভাবেন না। এটা ভাবেন না যে, জোর করে চাপানো এই সিদ্ধান্তের ফলে পরবর্তীতে বনিবনা না হলে বিচ্ছেদও ঘটতে পারে।

বিয়ে সম্পর্কিত এখনকার আধুনিক অবিদ্যা হচ্ছে ডেটিং। বিয়ের আগে ছেলে-মেয়ে একসাথে ঘোরাঘুরি করলে আভ্যন্তরীণভাবে ভালো হবে- এরকম ভাবে অনেকে। কিন্তু এর নীট ফলাফল কি? এটা আমরা দেখতে পাই ইউরোপ-আমেরিকার ডেটিং কালচারের পরিণতিতে। আমেরিকাতে গত পঞ্চাশ বছরে ডেটিং এর রেজাল্ট হলো নব্বই এর দশকে ৭০% ভাগ বিয়ে ডিভোর্স হয়ে গেছে।

আবার অনেক অভিভাবক তার বখাটে ছেলের সাথে একটি ভালো মেয়েকে বিয়ে দিতে চান এই

আশায় যে এতে ছেলেটা ভালো হয়ে যাবে। অথচ ছেলে তো ভালো হয়ই না, মেয়ের জীবনটা সে নষ্ট করে ফেলে। অধরনের অভিভাবকরা অপরাধী হিসেবে গণ্য। তাছাড়া পাত্র যদি প্রচুর উপার্জন করে, তা হারামভাবে হলেও, তখন সেই পাত্রই অত্যন্ত সমাদৃত হয়।

একইভাবে বিদেশি পাত্র শুনলেই মা-বাবারা বর্তে যান। তাড়াতাড়ি বিয়ে দেবার জন্যে প্রত্যাশিতায় নামেন। আবার ম্যারেজ মিডিয়ার মাধ্যমে বিয়ে হলো বিবাহ সম্পর্কিত অবিদ্যার লেটেস্ট সংযোজন। এসব কিছু হলো ভুল দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণ। বিয়ের ক্ষেত্রে সবসময় মনে রাখতে হবে বিয়ে দিলে বা বিয়ে করলেই দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। কারণ সুখী বিয়ে মানে দু’টি মানুষ ও দু’টি পরিবারের মধ্যে বোঝাপড়া এবং সুসম্পর্কের সহাবস্থান। অনেক ধনী বর বা শ্বশুর পক্ষ হলেই বিয়ে সুখের হয় না, এর জন্যে দরকার দু’টি পরিবার এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে চেতনার মিল।

প্রশ্ন : শিশুরা বাবা-মার ভালবাসা চায়। কিন্তু অল্প বয়স থেকেই বাবার অতি গাভীর এবং ক্রোধ ছিলো আমার উপর। ফলে আমি তাকে বাবা বলে সম্বোধন করতে পারতাম না। এর জন্যে আমার শান্তি হয়েছিলো ম্যাচের কাঠিতে আঙুন ধরিয়ে পেটের সামনে ধরা। আমার চাওয়া ছিলো শুধু তাদের একটু মুখের হাসি, তাদের ভালবাসা।

উত্তর : সন্তানের ব্যাপারে বাবাদের একটি অবিদ্যা আছে। অনেক বাবা আছেন পরিবারের সবাইকে ধমকের উপর রাখেন, ছেলে-মেয়েকে সারাক্ষণ ভয়ের মধ্যে রাখেন। তাদের ধারণা এরকম গভীর, কড়া মেজাজের বাবা বা স্বামী হতে পারলেই বোধ হয় ভালো শাসন করা যাবে।

কিন্তু তারা যে কত ভুল দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করছেন তা তারা বুঝতে পারেন অনেক পরে যখন বেশি বয়সে তারা ছেলে-মেয়ের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হন। কারণ যতদিন তার কর্মক্ষমতা থাকে, ততদিন সবই মুখ বুজে এই অন্যায় কর্তৃত্ব মেনে নেয়, কিন্তু ছেলে-মেয়েরা স্বনির্ভর হয়ে গেলেই বৃদ্ধ, অর্থব পিতার প্রতি অবহেলার মাধ্যমে তারা তাদের অতীত ক্ষোভের প্রকাশ ঘটায়।

আপনার সামনে যেহেতু এখন সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে, তাই আপনার দায়িত্ব হলো নিজেরই এগিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ বাবা বলে সম্বোধন করে আপনাকেই তার সাথে সম্পর্ক সহজ করে নিতে হবে।

প্রশ্ন : নারীদের অধিকার নিয়ে অনেক কিছু বলেছেন। আগে আমাদের মা-খালারা অনেক নম্র ছিলেন। কিন্তু বর্তমানে আমাদের বোন কিংবা স্ত্রীরা উগ্র মেজাজের। এ ব্যাপারে তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন কি?

উত্তর : আগের দিনের মা-খালাদের কোনো গুরুত্ব ছিলো না। তারা দাসী হিসেবে গণ্য হতেন। আর এখনকার স্ত্রীরা বা বোনেরা কিছুটা পড়াশোনা করছেন, আত্মসচেতন হয়ে উঠছেন। কিন্তু তারা উগ্র মেজাজী এ অভিযোগ সঠিক নয়। বরং প্রথমে আপনার উগ্র মেজাজ দেখে বা আপনার অন্যায় আচরণ দেখে সে উত্তেজিত হয় বা প্রতিবাদী হয়। আর মেজাজের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। মহিলাদের আবেগ বেশি, রাগের মাত্রাটাও তাই বেশি মনে হয়। কিন্তু একজন মহিলা মানসিকভাবে অসুস্থ না হলে তার ভাইয়ের সাথে বা স্বামীর সাথে খারাপ ব্যবহার করতে পারে না। আর বাস্তবতা হচ্ছে একজন বোন তার ভাইয়ের জন্যে যে ত্যাগ স্বীকার করে, যতটা ফিল করে, একজন ভাই সাধারণভাবে তার বোনের জন্যে তা করে না।



শিশুকাননের সুরভিত সাফল্য

রঙ-বেরঙের উজ্জ্বল বালমলে ডানাওয়ালা পোশাক পরা একদল ক্ষুদে শিশু নেচে বেড়াচ্ছে প্রজাপতির মতো। কল্পনা করতেই অসাধারণ। বাস্তবটা ছিলো তার চেয়েও দারুণ। “প্রজাপতি প্রজাপতি” গানের তালে তালে ক্ষুদে শিশুদের নাচের নৈপুণ্য দেখে মনে হচ্ছিলো সত্যিই বুঝি এক বাঁক প্রজাপতি উড়ে এসে নেচে বেড়াচ্ছে ফুলে ফুলে।

গত ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে লামা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত ডিসপ্লেতে অংশগ্রহণকারী শিশুকাননের নার্সারী ও ১ম শ্রেণীর বাচ্চারা এভাবে বিমোহিত করে তুলেছিলো দর্শকদের।

শাহ আলমের নেতৃত্বে প্যারেড ও ঢাকা থেকে



বিজয় দিবসের ডিসপ্লেতে প্রজাপতির সাজে শিশুকানন স্কুলের ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা

আগত প্রো-কোয়ান্টার ফেরদৌসী জামান প্রতিভার তত্ত্বাবধানে ডিসপ্লে প্রস্তুতি চলে মাত্র ১০ দিন। আর এ ব্যাপারে সবরকম সহযোগিতা করেছেন বুরহানুর রহমান।

প্রথমে অনুষ্ঠিত মার্চ পাঙ্গে ২য় স্থান অধিকার করার পর মনোমুগ্ধকর ডিসপ্লেতে অংশ নিয়ে শিশুকাননের ক্ষুদে বাচ্চারা জয় করে আনে ১ম পুরস্কার। বিচারকদের অকুণ্ঠ প্রশংসার মাঝে এ দলটি আরও অর্জন করে একটি বিশেষ ধন্যবাদ পুরস্কার।

বান্দরবানেও শিশুকানন প্রথম

মুগ্ধ দর্শকদের তুমুল করতালি আর অকুণ্ঠিত অভিনন্দনের মাঝে বান্দরবানে বিজয় উৎসবের ডিসপ্লেতে ১ম পুরস্কার জিতে নিয়েছে কোয়ান্টাম শিশুকানন। ১৬ ডিসেম্বর বালাঘাটা পুলিশ লাইন মাঠে “প্রজাপতি প্রজাপতি” গানের সাথে মনোমুগ্ধকর ডিসপ্লেতে চমৎকার নৈপুণ্য দেখিয়ে শিশুকাননের অংশগ্রহণকারীরা এই সম্মান অর্জন করে। পাশাপাশি মার্চ পাঙ্গে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়ে পেয়েছে ৩য় পুরস্কার।

মাত্র ১ নম্বরের জন্যে ফক্ষে গেছে প্রথম পুরস্কার। বিচারকদের রায়ে অন্য দু’টি দলকে ৬০ এবং শিশুকাননকে ৫৯ নম্বর দেয়া হয়। যুগ্মভাবে প্রথম হওয়ার নিয়ম না থাকায় শিশুকাননকে ৩য় স্থানেই সম্ভব থাকতে হয়েছে।

প্রধান অতিথি পুরস্কার বিতরণের আগে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আগত শিশুকাননের ভূয়সী প্রশংসা করেন। উল্লেখ্য, পুলিশ, আনসার-ভিডিপি, গার্লস গাইড এবং প্রায় ৩৬টি সরকারি-বেসরকারি স্কুল এতে অংশ নেয়।

প্রতিবেদক : আলী আহসান

ধানমণ্ডি শাখার পুনঃ-উদ্বোধন

গত ১৯ ডিসেম্বর, ২০০৩ ধানমণ্ডি শাখার কার্যক্রম পুনরায় শুরু হয়েছে। ধানমণ্ডি শাখার পুনঃ-উদ্বোধন ঘোষণা করতে উপস্থিত ছিলেন শ্রদ্ধেয়া মা-জী। অনুষ্ঠানে তিনি ছাড়াও বক্তব্য রাখেন পরিচালক সমন্বয় বেগম সুরাইয়া রহমান, মওলানা ছাইদুল হক এবং ধানমণ্ডি শাখার পরিচালক মিসেস হোসনা ইয়াসমিন নূপুর। ধানমণ্ডি শাখার সদস্যরা ছাড়াও অন্যান্য শাখা-সেলের পরিচালক, নির্বাহী এবং সদস্যদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে করে তোলে আরও প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয়।

নতুন করে ধানমণ্ডি শাখার কার্যক্রম শুরু হওয়ায় শ্রদ্ধেয়া মা-জী সকলকে সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করতে আহ্বান জানান।

মা-জী বলেন, শুধু হক্কুল্লাহ করে যে পরিত্রাণ নেই, হক্কুল ইবাদও যে করতে হবে তা আমরা এখন বুঝেছি। তিনি সকলকে আরও বেশি হক্কুল ইবাদে সম্পৃক্ত থাকার জন্য আহ্বান জানান। গুরুত্ব নির্দেশনায় সুন্দরভাবে শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হোক তিনি এই প্রার্থনা করেন।

ধানমণ্ডি শাখার ঠিকানা :

‘লাভলী’, বাড়ি # ৬৫, রোড # ৬/এ

ধানমণ্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯

ফোন : ৮১১৫৫৫৫, ৯১১২১২৮



ধানমণ্ডি শাখার পুনঃ-উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন শাখার পরিচালক হোসনা ইয়াসমিন নূপুর। পাশে উপবিষ্ট (বাঁ থেকে) পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান ও মা-জী নাহার আল-বোখারী

চট্টগ্রাম ও সিলেটে অবিদ্যা শীর্ষক গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ

গত ২ জানুয়ারী, ২০০৪ চট্টগ্রামের শাহ আলম বীর উত্তম মিলনায়তনে বহুল আলোচিত বিষয় ‘অবিদ্যা’ প্রথম পর্বের ওয়ার্কশপের মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম সেন্টারের ২০০৪ সালের কার্যক্রমের সূচনা হয়। ৪ শতাধিক গ্রাজুয়েট এতে অংশ নেন। দিনব্যাপী এ ওয়ার্কশপে গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক ‘জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যের মনছবি পুনর্নির্মাণ এবং তা বাস্তবায়নের জন্যে ২০০৪ সালের পরিকল্পনা’ বিষয়ক মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে ওয়ার্কশপের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

গত ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৩ সিলেট শহরের তালতলাস্থ গুলশান সেন্টারে দিনব্যাপী ‘অবিদ্যা পর্ব-২’ গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। দেড় শতাধিক গ্রাজুয়েট এতে অংশ নেন। এ পর্বে গুরুজী জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কিত অবিদ্যাগুলোকে চিহ্নিত করেন।

হাতিরপুল ও নারায়ণগঞ্জ সেলের ঠিকানা পরিবর্তন

গত ১ নভেম্বর, ২০০৩ থেকে হাতিরপুল সেলের ঠিকানা পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবর্তিত ঠিকানা- ১৬৩/১, ক্রিসেন্ট রোড (৩য় তলা), গ্রীন রোড, ঢাকা-১২০৫। ফোন : ০১৯৩৮৫২৩৬, ৮৬১৮৩০৭। নারায়ণগঞ্জ সেলের স্থান পরিবর্তন : নতুন ঠিকানা- কমপিটেন্ট একাডেমী, ১৫৮ বি.বি. রোড, প্যানোরমা প্লাজা (৬ষ্ঠ তলা), চাষাড়া, নারায়ণগঞ্জ। ফোন : ৯৭১৬০৫১।

সিলেট সেন্টারে সাইকি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

গত ১৯ ডিসেম্বর, ২০০৩ শুক্রবার সিলেট সেন্টারে দিনব্যাপী সাইকি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ৪২ জন সাইকি অংশগ্রহণ করেন। সেন্টারের পরিচালক জনাব সীতাব আলীর পরিচালনায় ওয়ার্কশপে সাইকি চর্চা এবং ফাউন্ডেশনের সাইকি কার্যক্রমের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়।

উত্তরা শাখার দায়িত্বশীল ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

গত ২ জানুয়ারী, ২০০৪ উত্তরা শাখায় দিনব্যাপী দায়িত্বশীল ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। অগ্রসর গ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টারসহ প্রায় চল্লিশ জন এ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন।



উত্তরা শাখার দায়িত্বশীল ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান

ল্যাবের নতুন সংযোজন : প্লাটিলেট ইনকিউবেটর

প্লাটিলেট সংরক্ষণের লক্ষ্যে গত ১০ ডিসেম্বর ২০০৩ তারিখে কোয়ান্টাম ব্লাড সেন্টারে একটি নতুন প্লাটিলেট ইনকিউবেটর সংযোজিত হয়। প্লাটিলেটের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী একে সবসময় ২০°-২২° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আনুভূমিকভাবে ৭০ আরপিএম-এ (রোটেশন পার মিনিট) নিরব-চ্ছিন্নভাবে নাড়াতে হয়। তা না হলে এর সেলগুলো দ্রুত মরে যায়। ল্যাবের এ নতুন মেশিনে ২০°-২২° সেলসিয়াস তাপমাত্রার ব্যবস্থা রয়েছে এবং হরাইজনটাল অ্যাজিটের একে নিরবচ্ছিন্ন নাড়াতে থাকে। ফলে এ প্লাটিলেট ইনকিউবেটর ৩-৫ দিন পর্যন্ত এর গুণাগুণ অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে।

আগে রক্তের ৯টি উপাদানের ৮টি সংরক্ষণ করা গেলেও প্লাটিলেট সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় তা তৎক্ষণাৎ সেল সেপারেটর সেন্ট্রিফিউজ মেশিনে প্রস্তুত করে দিতে হতো। কিন্তু বর্তমানে তা আগে থেকেই পৃথক করে প্লাটিলেট ইনকিউবেটরে সংরক্ষণ করা সম্ভব।

সেল সেপারেটর সেন্ট্রিফিউজ মেশিন, -৮৫° সেলসিয়াস তাপমাত্রার ডীপ ফ্রিজ ও এলাইজা মেশিনের পর এই প্লাটিলেট ইনকিউবেটর কোয়ান্টাম ল্যাবকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার পাশাপাশি পরিণত করেছে আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবে।

প্রতিবেদক : শাহেদ হাসনা ইন রাবিত



কোয়ান্টাম ল্যাবে প্লাটিলেট ইনকিউবেটর

ব্লাড ক্যাম্প সংবাদ



মেরিনার্স ইয়াং ক্লাবের ব্লাড ক্যাম্পে বাংলাদেশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জি.এম. কুদ্দুস, ক্লাবের সেক্রেটারী জনাব আলমগীর ও ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজী মাহতাব উদ্দীন আহমদ।

দীর্ঘ এক মাস রমজানের বিরতির পর ব্লাড ক্যাম্প আবার তার স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় ফিরে এসেছে। ডিসেম্বর মাসে সর্বমোট ৯টি ক্যাম্প থেকে সংগৃহীত রক্তের পরিমাণ ৭২৫ ব্যাগ।

৪ ডিসেম্বর হাতিরপুল সেল ও মতিঝিল শাখার যৌথ উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্টাডিজ অনুষদে অনুষ্ঠিত হয় এ মাসের ১ম ব্লাড ক্যাম্প। ঈদের পর পরই আয়োজিত এ ক্যাম্পে সংগ্রহ হয় ২১ ব্যাগ।

৬ ডিসেম্বর মৌচাকস্থ মনি মুকুর স্কুলে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পে সংগৃহীত রক্তের পরিমাণ ৫২ ব্যাগ। ক্যাম্পটি মগবাজার শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়।

১৫ ডিসেম্বর গেন্ডারিয়া শাখার উদ্যোগে মাস্টার মাইন্ড স্কুলে ২ ঘন্টার একটি সংক্ষিপ্ত ক্যাম্পে ২৫ ব্যাগ রক্ত সংগৃহীত হয়। এখানে সাধারণত নির্দিষ্ট কিছু শিক্ষক এবং 'এ' লেভেল এর কিছু ছাত্র/ছাত্রীরা রক্ত দিয়ে থাকে।

১৭ ডিসেম্বর মোহাম্মদপুর ও মতিঝিল শাখার উদ্যোগে আহসান উল্লাহ ইউনিভার্সিটিতে ২য় বারের মতো ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। সংগ্রহ ১২৫ ব্যাগ। এই

ক্যাম্পের ১ ব্যাগ রক্তও ডিসকার্ডেড হয় নি। এটি ছিলো ক্যাম্পটির একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য।

১৯ ডিসেম্বর মেরিনার্স ইয়াং ক্লাবের উদ্যোগে ও মতিঝিল শাখার সহযোগিতায় ৩য় বারের মতো ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়ে। সংগৃহীত রক্তের পরিমাণ ১০৫ ব্যাগ। এখানে সাধারণত খেলোয়াড় এবং ক্লাবের সদস্যরা রক্তদান করে থাকেন।

মতিঝিল শাখার উদ্যোগে ইসলামপুর ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয় ২২ ডিসেম্বর। এখানে ৫ম বারের মতো ক্যাম্পটি অনুষ্ঠিত হয়। সংগৃহীত রক্তের পরিমাণ ১৭৩ ব্যাগ। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন আহসান মঞ্জিল সুপার মার্কেট বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির সহসভাপতি আলহাজ্ব জয়নুল আবেদীন।

২৪ ডিসেম্বর সবুজবাগ শাখার উদ্যোগে পল্লীমা সংসদে অনুষ্ঠিত ক্যাম্পে ৭৬ ব্যাগ রক্ত সংগৃহীত হয়। ১ম বারের মতো কর্মদিবসে অনুষ্ঠিত পরীক্ষামূলক ক্যাম্পটি সফল হয়। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলো পল্লীমা সংসদ।

২৭ ডিসেম্বর রাজধানী সুপার মার্কেটে মগবাজার শাখার উদ্যোগে ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। সংগৃহীত হয় ১০২ ব্যাগ। এটিও ছিলো একটি সফল ক্যাম্প। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ক্লাবের চেয়ারম্যান লুৎফর রহমান রতন এবং ভাইস চেয়ারম্যান আজমল বাবুল।

২৮ ডিসেম্বর ২০০৩ সালের সর্বশেষ ক্যাম্পটি অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা নিউ মার্কেট। সবুজবাগ শাখার উদ্যোগে ক্যাম্পটিতে সংগৃহীত রক্তের পরিমাণ ছিলো ৪৮ ব্যাগ। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলো নিউমার্কেট দোকান মালিক সমিতি।

প্রতিবেদক : সাইফুদ্দিন হাওলাদার অপু

ল্যাবে এসে রক্ত দিন

কোয়ান্টাম ব্লাড সেন্টার এখন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ল্যাবে পরিণত হওয়ায় রক্তের চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে ডোনারদের মধ্যেও বিপুল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে ল্যাবে রক্তদানের ব্যাপারে। গত ডিসেম্বর মাসে ল্যাবে সংগৃহীত হয় ৫১৮ ব্যাগ রক্ত যা এ যাবৎকালের সর্বোচ্চ ল্যাব সংগ্রহ। ল্যাবে রক্তদানের এই স্বাচ্ছন্দ্যবোধের কারণে এখন প্রতিদিনই নতুন নতুন ডোনাররা ল্যাবে এসে রক্ত দিচ্ছেন। আপনিও সময় হলেই ল্যাবে এসে রক্তদান করার মাধ্যমে পেতে পারেন এই মানসিক ও শারীরিক তৃপ্তি।

শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান

গত ১৪ জানুয়ারী, ২০০৪ কারকাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে অনুষ্ঠিত হয় শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান।

গত বছর ৬ জুলাই ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো সহস্র আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান। তারই ধারাবাহিকতায় এ বারের আয়োজন ছিলো শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান। স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক মাদাম নাহার আল বোখারী সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান শহীদ আল বোখারী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের ডিরেক্টর, মোটিভেশন শিল্পপতি কাজী মাহতাব উদ্দীন আহমদ। এছাড়াও বিশেষ বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের কো-অর্ডিনেটর, পাবলিক রিলেশন অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব এবং কো-অর্ডিনেটর, মোটিভেশন জনাব জহিরুল ইসলাম প্রিন্স।

প্রধান অতিথি তার ভাষণে ডোনারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, তাদের আন্তরিক দান ও সহযোগিতার ফলেই আমরা এতদূর অগ্রসর হতে পেরেছি। তিনি সবাইকে এ রক্তদান আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে নিজে রক্তদান এবং অপরকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য যে, এখন থেকে প্রতি মাসেই নতুন একশত আজীবন রক্তদাতাকে কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে আনুষ্ঠানিক সম্মাননা প্রদান করা হবে। পরবর্তী শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান হবে আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারী, ২০০৪।



শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে ট্রেস্ট গ্রহণ করছেন একজন রক্তদাতা

ধ্যান উৎসবে উদ্বোধন করা হবে নতুন ধ্যানঘর

ধ্যান উৎসব ২০০৪-এর প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে নতুন ধ্যানঘর। লামা মেডিটেশন রিসর্টে এ বছর পুরানো ধ্যানঘরের স্থানে বার্নার পাশে নতুন করে নির্মিত হয়েছে কাঠের পাটাতনের ওপর হাজার বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট নতুন ধ্যানঘর। এর সাথে রয়েছে ২০০ বর্গফুটের দক্ষিণা বারান্দা। এখানে এখন দুই শতাধিক ধ্যানী একত্রে দিন রাতে যে কোন সময় বার্নার পানির শব্দে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হয়ে ধ্যান বা কোয়ান্টায়নে বিভূক্ত মৌনতায় মগ্ন হওয়ার সুযোগ পাবেন। কাঠের পাটাতনের উপর ছনের ছাউনি হলেও ২০ ফুট প্রশস্ত ও ৫০ ফুট দৈর্ঘ্যের এ ঘরের মাঝখানে কোন খুঁটি ব্যবহার করা হয় নি।

ধ্যান উৎসব ২০০৪-এ অংশগ্রহণকারীরা ৫ মার্চ ভোরে লামায় পৌছবেন এবং ৭ মার্চ দুপুরে সেখান থেকে ফেরত যাত্রা করবেন।

জানুয়ারী মাসে ৯৭৭ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহ

২০০৪ সালের জানুয়ারী মাসে কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে ৯৭৭ ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান সরবরাহ করা হয়েছে। জানুয়ারী মাসে সংগৃহীত হয়েছে ৫৬৯ ইউনিট রক্ত, যার মধ্যে ৩৫৯ ইউনিট সংগৃহীত হয় ল্যাব থেকে।

মার্চ-এপ্রিল মাসের কর্মসূচি

ঢাকায় ১৭৭ ব্যাচের পরিচিতি সভা :

১০ মার্চ, ২০০৪ (বুধবার)

রাজশাহীতে ১৭৬ ব্যাচের কোর্স :

১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ মার্চ, ২০০৪

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

মেধায়ন ও সাফল্যায়ন :

১৭, ১৮ ও ২৪, ২৫ মার্চ, ২০০৪

(বুধ, বৃহস্পতি ও বুধ, বৃহস্পতিবার)

ঢাকায় ১৭৭ ব্যাচের কোর্স :

১৯, ২০, ২১ ও ২২ মার্চ, ২০০৪

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

ঢাকায় গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ :

২৬ মার্চ, ২০০৪ (শুক্রবার)

চট্টগ্রামে গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ :

২ এপ্রিল, ২০০৪ (শুক্রবার)

চট্টগ্রামে ১৭৯ ব্যাচের পরিচিতি সভা :

৩ এপ্রিল, ২০০৪ (শনিবার)

ঢাকায় ১৭৮ ব্যাচের পরিচিতি সভা :

৭ এপ্রিল, ২০০৪ (বুধবার)

ঢাকায় ১৭৮ ব্যাচের কোর্স :

১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ এপ্রিল, ২০০৪

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

চট্টগ্রামে ১৭৯ ব্যাচের কোর্স :

২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬ এপ্রিল, ২০০৪

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)



লামায় গুরুজীর ঈদ উদযাপন

আপ্যায়ন ও কোরবানীর মাংস বিতরণে সম্মুখেত সহস্রাধিক পাহাড়ি-বাঙালি



লামায় ঈদের
দিনে অভাগত
একজন পাহাড়ি
মেহমানের সঙ্গে
কোলাকুলি করছেন
গুরুজী

গত কয়েক বছরের মতো এবারও গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক কোয়ান্টাম পরিবারের এক গুরুত্বপূর্ণ ইউনিট লামা মেডিটেশন রিসর্টে পবিত্র ঈদুল আজহা উদযাপন করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান জেলার লামায় স্থাপিত এই রিসর্টে ঈদ উদযাপনের জন্যে এবার তার সঙ্গে শরীক হন ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী থেকে আরও প্রায় ৩০ জন নারী-পুরুষ।

দুর্গম পাহাড়ি এলাকার বঞ্চিত মানুষদের আলোকিত করার লক্ষ্যে যে সেবামূলক কার্যক্রমগুলো ফাউন্ডেশন এখানে চালাচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে স্কুল ও শিশু আবাস পরিচালনা, ম্যালেরিয়া নির্মূল, বৃক্ষ রোপণ এবং খাবার পানি, চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা। বছরের বিভিন্ন সময় পুরনো কাপড়-শীতবস্ত্র বিতরণ এবং প্রতি বছর পবিত্র কোরবানীর ঈদে আপ্যায়ন ও কোরবানীর মাংস বিতরণের মাধ্যমে প্রকৃত অভাবীদের চাহিদা মেটানোর চেষ্টা করছে ফাউন্ডেশন। কারণ এদের অধিকাংশেরই সারা বছরে মাংস খাওয়ার আর সুযোগ হয় না।

এবারও লামায় ৫০ জনেরও বেশি গ্রাজুয়েট কোরবানীতে শরীক হন। ফলে ৮টি গরু কোরবানী করা হয়। ঈদের

আগে কয়েক দিন ধরে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে উপজাতিদের বসতিগুলোতে গিয়ে ঈদের দাওয়াত দেন রিসর্টের সদস্যরা। ফলে ঈদের দিন ভোর থেকেই দলে দলে আসতে থাকেন এলাকার পাহাড়ি-বাঙালি মানুষ। আদিবাসীদের মধ্যে ছিলো তাদের পরিবারের শিশু-মহিলা এবং বয়স্করাও।

সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে এই আপ্যায়নে অংশ নেয় সহস্রাধিক মানুষ। খাওয়ানো ছাড়াও প্রায় পাঁচশত পরিবারকে এক কেজি করে কোরবানীর মাংস দেয়া হয়। সারা বছরে একবারও যারা মাংস খাওয়ার সুযোগ পায় না, চরম দরিদ্র এই মানুষদের জীবনে এটি নিঃসন্দেহে একটি আনন্দের দিন। অন্যকে আনন্দের অংশীদার করার এই ঈদ সত্যিকার অর্থেই কোরবানীর মহান তাৎপর্যকে অনুসরণ করে। পুরো কাজে রিসর্টে আগত প্রো-কোয়ান্টায়ারদের সহযোগিতা করে শিশুকাননের ক্ষুদ্রে শিক্ষার্থীরা, যাতে তারা বেশ দক্ষতার পরিচয় দেয়।

ভবিষ্যতে আরো বেশি সংখ্যক গ্রাজুয়েট লামায় কোরবানীতে শরীক হবেন বলে গুরুজী দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রতিবেদক : শিমুল মাহমুদ

জীবনে বাঁচার নতুন প্রেরণা পেয়েছি ডা. ছাবেরা সুলতানা



গত তিন মাস আগে আমি প্রথম অসুস্থ হই। প্রথম দিকে সামান্য জ্বর, একটু কাশি এবং শ্বাসকষ্ট শুরু হলো। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, আমার ক্যান্সার হয়েছে। মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। তখন ক্যান্সারের চিকিৎসা হিসেবে কেমোথেরাপী নেয়া শুরু করলাম। প্রথম থেরাপীর পর আমার যে সব শারীরিক সমস্যা ছিলো তা থেকে মুক্তি পেলাম। কিন্তু আমি হতাশায় ডুবে গেলাম। বেঁচে থাকার কোনো অর্থই আমার কাছে অবশিষ্ট রইলো না। পরিবারের সবার সমবেদনা এমনকি বিদেশে চিকিৎসা নেয়ার সময় নিরাময়ের ব্যাপারে ডাক্তারদের জোরালো আশ্বাসবাণী শুনেও আমার মনে হতো একজন রোগীর জীবনের কী মূল্য রয়েছে। আমি আশাবাদী হতে পারতাম না। সমস্যা না থাকলেও দিনের পর দিন আমি এই মানসিক ডিপ্রেশনে ভুগতে লাগলাম।

ঠিক তখন আমার স্বামীর বন্ধু ও বন্ধু-পত্নীর পরামর্শে কোর্সে অংশ নিই। যথেষ্ট দ্বিধা-সংশয় ছিলো মনে। প্রথম দিন আমার স্বামী ফোন নিয়ে বসে ছিলেন যে, কখন তাকে জানানো হয় আমি অসুস্থ হয়ে গেছি, আমাকে এখান থেকে বাসায় নিয়ে যেতে হবে। বাস্তবিকই আমি এ রকম অসুস্থ ছিলাম। কিন্তু প্রথম দিনই মেডিটেশন করার পর আমি এক অপূর্ব প্রশান্তি লাভ করলাম। সুস্থ হওয়ার এক চমৎকার আনন্দের অনুভূতি হলো মনে যা এর আগে কখনো হয় নি। দ্বিতীয় দিন আমি যখন বাসায় যাচ্ছি, তখন মনে হচ্ছিলো যে আমি এতটাই সুস্থ যে, আগামী দিন থেকে কাজে যোগ দিতে পারবো। আমি যে অসুস্থ এই অনুভূতিটা এখন আমার মধ্যে একেবারেই নেই।

আমার কারণে পরিবারের সদস্যরা ভীষণ হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। আমাকে প্রশান্ত দেখে, মানসিকভাবে উজ্জীবিত দেখে তারাও খুব নিশ্চিত হয়েছেন।

কোয়ান্টাম কোর্স করে আমি নতুন করে বাঁচার অনুপ্রেরণা পেয়েছি। আমি এখন হতাশা থেকে পুরোপুরি মুক্ত। এখন মনেই হচ্ছে না যে আমি অসুস্থ।

ডা. ছাবেরা সুলতানা, ফিজিশিয়ান, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ১৭৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

মুহম্মদ নূরুল হুদা : আত্মমগ্ন এক কবি প্রতিকৃতি

আমার একটা কবিতার বই আছে “আদিষ্ট হয়েছি আমি দীর্ঘ জাগরণে”। বইটা আমি লিখেছিলাম কয়েক বছর আগে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের করা একটি ভবিষ্যদ্বাণীকে উপজীব্য করে। সেসময় তারা বলেছিলেন ২০০০ সালে নতুন শতাব্দীতে প্রবেশের সন্ধিক্ষণে সৌরজগতে একটা বিশাল বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। কারণ বিভিন্ন গ্রহ এবং মহাকাশের অন্যান্য বস্তুর পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশংকা তারা করেছিলেন। ঐ সময় আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব ভীত হয়ে পড়ি। আমার মনে হতে থাকে যে, কী করে এটাকে ঠেকানো যায়। হঠাৎ মনে হলো এটাকে ঠেকানো সম্ভব যদি গ্রহ বা মহাকাশ পিণ্ডের মতো আপাতদৃষ্টে এই জড় বস্তুগুলোরও মন আছে, এটা স্বীকার করে নিই এবং সেই মনকে জাগ্রত করতে পারি।

আমি সবসময়ই বিশ্বাস করতাম জীবের মতো জড়বস্তুরও একটা মন্বয় সত্তা আছে, যে মনের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব, কথা বলা সম্ভব। তাই আমার মনে হলো, মহাবিশ্বের এই বস্তুকণাগুলোকে যদি জাগিয়ে তুলতে পারি এই উদ্দীপনায় যে তারা আর সংঘর্ষে জড়াবে না, যদি তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ঘটাতে পারি, তাহলেই বোধ হয় এই বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব।

প্রথমে এটাকে একটু অদ্ভুত মনে হলেও আমি বুঝতে পারলাম অন্যদের মনকে জাগ্রত করতে হলে সবার আগে জাগ্রত করতে হবে আমার মন। তখনই আমি কবিতায় লিখলাম,

“আমি এ বিশ্বসৃষ্টি এ বিশ্ব আমার সৃষ্টি/আমি আমাকেই চাই/আমার বিনাশ নাই।” অর্থাৎ এই পংক্তিগুলোর মধ্য দিয়ে আমি যেন আমার ইতিবাচকতাকেই জাগ্রত করলাম। একসময় কোনো অঘটন ছাড়াই সংঘর্ষের ভবিষ্যদ্বাণীর সেই দুঃসময়টা পেরিয়ে গেলো। □

কথাগুলো বলছিলেন সমকালীন বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশন কোর্সের ১৫৬ ব্যাচে যিনি সঙ্গীত অংশ নিয়েছেন। বাংলা একাডেমী আয়োজিত একুশের বইমেলায় কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের স্টল বরাদ্দের সূত্রে একাডেমীর একজন পরিচালক হিসেবে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা এ কোর্স সম্পর্কে জানতে পারেন। তাঁর ভাষায়, “কোয়ান্টাম মেথড বইটা কিছুটা পড়েই বুঝতে পেরেছিলাম এটা এই জিনিস যার খোঁজে আমি ছিলাম। সেসময় আমার ব্যক্তিগত জীবন এবং পেশাগত জীবনের কিছু বিপর্যয়ের কারণে আমার ভেতরে কিছুটা অস্থিরতা কাজ করছিলো। ভাবলাম, সমাধান হোক না হোক, কিছু সাজেশন তো পাবো। আমার স্ত্রীকেও সাথে নিলাম, কারণ মাইগ্রেন, স্পন্ডিলাইটিস এবং সাইনুসাইটিস এ রোগগুলোর বহুমুখী আক্রমণে তিনি ছিলেন কাহিল।

কোর্সে অংশ নিয়ে বুঝতে পারলাম মেডিটেশন বা আত্ম-উপলব্ধির মতো এতো ব্যাপক একটি বিষয়কে দারুণ একটা শৃঙ্খলা, একটা পদ্ধতির ভেতরে নিয়ে আসার কঠিন কাজটাই এতে করা হয়েছে। ফলে এটা হয়েছে অনেক সহজবোধ্য এবং গ্রহণযোগ্য।”

সাক্ষাতকারের শুরুতে যে উপলব্ধির কথা কবি হুদা বলছিলেন তার রেশ ধরেই বললেন, “আমি আগাগোড়াই বিশ্বাস করতাম ‘করা যায় না, এমনকিছুই নেই।’ তবে আমি পারবো না, হয়তো আরেকজন পারবে। আইনস্টাইন যা পেরেছেন, আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়। কিন্তু আমিও এমন কিছু করতে পারি যা অন্যে পারে না। তাই আমি সবসময় ভাবি, আমি পারি, পারবো। কোয়ান্টামে গিয়ে দেখলাম এখানকার বাণীও তা-ই, যা আমার বিশ্বাসকে আরো পরিপুষ্ট করেছে, আমার ইতিবাচকতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।”

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা জাতিসত্তার কবি হিসেবে পরিচিত। ঐতিহ্য পুরাণ আর লোকজ ঐশ্বর্য ভাণ্ডার থেকে বিরল দক্ষতায় আহৃত সম্পদের সম্মিলন ঘটিয়েছেন তিনি আধুনিক মননের রূপ বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে। হাজার বছরের বাংলা কবিতার সমৃদ্ধ ধারার সঙ্গে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা যুক্ত করেছেন নিজস্ব রীতি ও বাকভঙ্গিমা। তার কবিতা বাংলা ভাষার কবিতা হয়েও চিরকালীন আবহ আর আন্তর্জাতিক চেতনায় ঋদ্ধ।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা ১৯৪৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর কক্সবাজার জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মোহাম্মদ সেকান্দর, মাতা আঞ্জুমান আরা বেগম। মূলত কবি তিনি। তবে কথাসাহিত্য, মননশীল প্রবন্ধ ও অনুবাদসহ সাহিত্যের



প্রায় সব শাখাতেই তিনি বিচরণশীল। অতিপ্রজ্ঞ ও সব্যসাচী এই লেখকের স্বরচিত, অনূদিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা শতাধিক। তাঁর প্রিয় ক্ষেত্র কবিতা, নন্দনতত্ত্ব ও লোকবিদ্যা। সৃষ্টিশীলতার নানা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্যে তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্মানিত এবং পুরস্কৃত। তিনি বাংলা একাডেমীর ফেলো, American Folklore Society, International Society for Folk Narrative Research সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সম্মানিত সদস্য। তাঁর কবিতা নানা ভাষায় অনূদিত। কাব্যব্যপদেশে তিনি সফর করেছেন

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত। কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার প্রাপ্ত পুরস্কারগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলাওল সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৩), যশোর সাহিত্য পুরস্কার (১৯৮৩), আবুল হাসান কবিতা পুরস্কার (১৯৮৩), আওয়ামী শিল্পী সংবর্ধনা (১৯৮৬), বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৮৮), কক্সবাজার পদক (১৯৮৯), হুমায়ুন কাদির স্মৃতি পুরস্কার (১৯৯৪), আহসান হাবিব কবিতা পুরস্কার (১৯৯৫), যুক্তরাষ্ট্রে আইএসপি ঘোষিত Poet of International Merit ও Poet of the Year (১৯৯৫), কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজ প্রদত্ত নজরুল জন্মশতবার্ষিকী সম্মাননা (১৯৯৯), জীবনানন্দ জন্মশতবার্ষিকী সম্মাননা (১৯৯৯) ইত্যাদি। ১৯৯৭ সালে তিনি তুরস্কের রাষ্ট্রপ্রতি সোলেমান ডেমিরেল কর্তৃক বিশেষ রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত হন। ২০০১ সালে পান কক্সবাজার সাহিত্য একাডেমী পদক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করার পর কবি নূরুল হুদা কর্মজীবন শুরু করেছিলেন ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা দিয়ে। তারপর সরাসরি সহকারী পরিচালক পদে বাংলা একাডেমীতে চাকরি গ্রহণ করেন। ১৯৮১ সালে উপপরিচালক পদে পদোন্নতি লাভ করেন। এরপর ১৯৯৬ সালে নজরুল ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি জাতীয় পর্যায়ে নজরুল জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সেসময় নজরুলের কবিতার ইংরেজী অনুবাদসহ নজরুলের উপর মৌলিক তিনটি বই লেখা হয় যা সম্পাদনা করেন কবি হুদা। এর মধ্যে Nazrul's Aesthetes & Other Aspects একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ।

২০০২ সালে তিনি পুনরায় বাংলা একাডেমীতে পরিচালক পদে যোগদান করেন। বর্তমানে তিনি বাংলা একাডেমীতে কর্মরত।

প্রশাসনিক কাজের ঝুঁটিনাটি নিয়ে সারাদিনই কাটে তার ব্যস্ত সময়। কখনো কখনো হয়তো এই ব্যস্ততা তার আত্মমগ্নতাকেও বিঘ্নিত করে। কিন্তু ক্লান্তি বা অস্থিরতার সে সময়গুলোতে মেডিটেশনই কবি হুদার পরম বন্ধু। কারণ গভীর মেডিটেশনে তৃপ্তিকর এক মানস ভ্রমণের মধ্য দিয়ে কয়েক মিনিটেই তিনি আবার নিজেকে ফিরে পান একজন সজীব, কর্মমুখর মানুষ হিসেবে। এমনকি কোর্সে শেখা শুধু প্রাণায়াম বা দমের চর্চাও কেউ যদি নিয়মিত করে তবে তার পক্ষে ক্লান্তিহীনভাবে কাজ করা সম্ভব বলে মনে করেন তিনি। তিনি বলেন, একটি জটিল হিসেব হাতে করতে যদি একঘণ লাগে, কম্পিউটার যেমন সেটাকে পাঁচ মিনিটে করে ফেলে, ধ্যান বা আত্মমগ্নতাও মানুষের জীবনকে তেমনি অর্থবহ করতে পারে, কর্মক্ষম করতে পারে।

কবি নূরুল হুদা বলেন, “তবে এই আত্মমগ্নতা বা আত্মসংজ্ঞা জাগ্রত করার কথা তত্ত্বে যত ভালো ভাবে আছে, বাস্তবে ঠিক ততটাই অনুপস্থিত। সভ্যতার ইতিহাসে এটাকে প্রতিষ্ঠিত করার কথা কেউ ভাবেন নি। আমার মনে হয়েছে সীমিত আকারে হলেও কোয়ান্টামে এই প্রতিষ্ঠিত করার বাস্তব প্রক্রিয়াটাই শেখানো হয়েছে।”

স্ত্রী সাঁদুра হুদার মেডিটেশন কোর্স করার অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা বলেন, “কোর্স করার সাথে সাথেই তার স্পন্ডিলাইটিসের ব্যথা একেবারে চলে গেছে। এমনকি সবসময়ই কলার গার্ড ব্যবহারে অভ্যস্ত তিনি যে কোর্সের তৃতীয় দিন এটা আনতেই ভুলে গেছেন তা-ও মনে করিয়ে দিতে হয়েছে।”

সব্যসাচী লেখক মোহাম্মদ নূরুল হুদা রাইটার্স ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বর্তমানে তিনি এই ক্লাবের সভাপতি। সাহিত্য সাধনার পাশাপাশি সাহিত্য সংগঠক হিসেবেও তিনি সর্বমহলে সমাদৃত।

কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা সমকালীন বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর। তাঁর কাব্যপ্রয়াসের কেন্দ্রে রয়েছে ব্যক্তি মানুষ, জাতি মানুষ ও বিশ্ব মানুষের সৃষ্টিশীলতা ও রহস্য। আর ধ্যান বা আত্মমগ্নতার চর্চার মধ্য দিয়েই তা লাভ করেছে বৈচিত্র্য ও সূক্ষ্মতা বোধের বৈশিষ্ট্য।

প্রতিবেদক : সুমন ধর

পরম শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আমার সালাম গ্রহণ করবেন। পর সংবাদ এই যে, ২০০৩ সালকে আত্মনির্মাণের বছর হিসেবে ঘোষণা করার পর আপনার এই ঘোষণা আমাকে প্রভাবিত করলো। তাই নিজেকে পরিশুদ্ধ করার নিমিত্ত বছরের শুরু থেকে সং উপার্জন দিয়ে সংসার চালানোর সংকল্প করেছিলাম মনে মনে। কোয়ান্টাম মাস্টার্স কোর্স করার পর থেকেই মনে সারাক্ষণ খটকা লাগত যে, আমি কোন পথে চলছি। ঘৃষ খাচ্ছি, নামাজ পড়ছি, আবার নিজেকে স্ট্রীয় সমর্পণ করছি। সব এক সাথে চলতে পারে না।

তাই কঠোর সংকল্প করলাম হারাম পয়সা সংসারের কাজে খরচ করবো না। হঠাৎ করে ঘৃষ খাওয়া ছাড়া বড়ই কঠিন এবং সমালোচনারও ভয় হলো। তাই প্রকাশ না করে আস্তে আস্তে নিজের আচরণ শোধরাতে লাগলাম। কেউ ইচ্ছা করে দিলে তাকে না করতাম না। কিন্তু কাউকে ঘৃষ প্রদানে বাধ্য করতাম না। এভাবে যে টাকা পেতে লাগলাম তা খরচ না করে জমিয়ে রাখতে লাগলাম।

আমি পেশায় একজন (ডিপ্লোমা) প্রকৌশলী। চাকরির পাশাপাশি বাসায় কম্পিউটারে বিল্ডিং ডিজাইন-এর কাজ করে স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে নিয়ে সংসার ভালই চলে। কিন্তু স্ত্রীর বিলাসিতার উপকরণ এবং অফুরন্ত চাহিদা পূরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে স্ত্রীর মেজাজ খারাপ থাকতো। মাঝে মাঝে বিলাপ করতো, “হায় পোড়া কপাল, এ জীবনে কিছুই পেলাম না।” আমি চুপ করে থাকতাম। কিছুক্ষণ পর বন্ধ হয়ে যেতো। ইতিমধ্যে আমার অফিসের কেউ কেউ আমার এই পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। কেউ আবার খুশি হলেন। কারণ হিস্যার পরিমাণ বেড়ে গেলো। দেখতে

গুরুজীকে লেখা চিঠি

দেখতে সাত মাস পেরিয়ে গেলো। অবৈধ একটি পয়সাও খরচ করলাম না। কিন্তু আমার সংসার ভালই চলতে লাগলো। সং উপার্জনে জীবন-যাপন করায় আমি মানসিক প্রশান্তি পেলাম এবং ঘৃষের প্রতি আমার ঘৃণা দিন দিন বাড়তে লাগলো। এ বছরের জানুয়ারী হতে জুলাই পর্যন্ত আমার অবৈধ তহবিলের ব্যালেন্স দাঁড়াল ৯৬০০ টাকা। সাত মাস অতিবাহিত হওয়ার পর আমার আত্মবিশ্বাস প্রচণ্ড বেড়ে গেলো, ইবাদতে মনোযোগ বৃদ্ধি পেল। সর্বোপরি মানসিক প্রশান্তি পেলাম।

বাসার ফ্রিজটা বেশ কিছুদিন যাবত মাঝে মাঝে বিগড়ে যেতো— এ নিয়ে স্ত্রীর মন খুব খারাপ। প্রায়ই কথা শোনাতে। আমার একটাই ভরসা— প্রো-অ্যাকটিভ থাকা, তাতে বেশ কাজ হয়। একদিন অফিস থেকে মাছ কিনে নিয়ে বাসায় ফিরেছি। ঐ দিন আবার ফ্রিজের সমস্যা দেখা দিয়েছে। আর যায় কোথায়! মাছ দেখে স্ত্রীর মেজাজের বারোটা বেজে গেলো। বলতে লাগলো, “ঐ মাছ ফেলে দিয়ে আস। ফ্রিজে রাখলে গন্ধ হয়ে যায়”, ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রো-অ্যাকটিভ আচরণেও

কাজ হচ্ছে না। ফলে গত সাত মাসের ঘটনা, আমার সংকল্পের কথা স্ত্রীকে খুলে বললাম। তাতে কিছুটা শান্ত হলেন। আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম।

কিছুদিন পর আমার ঘৃষ খাওয়ার সাথী অফিসার বদলী হয়ে গেলেন। তিনি পদোন্নতি পাওয়ায় প্রতিজ্ঞা করলেন নতুন কর্মস্থলে গিয়ে অবৈধ পয়সা স্পর্শ করবেন না। আমিও আমার সংকল্পের কথা অফিসের সবাইকে অবহিত করলাম। আমার ব্যাপারে অনেকে আগেই বুঝতে পেরেছেন যে, আমি আমার আচরণ আস্তে আস্তে সংশোধন করতে যাচ্ছি। তওবা করলাম আর জীবনে এ কাজ করবো না।

আর একদিন পরেই আমার এই সুন্দর জীবন যাপনের এক বছর পূর্ণ হবে। আমি আরো আত্মবিশ্বাসী হয়েছি। কোয়ান্টাম আমার জীবন বদলে দিয়েছে। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, সং সঙ্ঘের সাথে থেকে অনন্য মানুষ হওয়ার অভিযাত্রায় সফলকাম হওয়ার আশা ব্যক্ত করে শেষ করছি।

উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমার দু’টি প্রশ্ন— ১। আমার অবৈধ তহবিলের ৯৬০০ টাকা কি করবো? ২। অতীতের ভুলগুলির প্রায়শ্চিত্ত কিভাবে করবো?

গুরুজী, উপরোক্ত প্রশ্ন দু’টির উত্তর দিয়ে বাধিত করবেন। আমার জন্য দোয়া করবেন যেন আপনার দিক-নির্দেশনা পুরোপুরি মেনে চলতে পারি এবং একজন চমৎকার মানুষ হতে পারি। আপনার সর্বদীন মঙ্গল কামনা করছি।

ইতি—
আপনার স্নেহধন্য,
কে. খান
৩১.১২.০৩

বিজ্ঞানের সাথে, ধর্মের সাথে যদি কোনো বিরোধ থাকতো তবে আমি এ কোর্সে অংশ নিতাম না। কথাগুলো বলেছিলেন ১৬৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট ওসমান আমিন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি উপসচিব হিসেবে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে কর্মরত আছেন। সর্বক্ষেত্রে তিনি বিজ্ঞান এবং ধর্মকে প্রাধান্য দেন। কোর্স করে তাঁর উপলব্ধি— এই কোর্সের প্রতিটি বিষয় বিজ্ঞান সম্মত।

রাজশাহীতে কর্মরত থাকাকালে একজন সহকর্মীর মুখে মেডিটেশন সম্পর্কে জানতে পারেন। বিষয়টা তখন থেকেই মনের মধ্যে স্থান করে নেয়, তাই তিনি ক্যাসেট এবং কোয়ান্টাম মেথড বই সংগ্রহ করেন। তবে উপসচিব হিসেবে পদোন্নতির পর ‘এ্যাডভান্সড কোর্স অন এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এ্যাড ডেভেলপমেন্ট’-এ অংশ নিতে গিয়ে মেডিটেশন ও Stress Management সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করেন। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন স্ত্রী এবং কন্যাসহ এই কোর্সে অংশ নেবেন। বাসায় ফিরে বলা মাত্রই তারাও রাজী হয়ে গেলেন।

স্ত্রী মিসেস সামিয়া সুলতানা বলেন, ভালো কিছু, মহৎ কিছুতে সবাই মিলে অংশ নেয়াটা উত্তম। বার্ট্রান্ড রাসেলের The Conquest of Happiness পড়েছি। কোয়ান্টাম মেথড বই পড়েছি। তাই ভাবলাম গিয়ে দেখি কোর্সে কি হয়। কোর্স করে তারা সবাই ভীষণভাবে খুশী। বড় মেয়ে শাম্মা আমীন বারিরা আগে রাগ করতো একটুতেই। এখন সে নিজেকে সংযত রাখছে। কারণ গুরুজীর কথাটা তার মনে খুব দাগ কেটেছে, রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন।

মেডিটেশন কোর্স ও

আমাদের পরিবার

মোহাম্মদ ওসমান আমিন



লেখাপড়াতেও মনোযোগ বাড়ছে তার। শাম্মার ভাষায়, পরীক্ষা দিতে গেলে বা কোনো কাজ করতে গেলে আগে খুব নার্ভাস লাগতো কিন্তু এখন আমার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে গেছে। শাম্মা ক্লাস এইটের ছাত্রী।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের আত্মউন্ময়ন এবং হক্কুল ইবাদমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে ওসমান আমিন বলেন, হক্কুল ইবাদ না করলে আত্মউন্ময়ন সম্পন্ন হয় না। যে নিজের কথা সবসময় ভাবে সে তো স্বার্থপর। চারপাশের মানুষের এই দৈন্যদশা দেখে তিনি কিছু করতে চান সবসময়। তাই ফাউন্ডেশন যে সুযোগ করে দিয়েছে সেটাকে তিনি কাজে

বড় মেয়ে শাম্মা আমীন বারিরা ও স্ত্রী সামিয়া সুলতানার সঙ্গে জনাব ওসমান আমিন

লাগাতে চান। এ প্রসঙ্গে তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পংক্তি টানেন— “আপনাকে দীপ করে জ্বালো আপনার যাত্রা পথে আপনাকেই দিতে হবে আলো”।

[মোহাম্মদ ওসমান আমিন ১৯৮২ সালে বুয়েট থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পাশ করে বিসিএস-এ উত্তীর্ণ হয়ে রেলওয়ে ইঞ্জিনিয়ার্স সার্ভিস-এ এ্যাডিশনাল চিফ হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করেন। এরপর ওয়ার্কশপ ডিভিশনের ডিভিশনাল সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি উপসচিব হিসেবে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে কর্মরত আছেন।]

প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

অন্তর্দৃষ্টি খুলে গেছে

ডা. জাকিরুল ইসলাম

পেশার সুবাদে অনেক আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাথে আমি জড়িত। অনেক সেমিনারে অংশ নিয়েছি। কিন্তু কোথাও এরকম সুশৃঙ্খল অনুষ্ঠান দেখি নি। কোর্স করে মনে হচ্ছে গুরুজী আমাদের তৃতীয় নয়ন খুলে দিয়েছেন। আমার অনুভূতি এই যে, এটি বাস্তবিকই জীবন যাপনের বিজ্ঞান।

[ডা. জাকিরুল ইসলাম, ইয়ংওয়ান গ্রুপের চিকিৎসক এবং সমাজ সেবক, ১৬৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

নতুন প্রেরণা নিয়ে বাঁচবো রিফাত আরা শাহানা

আমার জীবনে অনেক বড় বয়ে গিয়েছে। গত এক বছর আগে আমার একটি মেয়েকে হারিয়েছি। তখন থেকে আমি বেঁচে থাকার ইচ্ছে হারিয়ে ফেলেছিলাম। এখন কোর্সে এসে আমার বিশ্বাস জন্মেছে। আমি আবার নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখবো। এখন আমি বিশ্বাস করি, পৃথিবীকে আলোকিত করার জন্যে আমি অবশ্যই বাচবো।

[রিফাত আরা শাহানা, ফটো জার্নালিস্ট, ১৬০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আত্ম উপলব্ধি এসেছে নাজমুল আরেফিন

বাসায় আমি ভীষণ বদরাগী। অল্প কিছুতেই রেগে যাই। কোর্স করার পর আমার মধ্যে এক অন্য রকম পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন আমার মা। আমার বন্ধুরাও অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে, আমার কি হয়েছে? বাস্তবিকই আমি এখন সবকিছুকে সহজভাবে সামলে নিতে পারছি। আমি অনুভব করছি, ধীরে ধীরে অনন্য মানুষ হবার পথে এগুচ্ছি। এখানে এসেই আমি মূলত নিজেকে চেনার এবং জানার সুযোগ পেয়েছি।

[নাজমুল আরেফিন বুয়েটের ছাত্র, ১৬৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

হাঁটুর ব্যথা ভালো হয়েছে শিরীন ইসলাম

প্রায় এক বছর ধরে হাঁটুর ব্যথা নিয়ে আমি চলাফেরা করছি। প্রায় সময়ই বাসায় থাকতে হয় কেন না হাঁটুর ব্যথার কারণে কোথাও যেতে পারি না। এছাড়া হাঁটু গেড়ে কখনও বসতে পারতাম না। কোর্সের দ্বিতীয় দিন আমি চেষ্টা করে স্বাভাবিকভাবে বসতে পারলাম। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। কোর্সের পারিবারিক মেডিটেশনটি আমার খুব ভালো লেগেছে। আমার বাবা-মা দু’জনই মারা গেছেন। পারিবারিক মেডিটেশনে গিয়ে আমি তাদেরকে অনুভব করেছেি। এটা এক অন্য রকম পাওয়া। এছাড়া, কোর্সের মাধ্যমে আমি প্রো-অ্যাকটিভ হতে শিখেছি।

[শিরীন ইসলাম, গৃহিণী, ১৭০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

মনোযোগী হয়েছে মোমেনা সুলতানা চৌধুরী রুমা

আমি পড়ালেখায় মনোযোগ বৃদ্ধির জন্যই মূলতঃ কোর্স করতে এসেছিলাম। কিন্তু এখন সাফল্যের ঘরে আরো অনেক কিছুই যোগ হয়েছে। হিংসা, রাগ, ক্ষোভ এখন প্রায় পুরোটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তাছাড়া নিয়মিত মেডিটেশন করায় এখন আর অল্পতেই ক্লান্তি আসে না বরং প্রচুর এনার্জি পাই।

[মোমেনা সুলতানা চৌধুরী রুমা, ছাত্রী, ১৫৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

নামাজ পড়তে পারছি নূর মোহাম্মদ সিদ্দিকী

ব্যথার জন্যে আমি স্বাভাবিকভাবে নামাজ পড়তে পারতাম না। বালিশ দিয়ে নামাজ পড়তে হতো। কিন্তু কোর্স করার পর আমি লক্ষ্য করছি, আমার সেই ব্যথা নেই এবং স্বাভাবিকভাবে নামাজ পড়তে পারছি।

কোর্সে এসে আমার কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্যম অনেক বেড়ে গেছে। আমার বিশ্বাস, কোয়ান্টাম চেতনা ধারণ করে আমি জীবনটাকে অনেক সুন্দর করতে পারবো।

[নূর মোহাম্মদ সিদ্দিকী, সমাজকর্মী, ১৬৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

অহেতুক ভয় থেকে আমি মুক্ত আবুল হাসনাত

আমি খুব অস্থির চিন্তের মানুষ ছিলাম। টেনশন ছিলো আমার নিত্য সঙ্গী। ঘুমের অভাব এতটাই তীব্র হয়ে উঠেছিলো যে, নিয়মিত ঘুমের ওষুধ খেতে হতো। তাছাড়া মৃত্যু ভীতি, রোগ বা দুর্ঘটনা ভীতি আমাকে এতটাই আঁকড়ে ছিলো যে, সারাক্ষণই মনে হতো এই বুঝি কিছু হয়ে গেলো! কিন্তু আমি কোর্স করতে এসেছিলাম উচ্চ রক্তচাপ থেকে মুক্তির জন্যে। কোর্সের আগে আমি এজন্য নিয়মিত Locerton খেতাম। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া জানাই এখন আর রক্তচাপ সমস্যার জন্যে বা ঘুমের অভাবেও ওষুধ খেতে হয় না। কোনো রকম ওষুধ ছাড়াই এখন আমি পুরোপুরি সুস্থ আছি, ভাল আছি। অনেক জটিল পরিস্থিতিতেও এখন আমি মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে পারি। অহেতুক ভয়-ভীতি, টেনশন থেকেও মুক্ত।

[আবুল হাসনাত, শিক্ষক, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৫৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আত্মবিশ্বাসী হয়েছে সৈয়দ মো. খায়রুজ্জোহা

‘কোয়ান্টাম মেথড’ বইটি পড়ে আমি মেডিটেশন কোর্স করার জন্যে আগ্রহী হলাম। প্রথম দিন আমার সংশয় ছিলো আমি পারবো কিনা মেডিটেশন করতে। সব ঠিকমত বুঝাবো কিনা। কোর্স শেষে এখন আমার সংশয় কেটে গেছে। এখন যেন আমি হাতে পেয়েছি এক অসীম শক্তিশালী কম্পিউটারের প্রোধামিং ল্যাংগুয়েজ, যার মাধ্যমে আমি অসাধ্য সাধন করতে পারবো। এর প্রমাণ কোর্সের চতুর্থ দিনে কোয়ান্টাম গেমে অনুভব করি। কোর্সে গুরুজী হাসিমুখে প্রাণবন্তভাবে গল্পের মাধ্যমে যে শিক্ষা আমাদের দিয়েছেন, তা আমার জীবনে এক অভাবনীয় অভিজ্ঞতা।

আমি ছয় বছর যাবত শ্বাসকষ্টে ভুগছি। কোর্সের দ্বিতীয় দিনে বেশ কিছুটা অসুস্থ বোধ করছিলাম। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত সুস্থ বোধ করছি। এখন আমি আশাবাদী। আমি মনে করি কোনো ধরনের ওষুধ ছাড়াই ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকবো।

[সৈয়দ মো. খায়রুজ্জোহা, ১৬৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ঘুমাতে পারছি আলহাজ্ব এম.এ ওহাব

দীর্ঘদিন ধরে আমি ইমসমনিয়ায় ভুগছি। এজন্য খুব কষ্ট পেতাম এবং হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম। অনেক ডাক্তার দেখিয়েছি কিন্তু কোনো লাভ হয় নি। এছাড়া আমি হঠাৎ রেগে যেতাম এবং রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না। কোর্স করার পর পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে এখন আমার রাতে ভালো ঘুম হয় এবং রাগও কমে গেছে। আমি বিশ্বাস করি, সত্যিই এটি একটি ভালো ইনস্টিটিউশন যা মানুষকে কল্যাণের পথ দেখায়।

[আলহাজ্ব এম. এ ওহাব, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা, ১৬৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

রাগ নিয়ন্ত্রণ করছি দিলরুবা খানম তাপসী

মেডিটেশন করে আমি এখন রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি। হঠাৎ যদি রেগে যাই তখন অনুভব করি, কে যেন আমার কানে কানে বলছে, রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন। শুনে একেবারে চুপ হয়ে যাই। কিছুক্ষণ পর রাগ আর থাকে না। এছাড়া, এখন আমার ধৈর্য শক্তি অনেক বেড়েছে। আগে প্রতিটি কাজে খুব তাড়াহুড়ো করতাম; কিন্তু এখন ঠাণ্ডা মাথায় ধৈর্য ধারণ করতে শিখেছি। নিজেকে দেখে নিজেই আমি অভিভূত। সর্বোপরি, মেডিটেশন আমাকে এক নতুন জীবন উপহার দিয়েছে।

[দিলরুবা খান তাপসী, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজের ছাত্রী, ১৬৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সিগারেট ছেড়েছি আরিফ আহমেদ

আমি একজন চেইন স্মোকার ছিলাম। কিন্তু মেডিটেশন করার পর আমি আর সিগারেট খেতে পারি নি। সিগারেট খেতে গেলে কোথা থেকে যেন এক বাধা অনুভব করি। এখন আমি খুবই প্রশান্ত ও নিশ্চিত।

[আরিফ আহমেদ, নিউ হরাইজন কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, ১৬৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আমেরিকার টেনেসি ও উইসকনসিনে বাবা-মায়ের চাপে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের কাছে ঠাণ্ডা পানীয় অর্থাৎ সফট ড্রিংকস বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়াতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরেও এই ধরনের পানীয় এবং পিজা, বার্গার জাতীয় জঞ্জাল খাদ্যের (Junk food) বিক্রি বন্ধ করা হয়েছে। উপমহাদেশ অর্থাৎ ভারত-পাকিস্তান-বাংলাদেশের কোনো বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বাঁচাতে এই ধরনের কোনো আইন বা নিয়ম করা হয়েছে কিনা জানা নেই। তবে এটি মোটামুটি পরিষ্কারভাবে জানা আছে যে, স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েদের কাছে নানা নামের নানা রঙের এই ধরনের কোমল পানীয় বেশ জনপ্রিয় এবং এসব পান করার জন্য অচেল অর্থ খরচ করতে তারা কার্পণ্য করে না। গরম আবহাওয়ার এই দেশগুলোতে প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ বোতল ঠাণ্ডা পানীয় বিক্রি হয়। দেশী, বিশেষত বিদেশী ঠাণ্ডা পানীয়ওয়ালারা তাদের পুঁজি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে একশ’ কোটি ভারতীয়ের উপর– লাগামছাড়া মুনাফার আশায় এবং তাদের এই আশা পূরণও হয়েছে।

কিন্তু নামে Soft drinks বা কোমল পানীয় হলেও শরীরের উপর এর প্রতিক্রিয়া মোটেই কোমল নয়। তাই যে আমেরিকার ঠাণ্ডা পানীয় কোম্পানীগুলো এদেশে এমন ব্যবসা করছে, ঐ আমেরিকাতেই অনেক জায়গায় ঠাণ্ডা পানীয় নিষিদ্ধ। এর কারণ খুঁজতে হলে এদের কাজ-কারবারের গভীরে প্রবেশ করতে হবে।

সম্প্রতি ভারতে এই ধরনের অনেক নামকরা ঠাণ্ডা পানীয়ে কীটনাশক (ডিডিটি, ম্যালাথিয়ন ইত্যাদি), নানা বিপজ্জনক রাসায়নিক পদার্থের মাত্রাছাড়া উপস্থিতি নিয়ে তুমুল আলোড়ন হয়েছে। ব্যবসা মার খাচ্ছে দেখে ঠাণ্ডা পানীয় কোম্পানীগুলো পাল্টা সমীক্ষা প্রকাশ করে জানিয়েছে তাদের এইসব পানীয়ে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থগুলির উপস্থিতি বিপজ্জনক মাত্রার অনেক কম। এমনকি কিছু সরকারি সমীক্ষাতে তাদের এই দাবি কম-বেশি সমর্থিত হয়েছে। তবে এটি ঘটনা যে, আমেরিকার মতো দেশের ঠাণ্ডা পানীয়ে এই ধরনের বিপজ্জনক পদার্থের উপস্থিতি নগণ্য। তবু কিন্তু সেখানে অনেক এলাকায় এই ধরনের পানীয় নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। শুধু আমেরিকায় নয়, পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষই এই ধরনের কোমল ঠাণ্ডা পানীয়ের বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন। অর্থাৎ ক্ষতিকর কীটনাশক পদার্থগুলি এই ধরনের পানীয়ে যদি না-ও থাকে, তবুও তাদের অবাধ ব্যবহার নিষিদ্ধ হওয়ার যোগ্য।

তার কারণ এই ধরনের কোল্ড ড্রিংকস সম্পূর্ণ অপ্রয়োজনীয় শুধু নয়, অত্যন্ত ক্ষতিকরও। অপ্রয়োজনীয় কারণ, শরীরে পানির চাহিদা মেটাতে সাধারণ পানীয় জলই যথেষ্ট। এই জন্যে ঠাণ্ডা পানীয়ের কোনো প্রয়োজন নেই।

ঠাণ্ডা পানীয়ের তাৎক্ষণিক বিপদ হচ্ছে গলা বা শ্বাসতন্ত্রের ক্ষতি। আমাদের নাকে, গলায় তথা শ্বাসতন্ত্রের গুরুর দিকের অংশে থাকে অসংখ্য সিলিয়া। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে আমরা প্রতিনিয়ত যে ধূলিকণা, ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস গ্রহণ করি এই সিলিয়াগুলো সেগুলোকে শরীরের ভেতরে ঢুকতে বাধা দেয়।

কোল্ড ড্রিংকস্ : স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও আর্থিক বিপর্যয়

ডা. ভবানী প্রসাদ সাহু

এসব সিলিয়াগুলো নিক্রিয় হয়ে পড়ে। ফলে গুরু হয় টনসিলাইটিস, ফেরিংজাইটিস, ল্যারিংজাইটিস, ব্রংকাইটিস বা নিউমোনিয়ার মতো শ্বাসজনিত রোগ।

ঠাণ্ডা পানীয়ের তাৎক্ষণিক বিপদের সঙ্গে আছে দীর্ঘস্থায়ী বিপদ যা আরো ভয়াবহ। একমাত্র পানি ছাড়া এর অন্যান্য সব উপাদানই কৃত্রিমভাবে মেশানো। জিভে সামান্য জ্বালা ধরানো বিশেষ স্বাদ আনার জন্যে ঠাণ্ডা



পানীয়গুলোতে মেশানো হয় ফসফোরিক এসিড। যা দাঁত ও হাড়ের জন্য ক্ষতিকর। পরীক্ষায় দেখা গেছে একটা ভাঙা দাঁত এই ধরনের পানীয়ের বোতলে ফেললে তা দশ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ গলে যায়। দীর্ঘ দিন ধরে নিয়মিত ঠাণ্ডা পানীয় খেলে শরীরে জমা হতে থাকা ফসফরাস হাড়কে ভঙ্গুর করে দেয়।

মিষ্টি স্বাদ আনার জন্যে এক বোতল ঠাণ্ডা পানীয়ে প্রায় ছয় চামচ চিনি বা গ্লুকোজ মেশানো হয়। আবার স্বাভাবিক খাবার-দাবারের পরেই ঠাণ্ডা পানীয় খাওয়া হয়। ফলে সব মিলিয়ে শরীরে যায় অপ্রয়োজনীয় বাড়তি ক্যালরি। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্থূলতা। শিশুদের উপর এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। দিনের পর দিন তারা মোটা হতে থাকে।

আরও প্রায় অবধারিত পরিণতি পরবর্তীকালে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, রক্তবাহী নালিকায় স্থায়ী পরিবর্তন, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ ইত্যাদি এবং অকাল মৃত্যু। যেসব বাবা-মা তাদের বড় আদরের শিশুটির বায়না রাখতে ঠাণ্ডা পানীয় কিনে ভাবছেন সন্তানকে স্নেহ করা গেল, তারা আসলে সন্তানের অকাল মৃত্যুকেই ডেকে আনছেন।

বেশি ঠাণ্ডায় এই কোমল পানীয় যাতে না জমে যায় এর জন্যে এতে মেশানো হয় ইথিলিন

গ্লাইকল নামে একটি পদার্থ। এটি প্রায় আর্সেনিক বিষের সমতুল্য। ক্রমাশ্বয়ে শরীর তা গ্রহণ করার ফলে দেখা যায় মস্তিষ্ক, যকৃত, বৃক্ক ইত্যাদি নানা গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক অঙ্গের স্থায়ী বৈকল্য।

ডায়াবেটিস রোগীদের কাছে ‘ডায়েট’ লেবেল স্টেটে কোমল পানীয় বিক্রি করা হচ্ছে। এখানে পার্থক্য হচ্ছে গ্লুকোজের পরিবর্তে এসপার্টেম নামে অতি মিষ্টি একটি পদার্থ মেশানো হয়। গবেষণায় দেখা গেছে শরীরের বিভিন্ন অংশে এর নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সংখ্যা ৯২টি যার একটি হলো ব্রেন টিউমার।

এছাড়া কোল্ড ড্রিংকসে ক্যাফেইন নামক এক ধরনের মৃদু নেশা সৃষ্টিকারী ড্রাগ মেশানো হয়। এটি সহজেই মস্তিষ্কে উত্তেজনা ঘটায় এবং আসক্ত করে।

এবার আসা যাক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিষয়ে। এক বোতল ঠাণ্ডা পানীয় তৈরি করতে পানি নষ্ট হয় তিন বোতল। এই বিপুল পরিমাণ পানি মাটির নীচ থেকে দিনের পর দিন তোলা হতে থাকে। এর ফলে পানীয় জলের কুপ-নলকূপ শুকিয়ে যায়। চাষের জন্য সেচের পানিতে ঘাটতি ঘটে, পানিতে লবণ বা খরভাব বেড়ে গিয়ে পানের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। এলাকাটা ক্রমশ মরুভূমিতে পরিণত হয়।

এক্ষেত্রে ভারতের কেরালা রাজ্যের পালান্কাড জেলার একটি গ্রামের উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। ঐ গ্রামে একটি কোল্ড ড্রিংকস কারখানায় প্রতিদিন ৮৫ লরি ভর্তি কোকাকোলা, মিরিডা, থামস্ আপ ও কিনলে নামক বোতলের পানি তৈরি হয়। এর জন্যে প্রতিদিন ১৫ লক্ষ লিটার ভূ-গর্ভস্থ পানি টেনে নেয়া হয়। এর ফলে এর চারপাশের প্রায় ১২-১৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকা শুকিয়ে প্রায় মরুভূমি হয়ে যাচ্ছে। পানির অভাবে ৬০০ একর জমির চাষাবাদ বন্ধ হয়ে গেছে। গ্রামের কুরো এবং টিউবওয়েলগুলো শুকিয়ে যাওয়ায় মেয়েদেরকে পায়ৈ হেঁটে ৫ কি.মি. দূর থেকে পানি আনতে হয়। আর যে পানিটুকু পাওয়া যায় তাতে লবণের পরিমাণ এবং খরভাব এত বেড়ে গেছে যে, তা খেয়ে গ্রামের মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

আর্থিক দিকটাও একেবারে উপেক্ষা করা যায় না। এক বোতল ঠাণ্ডা পানীয় কিনতে লাগে ১০ টাকা কিন্তু তা তৈরি করতে খরচ হয় বড়জোর ২/১ টাকা। ভাবছেন এর মাধ্যমে শরীরে পানির চাহিদা পূরণ করছেন। এ ধারণা ভ্রান্ত। ঠাণ্ডা পানীয় দিয়ে শরীরে পানির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়। এজন্য সাধারণ পানীয় জলই যথেষ্ট। আর অতিরিক্ত টাকা খরচ করলেও তার জন্য পানীয়ের গুণমান কিন্তু বাড়ে না। তার বড় অংশটা চলে যায় ব্যবসায়ীর পকেটে, মূলত বিদেশে এবং সামান্য কিছু অংশ পায় কারখানায় কাজ করা এদেশী শ্রমিকরা।

তাই এ ধরনের মরণ পানীয় থেকে দূরে থাকার জন্যে দরকার সর্বসাধারণের সম্মিলিত সচেতনতা যা এর উৎপাদন ও বিক্রয় বন্ধে কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখবে।

[ডা. ভবানী প্রসাদ সাহু ভারতের বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ। ‘গণ স্বাস্থ্য’ থেকে]

প্রশ্ন : আমার এক আত্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী একজন মেধাবী সরকারি আমলা। কিন্তু তিনি ফাইল আটকে ঘুষ নেন, ব্যক্তিগত কাজে সরকারি সম্পদ ব্যবহার করেন এবং বাড়িতে স্ত্রীকে মারধোর করেন। কিন্তু নিজেকে তিনি একজন শিক্ষিত, চৌকস ব্যক্তি মনে করে গর্ব করে থাকেন। তাকে কি শিক্ষিত বা জ্ঞানী বলা যায়?

উত্তর : সত্যিকারের জ্ঞানী এবং শিক্ষিত তিনিই যিনি জানেন এবং মানেন। অর্থাৎ যিনি শিক্ষাকে শুধু জানা পর্যন্ত সীমিত না রেখে নিজের জীবনেও তা বাস্তবায়িত করেন। কারণ শিক্ষা বা জ্ঞানের প্রভাব যদি কারও জীবনে না থাকে তাহলে তাকে কখনো শিক্ষিত বা জ্ঞানী বলা যায় না।

একজন ডাক্তার যদি শুধু পয়সার জন্যেই রোগী দেখেন এবং যে পয়সা দিতে পারে না তাকে বিনা চিকিৎসায় মরে যেতে দেন, তিনি আর যা-ই হোন, শিক্ষিত নন। একজন ইঞ্জিনিয়ার বা আমলা যদি ঘুষ খাওয়ার জন্যে ফাইল আটকে রাখেন, টাকা খেয়ে অযোগ্য প্রার্থীকে টেন্ডার দেন, তার অবস্থানও তখন একজন ধৃত, প্রতারক বা শোষকের চেয়ে আলাদা কিছু নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক যদি প্রভাবশালী মহলকে খুশি করার জন্যে অন্যায় কাজে সহযোগিতা করেন, তার মেধা ও বুদ্ধিও তখন হয়ে যায় অর্থহীন। একজন পেশাদার বক্তা ধূমপানের কুফল নিয়ে বক্তৃতা করার পর পরই যখন নিজে একটা সিগারেট ধরান তখন ধূমপানের বিরুদ্ধে বলার অধিকার নীতিগতভাবে তার আর থাকে না।

কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী হলেই আর মেধাবী, চৌকস বুদ্ধিজীবী হলেই জ্ঞানী হওয়া যায় না, যদি না তার আচরণে মানবিকতার বিকাশ ঘটে, যদি না তিনি তার জ্ঞানকে মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করেন। তাকে বড়জোর ধৃত, প্রতারক বা শোষক বলা যায়। অবিদ্যা বা অপবিদ্যার প্রভাবেই মানুষ এরকম শোষণকে পরিণত হয়।

প্রশ্ন : পাশ্চাত্য যদি অবিদ্যায় এতটাই ভরাক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে কেন তারাই বিশ্বে সবচেয়ে অগ্রসর হয়ে আছে?

উত্তর : জ্ঞান ও বিদ্যার চর্চা এবং তথ্য ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ দুটো আলাদা বিষয়। তথ্য ও প্রযুক্তির এই উৎকর্ষের মাধ্যমে দক্ষতা সৃষ্টির ফলেই পাশ্চাত্য এখন অগ্রসর হয়ে আছে। কিন্তু সত্যিকার জ্ঞান বা বিদ্যার চর্চা যা মানবিকতাকে স্থান দেয় সবচেয়ে উপরে সেটোর প্রভাব পাশ্চাত্যে নেই। বরং তার কিছুটা হলেও আছে প্রাচ্যে। কারণ পাশ্চাত্যের দর্শনই হচ্ছে ‘জোর যার মূলুক তার’ এবং এর উৎস হলো গ্রীক দর্শন। এরিস্টটল ও প্লেটোর এই দর্শনের মূল কথা হলো সমাজকে শাসন করবে মুষ্টিমেয় কিছু অভিজাত গোষ্ঠী আর সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের কাজ হলো এই গোষ্ঠীর সেবা ও পদলেহন করা। অথচ বর্ণবাদী এই দর্শন যে সময় পাশ্চাত্যকে গ্রাস করেছে, আড়াই হাজার বছর আগের ঠিক সেসময়ই প্রাচ্যে মহামতি বুদ্ধ প্রচার করেছেন অহিংসা ও সাম্যের বাণী, ঘোষণা করেছেন, জন্মের দ্বারা নয় কর্ম দ্বারাই নির্ধারিত হয় একজন মানুষ ব্রাহ্মণ বা মর্যাদাশীল হবে নাকি অচ্ছত্র বা অপাংক্তেয় হবে। এমনকি সভ্যতার বিকাশ পাশ্চাত্যে হয়েছে বলে আমরা মনে করি। অথচ সভ্যতার বিকাশ, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রথম চর্চা, শিল্প-সংস্কৃতির পীঠস্থান গ্রীস বা রোম নয়, তাহলো ব্যাবিলন, মেসোপটেমিয়া বা ভারত। মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে বা তুরস্কের ওসমানীয় খলিফা সোলেমান দি ম্যাগনিফিশেন্টের দরবারে ভাগ্যানুসন্ধানী ইউরোপীয়রাই এসে কুর্নিশ করেছিলো যা প্রমাণ করে প্রাচ্যের অগ্রসরমানতা।

অবিদ্যা বিষয়ক আপনার প্রশ্ন

উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

কিন্তু এখন পাশ্চাত্য অগ্রসর হয়ে আছে তাদের মেধা ও দক্ষতার বিকাশ ঘটানোর কারণে। কারণ একটি জাতির অগ্রসরমানতার দুটো উৎস- নৈতিক শক্তি এবং বৈষয়িক শক্তি বা প্রযুক্তি।

বৈষয়িক শক্তি বা প্রযুক্তি ছাড়া, মেধা ও যোগ্যতা ছাড়া সত্যতা বা নৈতিকতার শক্তি কোনো কাজে লাগানো যায় না। তাই আমরা যদি নৈতিকতা এবং প্রযুক্তি- এ দুয়েরই মিলিত বিকাশ ঘটাতে পারি তাহলেই আমরা পৃথিবীকে নেতৃত্ব দিতে পারবো।

প্রশ্ন : টাকা না থাকলে আমি কোয়ান্টাম কোর্স করতে পারতাম না। অতএব টাকার প্রয়োজনীয়তা জীবনে ১০০%। তবে কেন মানুষ টাকার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠবে না?

উত্তর : টাকার জন্যে যদি আপনি মরিয়া হয়ে ওঠেন তাহলে টাকা আপনার কাছে থাকবে না। সেই সাথে চলে যাবে প্রশান্তি, পরিবারের সুখ এবং আত্মার তৃপ্তি। কারণ টাকাই যদি সব দিতে পারতো তাহলে বিভবানরাই হতেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখী। তাই টাকার প্রয়োজন অবশ্যই আছে, তবে তার জন্যে এমন কিছু করবেন না, যা আপনার প্রশান্তিকে নষ্ট করবে।

বিভবান হওয়ার প্রাকৃতিক সূত্র হচ্ছে, মেধাকে কাজে লাগানো, দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে তা দিয়ে মানুষকে সেবা করার আন্তরিক ইচ্ছা। যেমন, একজন ডাক্তার যদি টাকা নয়, মানুষের সেবার ইচ্ছে নিয়ে কাজ করেন, তখন তার দক্ষতাই হয়ে ওঠে তার প্রার্থ্যের উৎস। একজন মুচি যদি জুতো মেরামতের কাজকেও সেবার দৃষ্টিভঙ্গিতে নিতে পারে তাহলেই তার পক্ষে সম্ভব সবচেয়ে দক্ষ একজন মুচিতে পরিণত হওয়া এবং সহজ স্বতঃস্ফূর্ত গতিতে প্রাচুর্যবান হওয়া।

তাই টাকার পেছনে মরিয়া হয়ে ছুটে কোনো লাভ নেই। বরং নিজের মেধাকে বিকশিত করুন, নিজের যোগ্যতাকে সর্বোচ্চভাবে মানুষের সেবায় লাগানোর চেষ্টা করুন। দেখবেন অর্থ-খ্যাতি-সম্মান সবই আপনার হাতের মুঠোয়।

প্রশ্ন : আমি এ বছর এইচএসসি পাশ করেছি। বেশ ক’টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিয়েও প্রথম সারির বিষয় পাই নি। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার ইচ্ছা আমার বহুদিনের। তাহলে কি এখন যে কোনো বিষয়ে ভর্তি হয়ে যাবো নাকি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবো?

উত্তর : যে কোনো মূল্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে হবে- এটা ছাত্র-ছাত্রীদের জীবনের একটা বড় অবিদ্যা। কারণ সত্যিকারের জ্ঞানার্জনের জন্যে না হয়ে যদি ‘বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি’- শুধু এই গর্বের জন্যে যে কোনো একটি বিষয়ে ভর্তি হতে হবে- এই দৃষ্টিভঙ্গি কোনো শিক্ষার্থীর থাকে, তাহলে এই লেখাপড়া তার জীবনে কোনো কাজে লাগবে না।

আবার যদি প্রথম হতে পারেন, তাহলে নৃবিজ্ঞানের মতো বিষয়ে লেখাপড়া করেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসেবে বিদেশের মাটিতে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন

এমন উদাহরণও আছে। নিজের পড়াশোনা বা পেশার বিষয় বাণিজ্য হলেও ইতিহাসে গভীর জ্ঞানের কারণে জনপ্রিয় বক্তা হিসেবে সমাদৃত হয়েছেন এমন ব্যক্তিও রয়েছেন।

কাজেই নিজের বিষয়কে ভালবাসতে না পারলে শুধু কোনো রকমে পাশ করার মনোবৃত্তি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে কোনো লাভ নেই। তার চাইতে পাস কোর্স-এ ভর্তি হওয়া অনেক ভালো। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে বলা যায়, দু’একটি ছাড়া বাকি অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় একেবারেই বড় আকারের কিন্ডারগার্টেন ছাড়া আর কিছুই নয়। বিপুল অর্থের তুলনায় এখানে যে লেখাপড়া, শিক্ষা উপাদান, অবকাঠামো এবং শিক্ষক মান রয়েছে তার বিচারে এগুলো অধিকাংশই বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত হওয়ার উপযুক্ত নয়। এখান থেকে ডিগ্রী নিয়ে পরবর্তীতে অনেক ক্ষেত্রেই ছাত্র-ছাত্রীরা চাকরির বাজারে ব্যর্থ হয়।

তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে না পড়লে জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে এই দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ কর এবং যে বিষয়েই পড় না কেন সে বিষয়েই প্রথম হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে চেষ্টা কর। দেখবে তখনই তুমি ব্যতিক্রমী হিসেবে সফল হবে।

প্রশ্ন : টিভি দেখাটা একটা নেশার মতো হয়ে গিয়েছে। এর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে জানার পরও এ আসক্তি থেকে বেরুতে পারছি না। এ ক্ষেত্রে কি করণীয়?

উত্তর : আপনি যে টিভি দেখাটাকে নেশার সঙ্গে তুলনা করেছেন তাতেই বোঝা যায় এর ক্ষতি সম্পর্কে আপনি সচেতন। কিন্তু এ সচেতনতা সার্থক হবে যখন আপনি বাস্তবেও এই আসক্তি থেকে মুক্ত হতে পারবেন। কারণ টিভিকে বলা হয় ‘বোকোর বাস্ক’ অর্থাৎ দর্শককে এটা বোকোর মতোই মোহমুগ্ধ করে রাখে। কিন্তু অনেকক্ষণ দেখার পর ক্লান্ত হয়ে টিভি বন্ধ করার পর বুঝতে পারেন এতক্ষণের নীট ফলাফল শূন্য। বরং সের্স, সাসপেন্স আর ভায়োলেন্সে ভরা এসব প্রোগ্রাম আপনার মায়বিক উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয়।

আসলে এই টিভি মিডিয়ার মাধ্যমে পুঁজিবাদী শোষণ চক্র তাদের দীর্ঘমেয়াদী ষড়যন্ত্রকেই বাস্তবায়িত করছে। কারণ মানুষকে যদি কামনা-বাসনা-লালসায় উসুকে দেয়া যায়, মানবিক মূল্যবোধ যদি ধ্বংস করে দেয়া যায় তাহলে তারা কখনো শোষণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে না। ভোজন, জৈবিক চাহিদা পূরণ এবং অন্যকে পীড়ন করাকে যদি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলে প্রচার করা যায় তাহলে সাধারণ মানুষ পরিণত হবে চিরস্থায়ী দাসে, আর সেটাই এই শোষণ চক্রের চক্রান্ত, যে উদ্দেশ্যে তারা মিডিয়াকে ব্যবহার করছে।

প্রশ্ন : আমার আকু-আম্মু কথায় কথায় বলে, ‘তোমাকে দিয়ে কিছু হবে না। তোমার লেখাপড়ার দরকার নেই, ঘরে বসে কাজ করবে।’ তাহলে আমি কি করবো?

উত্তর : এই আকু-আম্মুর জন্যে দোয়া করবে আর তুমি প্রো-অ্যাকটিভ থাকবে। যখনই বলবে তোমার পড়াশোনার দরকার নেই, তখনই তুমি বলবে, ‘বাতিল, বাতিল, আমার পড়াশোনার অনেক দরকার’। কারণ পড়ালেখা না করলে তোমার নিজের পরিচয় সৃষ্টি হবে না। আর তখন ‘দাস’ বা ‘দাসী’ হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। এ কারণেই পড়াশোনা এত গুরুত্বপূর্ণ এবং নবীজী (স.) প্রত্যেক নর-নারীর জন্যে জ্ঞানার্জনের ফরজ বলেছেন। কোনো বাবা-মা সন্তান মেয়ে হওয়ার কারণে যদি পড়াশোনা না করান তাহলে তিনি এ ফরজটাকে লঙ্ঘন করলেন। তাদের মতো হতভাগা আর কেউ নেই। কিন্তু তুমি যেহেতু কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট কাজেই তোমাকে চিন্তায় বিশ্বাসে অটল থাকতে হবে এবং জয়ী হতে হবে।



কেক কেটে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠান উদ্বোধন করছেন ফাউন্ডেশনের রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সেলের উপদেষ্টা ড. রমেশ চন্দ্র দেবনাথ।

রাজশাহী সেন্টারের ৭ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

গত ৯ জানুয়ারি ২০০৮ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন রাজশাহী সেন্টারের ৭ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়। ফাউন্ডেশন অফিসে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রায় একশত গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টার। প্রধান অতিথি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সেলের উপদেষ্টা ড. রমেশ চন্দ্র দেবনাথ কেক কাটার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এরপর রাজশাহী সেন্টারের পরিচালক জনাব কায়সার পারভেজ মেহেদী, সদস্য জনাব আশফাক আলী পাণ্ডু এবং সেলিনা আখতার নীলা তাদের আলোচনার মাধ্যমে রাজশাহীতে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের অগ্রযাত্রার প্রারম্ভের স্মৃতিবিজড়িত দিনগুলোকে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে ফাউন্ডেশনের সেবামূলক কাজের মাধ্যমে দেশ ও জাতি উপকৃত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন এবং ফাউন্ডেশনের সার্বিক মঙ্গল কামনা করেন।



নবীন গ্রাজুয়েট বরণ অনুষ্ঠানে অনুভূতি ব্যক্ত করছেন একজন নবীন সদস্য। (নিচে) সুনামগঞ্জ সেলের ঈদ পুনর্মিলনীতে ধ্যানমগ্ন সদস্যরা



ফাউন্ডেশন সংবাদ

১৭০ ব্যাচের নবীন গ্রাজুয়েট বরণ অনুষ্ঠান

গত ১৯ জানুয়ারী ২০০৮ সোমবার বিকেলে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, রাজশাহী সেন্টারে ১৭০ ব্যাচের গ্রাজুয়েটদের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়। দায়িত্বশীল জনাব মো. আবু সাইদের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর নবীন গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে বরণপত্র পাঠ করেন জনাব মাসুদুল হক সিদ্দিকী। ১৭০ ব্যাচের গ্রাজুয়েটদের মধ্য থেকে ডা. কবিরুল হাসান বিন রকিব, মো. নূর সাইদুজ্জামান, সালেহ আহমেদ, মো. শামসুদ্দোহা, মিসেস বিদিতা জাহান, এ্যাডভোকেট নাসরিন আখতার মিতা ও রাবেয়া রশি তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেন। বজারা মেডিটেশনের মাধ্যমে নিজেদের আলোকিত করার এবং সৃষ্টির সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। রাজশাহী সেন্টারের পরিচালক জনাব কায়সার পারভেজ মেহেদী তার সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে নবীন বরণের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করেন। তিনি ফাউন্ডেশনের সাথে একাত্মতার গুরুত্ব আলোচনা করেন এবং ফাউন্ডেশনের আত্ম উন্নয়নমূলক কাজে নিজেদের নিবেদিত করার জন্যে ১৭০ ব্যাচের গ্রাজুয়েটদের প্রতি আহ্বান জানান। ১৭০ ব্যাচের ৩০ জন নবীন গ্রাজুয়েট ছাড়াও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নির্বাহী ও দায়িত্বশীল স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এতে অংশ নেন।

প্রতিবেদক : আহমেদ জুবাইর হাসান

সিলেট সেন্টারে দায়িত্বশীল ওয়ার্কশপ

গত ৬ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার সিলেট সেন্টারে দায়িত্বশীল ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সুনামগঞ্জ সেল, ছাতক সেল ও শাপলাবাগ সেলের দায়িত্বশীলরা মোট ৪৭ জন অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপী এই ওয়ার্কশপে কোয়ান্টিয়ারদের উদ্দেশ্য, চারিত্রিক উৎকর্ষ, শৃঙ্খলা, নিয়মানুবর্তিতা ও সহমর্মিতা ইত্যাদি বিষয় চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়। বিকেল ৪:৩০ মিনিটে ওয়ার্কশপটি শেষ হয়। ওয়ার্কশপ পরিচালনা করেন সিলেট সেন্টারের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ সীতাব আলী।

সুনামগঞ্জ সেলের ঈদ পুনর্মিলনী

গত ৩ ফেব্রুয়ারী সুনামগঞ্জ সেলের ঈদ পুনর্মিলনী উপলক্ষে গ্রাজুয়েট-মাস্টাররা একাত্ম হন প্রকৃতির সাথে। সীমান্তের কাছে সুনামগঞ্জের নারায়ণতলায় নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মাঝে উৎসব আনন্দে মেতে ওঠেন সেলের ২০ জন অংশগ্রহণকারী দলটি।

লামায় দন্ত শিবির

গত ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারী বান্দরবানের লামায় অবস্থিত কোয়ান্টাম মেডিটেশন রিসোর্টে তৃতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হয় দু'দিন ব্যাপী দন্ত শিবির। বিশিষ্ট ডেন্টাল সার্জন ডা. হাবীবুর রহমানের পরিচালনায় গত তিন বছর ধরে লামায় আয়োজিত হচ্ছে এই শিবির। এবারে আড়াই শতাধিক রোগীর দন্ত পরীক্ষা করা হয় যাদের অর্ধেকই ছিলেন পাহাড়ি। দাঁত তোলা হয়েছে ৬১ জনের, ফিলিং করা হয়েছে ২২ জনের এবং বাকিদের ওষুধ ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এই শিবিরে স্বেচ্ছাসেবক দলে তার সাথে আরও ছিলেন জিন্নাতুন্নাহার বিউটি, মাহবুবুর রহমান, এন নাহার রিনা, ইফতেখার আলম মিশুক ও শফিকুর রহমান।

দন্ত শিবির আয়োজনের ফলে দুর্গম পার্বত্য এলাকার শত শত মানুষ পেয়েছে দন্ত চিকিৎসার সেবা যারা অনেকেই এর আগে কখনো এ সুযোগ পায় নি। পরপর তিনবার আয়োজনের ফলে তাদেরকে নিয়মিত দন্ত পরীক্ষার আওতায় আনা গেছে এবং দাঁতের স্বাস্থ্য সম্পর্কেও তাদের সচেতনতা বেড়েছে।



দন্ত শিবিরে একজন রোগীকে পরীক্ষা করছেন ডা. হাবীবুর রহমান। তাকে সহযোগিতা করছেন জিন্নাতুন্নাহার বিউটি

মিরপুর শাখার ঈদ পুনর্মিলনী ও পিকনিক

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মিরপুর শাখার ঈদ পুনর্মিলনী গত ৬ ফেব্রুয়ারী শাখা কার্যালয়ে পরিচালক জনাব আবদুল্লাহ জুবাইর-এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে চলতি সময়ের মধ্যে রেকর্ড সংখ্যক গ্রাজুয়েট ও অতিথি অংশ নেন। এতে লামা মেডিটেশন রিসোর্টে সপরিবারে ঈদুল আযহা উদযাপন নিয়ে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা করেন সাদিয়া পারভীন। এছাড়া মাকসুদ হোসেন ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমে প্রতিকূলতা জয় এবং সাবাহা তাবাসসুম মাটির ব্যাংকে টাকা রাখার মাধ্যমে সাফল্য অর্জনের বিষয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে ফল ও পিঠার প্রাকৃতিক খাবার পরিবেশন করা হয়।

মিরপুর শাখার উদ্যোগে গত ১৩ ফেব্রুয়ারী তৃতীয় বারের মতো পিকনিক অনুষ্ঠিত হয় বোটনিক্যাল গার্ডেনে। সকালে শাখা কার্যক্রম শেষে প্রায় ৪০ জনের একটি দল পিকনিক স্পটে প্রাকৃতিক পরিবেশে সারাদিন অতিবাহিত করেন। এতে শাখার গ্রাজুয়েটরা পরিবারের সদস্যদের নিয়ে অংশ নেন। আনন্দমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত এই পিকনিকে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হয়।

একুশের বইমেলায় ব্লাড ক্যাম্প ভাষাশহীদ স্মরণে রক্তদানের আবেদনে ব্যাপক সাড়া

‘ভাষাশহীদ স্মরণে রক্তদান’- এই স্লোগান নিয়ে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে এ বছর একুশের বইমেলায় ৩য় বারের মতো মাসব্যাপী স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচির আয়োজন করেছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম। গতবারের মতো এবারও বাংলা একাডেমীর বর্ধমান ভবনের বারান্দায় তথ্য কেন্দ্রের পাশে ক্যাম্পের স্থান নির্ধারিত হয়। কোয়ান্টামের পাশাপাশি অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোও মেলায় ব্লাড ক্যাম্পের স্টল নেয়। এবার শুধু মেলা প্রাঙ্গণেই নয় আশেপাশের সমস্ত চত্বর জুড়ে ছিলো রক্তদানে উদ্বুদ্ধকরণ বাণী সংবলিত বিভিন্ন ফেস্টুন, ব্যানার ও পোস্টার, যা সবারই নজর কেড়েছে।

মেলায় তথ্য কেন্দ্র থেকে জরুরী রক্তের ঘোষণা ছাড়াও কোয়ান্টামের স্বেচ্ছা কর্মীরা মেলায় আগত মানুষদের রক্তদানে উদ্বুদ্ধ করেন। তারা রক্তদাতাদের সুবিধাসমূহ এবং বিশুদ্ধ রক্তের সংকট সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে অবহিত করেন। এই মোটিভেশনের ফলে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতার সৃষ্টি হয় এবং রক্তদানে ব্যাপক আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।

মেলায় ক্যাম্পে প্রতিদিন বিভিন্ন বয়সের

লোকজন রক্তদান করেছেন। তবে এর মধ্যে তরুণ-তরুণীদের সংখ্যাই ছিলো বেশি। রক্তদাতাদের মধ্যে অনেকেই গত দু’বার রক্তদান করেছিলেন। এবার রক্তদানের মাধ্যমে তারা ‘লাইফ লং ব্লাড ডোনার’-এ পরিণত হন। কেউ কেউ আবার প্রথম বারের মতো রক্তদান করেন। অনেকে নিজে রক্তদান করে পরবর্তীতে তার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে রক্তদানের জন্যে নিয়ে আসেন।

অনেক খ্যাতিমান লেখক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক ক্যাম্প পরিদর্শন করেন এবং কোয়ান্টামের কার্যক্রমের প্রশংসা করেন। সংবাদপত্র ও টিভি মিডিয়াগুলো এ সম্পর্কিত বিশেষ খবর প্রচার করে।

এবারের বইমেলায় ক্যাম্পের একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা হলো দুজন তরুণ কবি তাদের নতুন বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেছেন রক্তদানের মাধ্যমে। এ ব্যাপারে তাদের অনুভূতি হলো, রক্তদানের মতো একটি মানবিক কাজের মাধ্যমে উদ্বোধন করে প্রকাশনা উৎসব যেন পরিপূর্ণতা পেলো।

গত ৭ ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু করে ২৯ ফেব্রুয়ারী শেষ দিন পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৬০ ব্যাগ হিসেবে মোট ১৩৫০ ব্যাগ রক্ত সংগৃহীত হয়। ছুটির দিনগুলোতে লক্ষ্য করা গেছে উপচে পড়া ভিড়। এ সময়ে গড়ে ১৫০ ব্যাগ রক্ত সংগৃহীত হয়। এর মধ্যে একদিনে সর্বোচ্চ সংগ্রহ ছিলো ১৭৬ ব্যাগ। রক্তদান ছাড়াও প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৫৬ জনের রক্তের গ্রুপিং পরীক্ষা করা হয়।

গত দু’বছরের তুলনায় এ বছর রক্তদানের ব্যাপারে জনসাধারণের কাছ থেকে অনেক বেশি সাড়া পাওয়া গেছে। হরতালের দিনেও ক্যাম্পের স্বাভাবিক ধারা ব্যাহত হয় নি। এবারের মেলায় ক্যাম্পে যারা রক্ত দিয়েছেন তারা অনেকে পরে মেলায় এসে তাদের ক্রীনিং রিপোর্ট নিতে পেরেছেন। ফলে তাদের আগ্রহ আরো বেড়ে গেছে।

ক্যাম্পে প্রতিদিন গড়ে ২০ জন স্বেচ্ছা সেবক কাজ করেছেন। ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন শাখা-সেল থেকে স্বেচ্ছা সেবকরা ক্যাম্প পরিদর্শনে এসেছেন এবং মোটিভেশনে সহায়তা করেছেন। সকলের আন্তরিকতা ও সহযোগিতায় প্রতিদিন আনন্দঘন পরিবেশে রক্তদান কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।



যৌথ মেডিটেশনের মাধ্যমে শুরু হচ্ছে একুশে বইমেলা ২০০৮-এর ব্লাড ক্যাম্প

এছাড়া মেলায় এই মাসব্যাপী রক্তদান কার্যক্রম রক্তদান সম্পর্কে সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপক সচেতনতার সৃষ্টি করেছে।

প্রতিবেদক : সাইফুদ্দিন হাওলাদার অপু

শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি : সম্মাননা অনুষ্ঠান স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস

স্বেচ্ছা রক্তদাতাদের নিঃস্বার্থ দানের প্রতিদান দেয়ার সামর্থ্য আমাদের নেই। সম্মাননা অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে আমরা যা করছি তাহলো তাদের এই আন্তরিক সেবার জন্যে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরই একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে আয়োজিত শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জনাব শহীদ আল বোখারী।

গত বছর ৬ জুলাই কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের উদ্যোগে এক হাজার আজীবন রক্তদাতাকে সম্মাননা প্রদানের পর এ বছর থেকে নিয়মিতভাবে পরবর্তী প্রতি একশত নতুন রক্তদাতাকে সম্মাননা প্রদানের অংশ হিসেবে আয়োজিত হয় এই অনুষ্ঠান। স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের প্রধান সমন্বয়ক নাহার আল বোখারীর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের কো-অর্ডিনেটর, পাবলিক রিলেশন অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব এবং কো-অর্ডিনেটর, মোটিভেশন জনাব জহিরুল ইসলাম প্রিন্স।

সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে আয়োজিত অনাড়ম্বর এই অনুষ্ঠানেও স্বেচ্ছা রক্তদাতারা বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন, সম্মাননা প্রাপ্ত হয়ে উৎফুল্ল বোধ করেন।

পরবর্তী শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান হবে আগামী ২১ এপ্রিল, ২০০৮।



ফর্ম পূরণ করছেন রক্তদাতারা। (নিচে) রক্তের গ্রুপিং পরীক্ষা করা হচ্ছে



কোয়ান্টাম বুলেটিন



নতুন ধ্যানঘর উদ্বোধন

এবারের ধ্যান উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ ছিলো নতুন ধ্যানঘর উদ্বোধন। পুরনো ধ্যানঘরের মূল স্থান ঠিক রেখে বর্ধিত পরিসরের নতুন এ ধ্যানঘরের নির্মাণ কাজ শেষ করতে দিন-রাত কাজ করেছেন সংশ্লিষ্ট কর্মিবাহিনী। লামার মতো দুর্গম এলাকায় এত বড় একটি স্থাপনার কাজ যথাসময়ে শেষ করা ছিলো একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে সেই চ্যালেঞ্জই সফলভাবে মোকাবেলা করে ধ্যানঘরের কাজ শেষ হলো ৪ মার্চ অর্থাৎ ধ্যান উৎসবের ঠিক আগের দিন।

ধ্যান উৎসবের দ্বিতীয় দিনের প্রথম কর্মসূচিই ছিলো ধ্যানঘর উদ্বোধন। সে অনুযায়ী ফজরের নামাজের পর চারটি হিল স্টেশন থেকে ২০০ জন ধ্যানযাত্রী বিভিন্ন পথে এসে হাজির হন ধ্যানঘরের দোরগোড়ায়। দীর্ঘ কয়েকটি লাইনে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে সবাই অপেক্ষা করতে থাকেন ধ্যানঘর উদ্বোধনের মুহূর্তটির জন্যে। অবশেষে ভোর ৫.৩০ মিনিটে গুরুজী সংক্ষিপ্ত এক প্রার্থনার মাধ্যমে মহান স্রষ্টার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে ধ্যানঘরের দরজা খুলে দেয়ার আহ্বান জানান। এ সময় তাঁর পাশে ছিলেন শ্রদ্ধেয়া মা-জী।

দরজা খুলে দেয়ার পর গুরুজী ও মা-জীর পেছনে এক এক করে সবাই ভেতরে প্রবেশ করেন এবং সুশৃঙ্খল ভাবে বসে পড়েন। ধ্যানঘরের মেঝেতে আগেই বিছিয়ে দেয়া হয়েছিলো ফোমের তোষকের উপর ডেনিমের লম্বা থান। মাঝামাঝি অবস্থানে কিছুটা উঁচু করে পাতা হয়েছিলো গুরুজী, মা-জীর আসন।

নতুন ধ্যানঘর উদ্বোধন উপলক্ষে এক আবেগপূর্ণ মেডিটেশনে গুরুজীর সঙ্গে সকলে এই প্রার্থনায় সমবেত হন যেন মহান স্রষ্টা এই ধ্যানঘরকে শুধু তাঁকে উপলব্ধি করার, তাঁর মাহাত্ম্য ঘোষণার জন্যেই কবুল করেন।



কোয়ান্টাম মেডিটেশন রিসার্চে নবনির্মিত ধ্যানঘর

ধ্যান উৎসব ২০০৮-এ অংশগ্রহণকারীদের উপলব্ধি

লামা : আমাদের সাধনার মনের বাড়ি

ধ্যান শুধু কষ্টকর নয়, আনন্দ উপভোগের মাধ্যমেও যে করা যায় সে অভিজ্ঞতা নিয়েই এবার লামায় ৪, ৫ ও ৬ মার্চ, ২০০৮ অনুষ্ঠিত ধ্যান উৎসবে অংশ নিলেন সারা দেশ থেকে আগত দু'শতাধিক ধ্যানযাত্রী।

আমাদের সাধনার মনের বাড়ি হলো লামা। শহরের কোলাহলমুখর ব্যস্ততার ভারে হাঁপিয়ে উঠে যে মানুষ জীবনের আনন্দকে হারিয়ে ফেলেছে তার জন্যে লামা। যেখানে প্রকৃতির বিশালতা আপনাকে মুগ্ধ করবে, অন্যায়সে নিজের মধ্যে ডুবে যাওয়ার সুযোগ আপনাকে তৃপ্তি দেবে আর মানুষ যে কত সরল এবং অনুগত হতে পারে সে দৃষ্টান্ত আপনাকে বিস্মিত করবে।

ধ্যান উৎসবে অংশগ্রহণের প্রাক্কালে গুরুজী শহীদ আল বোখারীর এই উদ্ধৃতিগুলো হৃদয়ঙ্গম করেন ধ্যানযাত্রীরা। আর পুরো ধ্যান উৎসবের প্রতিটি ক্ষণে তারা উপলব্ধি করেন এ বাণীগুলোর যথার্থতা।

বান্দরবানের লামায় স্থাপিত কোয়ান্টাম মেডিটেশন রিসার্চে তৃতীয় বারের মতো আয়োজিত এ ধ্যান উৎসবে এবার সর্বাধিক সংখ্যক সদস্য অংশগ্রহণ করেন। যাদের অধিকাংশই এর আগে লামায় আসেন নি। তাছাড়া

আবহাওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পূর্ব নির্ধারিত অনুষ্ঠানসূচিতেও ব্যাপক রদবদল করা হয় যা ছিলো একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। কিন্তু এই পরিবর্তিত কর্মসূচিতে অংশ নিয়েও ধ্যানযাত্রীদের উপলব্ধির মাত্রায় কোনো ব্যত্যয় ঘটে নি। বরং তা আরও বৈচিত্রপূর্ণ হয়েছে—এ অভিজ্ঞতাই ব্যক্ত করেছেন প্রায় সবাই।

এবারের ধ্যান উৎসবে উদ্বোধন করা হয় নতুন ধ্যানঘর। ১০০০ বর্গফুটের বিশাল ধ্যানঘরে প্রথম মেডিটেশনের আনন্দ, ভোরের নরম আলোয় জাব্লে শামসে আরোহণ এবং নৈশায়নের প্রোথামে প্রথমে ধ্যানঘর ও পরে উন্মুক্ত প্রকৃতিতে রাত্রি জাগরণ, দিনের বেশির ভাগ সময় মুক্ত ভ্রমণ বা বিভিন্ন মধ্যে গ্রুপে গ্রুপে কোয়ান্টায়ন—গত দুই ধ্যান উৎসবের চেয়ে ব্যতিক্রমধর্মী এ আয়োজনগুলোকে প্রাণভরে উপভোগ করেছেন অংশগ্রহণকারীরা।

এই বিশাল প্রকৃতির সান্নিধ্যকে উপভোগ করার জন্যে তিন দিন যে কত কম সময়, সেই অতৃপ্তি নিয়ে এবং আবারও এই মনের বাড়িতে ফিরে আসার ব্যাকুলতা নিয়ে সবাই উৎসব শেষে ফিরে আসেন নিজ নিজ গন্তব্যে।

লামায় নৈশায়ন : বিরল উপলব্ধিময় একটি রাত

রাত দেড়টা। ফাল্গুনের ভরা পূর্ণিমার পুরো চাঁদ আকাশে। সেই ফকফকে জোছনায় পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন বয়সী এক দল নারী। মৌনতা অবলম্বন করে নিঃশব্দ অবলোকনে তারা যখন দেখছিলেন চারপাশের পাহাড় আর প্রকৃতি তখন তাদেরকে মনে হচ্ছিলো এ প্রকৃতিরই অংশ। মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে একাত্মতার বাস্তব এ অনুভূতি বোধ হয় সত্যিই বিরল।

আর তার চাইতেও বিরল বোধ হয় এই পুরো দৃশ্যটি, যেখানে এত গভীর রাতে ঘরের বাইরে পাহাড়ের সমতলে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন এক দল মহিলা, অথচ তাদের কোনো ভয় নেই, নিরাপত্তাহীনতার আশংকা নেই। বরং আছে গভীর রাতে প্রকৃতির বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য অবলোকনের মুগ্ধতা, মহান স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ এবং এক অভূতপূর্ব আত্মবিশ্বাস, যার উৎস বোধ হয় এই বিরল অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষদর্শী হবার সৌভাগ্য।

এ দৃশ্যটি এবারের ধ্যান উৎসবের ব্যতিক্রমী আয়োজন নৈশায়নের। উল্লেখ্য যে, নৈশায়ন হলো মৌন সাধনার একটি বিশেষ অংশ যাতে বিশেষ নির্দেশনা অনুসরণের মাধ্যমে সারা রাত জেগে কাটাতে হয়। ধ্যান উৎসবে এবারই প্রথম নৈশায়ন সংযুক্ত হয়। দ্বিতীয় দিন শেষে রাতের খাবারের পর সবাইকে কিছুটা সময় ঘুমানোর অবকাশ দেয়া হয় যাতে রাত্রি জাগরণের প্রস্তুতি নেয়া যায়।

রাত ১১টার মধ্যে সবাই ধ্যানঘরে পৌঁছার পর শুরু হয় নৈশায়ন। সেখানে প্রায় দু'ঘণ্টা অবস্থানের পর সবাইকে নিজ নিজ হিল স্টেশনে বা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে স্বাধীন ভাবে নৈশায়ন করার অনুমতি দেয়া হয়।

চার পাশের প্রকৃতির অসাধারণ নৈঃশব্দের মাঝে দীর্ঘ মৌনতায় ডুবে গিয়ে প্রতিটি ধ্যানী যেন এক অপার্থিব অনুভূতিতে হারিয়ে গিয়েছিলেন। ফলে শত মানুষের মধ্যেও যে একা হওয়া যায়, আত্মনিমগ্নতার গভীরে গিয়ে ভুলে যাওয়া যায় বর্তমান স্থান, কাল, সময়কে—এই অতুলনীয় অনুভূতিতে শিহরিত হয়েছেন প্রত্যেকে।

ফজরের নামাজ পড়ে সবাই আবার ধ্যানঘরের উদ্দেশ্যে রওনা হন। প্রজ্বলিত মশাল সারির ভেতর দিয়ে ধ্যানঘরে প্রবেশ করে হৃদয় প্রশান্ত করা চমৎকার এক মেডিটেশন দিয়ে শেষ হয় নৈশায়ন।

লামা মেডিটেশন রিসর্ট : ধ্যানের এক আধুনিক নগরী

এক সময়ের দুর্গম পাহাড়ি লামা মেডিটেশন রিসর্ট আজ সভ্যতার আশীর্বাদপুষ্ট। অল্প কয়েক বছরের ব্যবধানে রক্ষ, উষর, বৃক্ষহীন একটি এলাকা পরিণত হয়েছে সবুজ সুশোভিত ও সমৃদ্ধ এলাকায়। প্রাকৃতিকভাবে সাজানোর পাশাপাশি লামা মেডিটেশন রিসর্টকে বসবাস উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। এখানে সপরিবারে থাকার জন্যে রয়েছে আধুনিক স্যানিটেশন ব্যবস্থা সহ বাংলো। নতুন ভাবে স্থাপন করা হয়েছে আরো ১৬টি টয়লেট। বসানো হয়েছে বেশ কয়েকটি নলকূপ। শিশুকাননকে আলাদাভাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। শ্রেণী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় নতুন সম্প্রসারিত স্কুল ঘর নির্মিত হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থারও প্রভূত উন্নয়ন ঘটেছে। জেনারেটর ব্যবহার করে শিশুকানন, টয়লেট, বাংলো ও অফিস কক্ষগুলো পাচ্ছে ইলেকট্রিসিটি সুবিধা যা এই পাহাড়ি এলাকার প্রেক্ষিতে বিরল। সর্বোপরি পরিকল্পিতভাবে ধীরে ধীরে আদিম প্রকৃতির মাঝে গড়ে তোলা হচ্ছে ধ্যানের এক আধুনিক নগরী।



বোধি মঞ্চ

পাহাড়ের ওপর গর্জন কাঠের খুঁটি আর বাঁশ দিয়ে তৈরী এ মঞ্চ। গাছের শুকনো পাতার উপর দিয়ে মর্মর ধ্বনি করতে করতে এগিয়ে যান বোধি মঞ্চের দিকে। খাড়া পাহাড় বেয়ে ওঠার ক্লান্তি এখানে মেডিটেশনে বসার সাথে সাথেই বিলীন হয়ে যাবে। চারদিকে পিন-পতন নিস্তব্ধতা। গাছের শুকনো পাতা খসে পড়ার আওয়াজও আপনার কানে বাজবে। কোনো প্রস্তুতি ছাড়াই আপনি চলে যাবেন ধ্যানের গভীরতায়।

জেন মঞ্চ

বাঁশ ঝাড়ের নিচে নবনির্মিত এ মঞ্চটিতে মেডিটেশনে ভিন্ন মাত্রা অনুভব করবেন। সহজেই আপনি আত্মনিমগ্ন হয়ে পড়বেন। চলে যাবেন অতীত রোমস্থানে। প্রাণ জুড়ানো বাতাসে আত্মমগ্ন হয়ে পার করে দিতে



জেন মঞ্চের ক্ষুদ্র ধ্যানীরাও মুহূর্তে আত্মনিমগ্ন হয়ে যেতে পারে পারবেন ঘন্টার পর ঘন্টা। এ মঞ্চের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এখানে বসে আপনি পুরো চত্বরের প্রায় সবকিছু দেখতে পেলেনও আপনাকে কেউ দেখবে না।

হাওয়া মঞ্চ

রিসর্টের প্রবেশ পথেই হাওয়া মঞ্চের অবস্থান। সমগ্র সেন্টারের কোথাও বাতাস না থাকলেও এখানে সবসময় হৃদয় শীতল করা এক ঠাণ্ডা বাতাস অনুভূত হয়। গভীর রাতে এখান থেকে মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকালে মনে হবে যেন সব তারার মেলা বসেছে। নিজেকে অনুভব করবেন বিশ্ব প্রকৃতির এক ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে।



হাওয়া মঞ্চের দুপুর রোদেও ঘুমের বাড়ি চলে যাওয়া যায় অনায়াসে

প্রজ্ঞা মঞ্চ, বিবেক মঞ্চ, করুণা মঞ্চ ও ক্ষমা মঞ্চ

জাবলে শাম্বে এ মঞ্চগুলোর অবস্থান। রং গাছের সারির ফাঁক থেকে উঁকি দিচ্ছে এক একটি মঞ্চ। এসব মঞ্চ বসে প্রখর রোদে সূর্যমুখী মেডিটেশনের অনুভূতি সত্যিই বর্ণনাতীত। প্রখর রোদ, কিন্তু আপনার গরম লাগবে না। বরং অনুভূত হবে এক ঠাণ্ডা হৃদয় প্রশান্ত করা বাতাস।



তখতে জামালি, কামালি, জালালি ও তাজাল্লি

ধ্যানঘরের দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত বোধিছড়া ঝর্নার অপর পারে কৃষ্ণ পাহাড়ে তখতে জামালি, কামালি, জালালি ও তাজাল্লির অবস্থান। ৩ তলা বিশিষ্ট মঞ্চ তখতে তাজাল্লিতে উঠলে দিগন্তের পাহাড় দেখতে পাবেন। প্রকৃতি আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবে। প্রতিটি মঞ্চে ধ্যানমগ্ন হোন। ধ্যানের গভীরতাকে নতুন ভাবে উপলব্ধি করুন। প্রকৃতির নৈঃশব্দের শব্দ শুনে আপনিও বুঝতে পারবেন কেন মুনি-ঋষিরা ধ্যান করতে পাহাড়ে আসতেন।



প্রশান্ত মঞ্চ

মেডিটেশন রিসর্টের প্রশান্ত শিখরে অবস্থিত ৪ তলা বিশিষ্ট প্রশান্ত মঞ্চ। এবারের ধ্যান উৎসবে নবনির্মিত এ মঞ্চটি সকলের জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। এখান থেকে দেখতে পাবেন সবুজ পাহাড় যেন দূর নীল আকাশে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছে। এ মঞ্চ সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় মেডিটেশনে পাবেন এক প্রশান্ত ও বর্ণিল অনুভূতি।



প্রতিবেদক :
সাইফুদ্দিন হাওলাদার



ছবি (বামে, ওপর থেকে)

১. প্রথম ধ্যানঘর
২. ২০০ বর্গফুটের দখিনা বারান্দাসহ নতুন ধ্যানঘর
৩. সামনে থেকে নতুন ধ্যানঘর
৪. ধ্যানঘরের ভেতরের অংশ

(মাঝে, ওপর থেকে)

১. প্রথম ধ্যানঘরে উদ্বোধনী মেডিটেশন
২. নতুন ধ্যানঘরে প্রথম যৌথ মেডিটেশনে ধ্যানযাত্রীরা
৩. ধ্যানঘরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ঝর্ণা



নতুন ধ্যানঘর

‘প্রকৃতির রাজ্য লামা’- এখানে প্রকৃতি যেন তার অকৃত্রিম সৌন্দর্য নিয়ে বিশালত্বের মুগ্ধতা নিয়ে প্রতিভাত। সবুজ পাহাড়, প্রবাহমান ঝর্ণার কলকল ধ্বনি- এমনই এক নৈসর্গিক পরিবেশে ১৯৯৯ সালের এপ্রিলে লামাস্থ মেডিটেশন রিসর্টে পাহাড়ি ঐতিহ্যে নির্মিত হয়েছিলো প্রথম ধ্যানঘর। ধ্যানঘরের পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত ঝর্ণার ধ্বনি ধ্যানে বসার সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্টি করে এক তন্ময়তা। মন হারিয়ে যায় নিখাদ প্রকৃতির মাঝে।

সম্প্রতি পুরনো ধ্যানঘরের স্থানে ঝর্ণার পাশেই নতুন করে নির্মিত হয়েছে ১ হাজার বর্গফুট আয়তনের নতুন ধ্যানঘর। সাথে রয়েছে ২০০ বর্গফুটের দখিনা বারান্দা। কাঠের পাটাতনের ওপর ছনের ছাউনি ব্যবহার করা হলেও এ ঘরের মাঝখানে কোনো খুঁটি ব্যবহার করা হয় নি। পাশের বারান্দাসহ পুরো ধ্যানঘরটিতে দু’শ ধ্যানী একসঙ্গে মেডিটেশন করতে পারবেন।

নতুন ধ্যানঘরে প্রথম যৌথ মেডিটেশন

ধ্যান উৎসবের দ্বিতীয় দিন সকালের প্রথম কর্মসূচিই ছিলো নতুন ধ্যানঘর উদ্বোধন। এ উপলক্ষে ভোর ৫.৩০ মিনিটে ধ্যানঘরে সমবেত প্রায় দু’শ ধ্যানযাত্রীকে নিয়ে একটি

আবেগময় মেডিটেশন

পরিচালনা করেন গুরুজী। পরম

করণাময়ের শ্রেষ্ঠত্ব

ঘোষণা করে ধ্যানঘর

উদ্বোধন করার পর

মেডিটেশনে গুরুজীর সঙ্গে

সকলে প্রার্থনায় সমবেত

হন।

নতুন ধ্যানঘরে প্রথম এই মেডিটেশনের অভিজ্ঞতাকে অনেকেই ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছিলেন না। স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধ্যানের এত গভীর লেভেলে পৌছা যায়, হৃদয় শীতল করা এত প্রশান্তি পাওয়া যায়- অনেকের জন্যে এ ছিলো এক ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা।



দরবার হলে বিদায়ী বক্তব্য রাখছেন গুরুজী। পাশে শিশুকানন কুলের ছাত্ররা

নবনির্মিত ধ্যানঘর উদ্বোধন উপলক্ষে সমবেত ধ্যানযাত্রীদের সামনে দাঁড়িয়ে গুরুজী বললেন, “পরম করুণাময়ের নামে ধ্যানঘরের দরজা খুলে দেয়া হোক।” তখন ভেতর থেকে দু’জন অদৃশ্য সহযোগী স্লাইডিং ডোরটিকে ধীরে ধীরে দু’পাশে টেনে দিলেন। আর বাইরে থেকে তা দেখেই সবার মধ্যে দরজা খোলার রহস্য নিয়ে গুরু হলো গুঞ্জন— ধ্যান উৎসবের বাকি সময় জুড়ে যা অনেককে কৌতূহল আর বিস্ময় জুগিয়েছে। এবারের পুরো ধ্যান উৎসবই ছিলো এরকম অনেক চমক আর আনন্দে ভরপুর।

গত ৫ মার্চ ২০০৪ থেকে লামার মেডিটেশন রিসর্টে গুরু হয় তৃতীয় বারের মতো তিনদিন ব্যাপী ধ্যান উৎসব। সারাদেশ থেকে নারী-পুরুষ, গ্রাজুয়েট-মেহমান মিলিয়ে দু’শতাধিক ধ্যানযাত্রী এতে অংশ নেন। ৪ মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম ও সিলেট কেন্দ্রের যাত্রীরা লামা ধ্যান কেন্দ্রে পৌছেন। ৫ মার্চ সকালে ঢাকা ও রাজশাহী সেন্টারের ধ্যানযাত্রীরা এসে পৌছেন। ধ্যানযাত্রীরা প্রথমে কল্লবাজার অভিযুখী বাসে চড়ে আমিরাবাদ পৌছেন। সেখান থেকে তাদেরকে পাহাড়ি আমেজ উপভোগ করানোর জন্যে, চড়াই-উৎরাইয়ের মাঝ দিয়ে একটি নতুন পথে গাড়ি নিয়ে আসা হয় ‘প্রশান্ত শিখরে’। এখানকার চারতলা বিশিষ্ট সবচেয়ে উঁচু প্রশান্ত মঞ্চ যেন সবাইকে চমকে দেয়ার জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। মঞ্চের ওপরের চরকা ফুরফুরে বাতাসে বেশ খোশ মেজাজে ঘুরে ঘুরে তার আনন্দ প্রকাশ করছিলো।

চাঁদের গাড়ি থেকে নেমে সবাই ধীরে ধীরে নিচে নামতে থাকেন। এ যেন প্রশান্তির গভীরে নেমে আসা। পুরুষরা বোধি মঞ্চের পাশ দিয়ে নেমে আসেন আলফা, থিটা, ডেল্টা স্টেশনে।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বাবু তিনকড়ি চক্রবর্তী



মহিলারা জাব্লে হিকমার পাশ দিয়ে সিগমা স্টেশনে পৌছান। হাত-মুখ ধুয়ে সবাই পরোটা-গোশত দিয়ে সকালের নাস্তা সেরে দরবার হলে জমায়েত হন। গুরুজীর স্বাগত বক্তব্যের পর শিশুকাননের প্যারেড গ্রাউন্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়। প্রথমে প্যারেড পরিচালক শিশুকাননের ছাত্র কাইংপ্রে মুরং প্রধান অতিথি মা-জী নাহার আল বোখারীর কাছ থেকে কুচকাওয়াজ পরিচালনার অনুমতি নেয়। এরপর শুরু হয় শিশুদের মনোরম মার্চ পাস্ট। এই সেই কুচকাওয়াজ যা প্রদর্শন করে শিশুকানন গত ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩ পুরস্কার পেয়েছিলো। শিশুকাননের ছাত্রদের সুশৃঙ্খল এই মার্চ পাস্ট সবাইকে মুগ্ধ করে। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মা-জী আশা প্রকাশ করলেন এই অবহেলিত জায়গা থেকেই বেরিয়ে আসবে আগামীর কর্ণধার। প্রধান অতিথির বক্তব্যের পর শিশুকাননের পরিচালনা



কাইংপ্রে মুরং-এর নেতৃত্বে শিশুদের মার্চ পাস্ট

পরিষদের সভাপতি বাবু তিনকড়ি চক্রবর্তী বক্তব্য রাখেন।

মার্চ পাস্টের পর ছাত্ররা ফেরদৌসী জামান প্রতিভার শোখানো সেই “প্রজাপতি, প্রজাপতি, কোথায় পেলো ভাই এমন রঙীন পাখা.....” নৃত্যটি প্রদর্শন করে। উল্লেখ্য যে, গত ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৩ বিজয় দিবস ডিসপ্লোতে শিশুকাননের একটি দল এই নৃত্য প্রদর্শন করে বান্দরবানে ৩৬টি স্কুলকে পরাজিত করে প্রথম পুরস্কার জয় করে আনে। অপর একটি দল লামায় প্রথম বারের মতো অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করে। শিশুকাননের প্রজাপতিরা মাঠ ছেড়ে যাওয়ার পর সবাই অনেকটা প্রজাপতির মতোই উড়তে উড়তে বার্নায় গোসল করতে গেলেন।

পুরুষরা ‘আবে শেফা’ এবং মহিলারা ‘আবে কুদরত’-এর পানি দিয়ে মন-প্রাণ চাঙ্গা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। ত্রুক সুন্দর করার জন্যে বার্নার বালুমাটি শরীরে মাখতে পুরুষরাও পিছিয়ে ছিলেন না।

বাংলোর পশ্চিমে সমতল লনের একপাশে আম গাছে

ঝোলানো ছিলো দোলনা। দোলনায় চড়া এবং পাশের হাওয়া মঞ্চে বসে জমিয়ে আড্ডা দেয়ার সুযোগ যেন কোনো মহিলাই হাতছাড়া করতে চাইছিলেন না। প্রখর গরমে যখন কোথাও বাতাস থাকে না, তখন এই হাওয়া মঞ্চে ঝিরঝির বাতাসের উপস্থিতি অনুভব করা যায়।

বিকেলে ধ্যানযাত্রীরা পুরো সেন্টার ঘুরে দেখেন। হুজরার ‘সবই শেষ পর্যন্ত.....’ ফসিলটি দেখে সবাই খুব পুলকিত হন।

সন্ধ্যা একটু ঘনিয়ে এলে চারদিকে পাহাড় ঘেরা এক টুকরো উপত্যকার সমান মাঠে গুরু হয় ক্যাম্প ফায়ার ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উপত্যকার দক্ষিণে বার্নাধারা তার আপন গতিতে বয়ে যাচ্ছে। অগ্নি অগ্নি শীত, হালকা কুয়াশা, চাঁদনী রাত, একপাশে ক্যাম্প ফায়ার, অন্যপাশে দর্শকদের সামনে বাঁশের ভাস্কর্য সম্বলিত মশালে ঘেরা প্রদর্শনী মঞ্চ। গত ধ্যান উৎসবে শিশুকাননের সিস্টারদের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হলেও এবারের অনুষ্ঠানের পুরোটাই করে শিশুকাননের ছাত্ররা। ত্রিপুরাদের জুম নৃত্য, বম্দের বাঁশ নৃত্য, মারমাদের সাংরাই নৃত্য ছিলো খুবই চমৎকার। শিশুকাননের থিম সঙ্গীত “অদ্র হও, নম্র হও, আনো শৃঙ্খলা; শান্ত হও, শিষ্ট হও, শিখ সত্য বলা.....” গাওয়ার সময় শিশুদের প্রত্যয় ছিলো দেখার মতো।

দ্বিতীয় দিন ভোরের ফজরের পর ছিলো এবারের ধ্যানযাত্রার মূল আকর্ষণ— নবনির্মিত ধ্যানঘর উদ্বোধন ও শোকরানা মেডিটেশন। নতুন ধ্যানঘরের ভাইব্রেশনটাই এমন যে, এর কাছে গেলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনুভব করা যায় হৃদয় প্রশান্ত

করা অন্যরকম এক অনুভূতি। মেডিটেশন শেষে সবাই খেজুর খেতে খেতে জাব্লে শামসের পথে অগ্রসর হয়। এর আগের দু’বারই জাব্লে শাম্বে যাওয়া হয়েছিলো পড়ন্ত বিকেলে। আর এবার ভোরের উঠতি সূর্যের নরম উষ্ণতায় শিশির ভেজা পথে হেঁটে জাব্লে শাম্বে যাওয়ার অনুভূতি যে কত আলাদা তা স্পষ্ট বুঝতে পেরেছেন অভিজ্ঞরা। পাহাড়ে ওঠার পর প্রত্যেকে তার সুবিধামতো জায়গায়—কেউ প্রজ্ঞা মঞ্চে, কেউ করুণা মঞ্চে, আবার কেউ মাটিতে বসে পড়লেন। সকাল ৮টায়



(বামে) জাব্লে শাম্বে ভোরের সূর্যমুখী মেডিটেশন। পেছনে প্রজ্ঞা মঞ্চ

(ডানে) শিশুদের পরিবেশনায় মারমাদের সাংরাই নৃত্য

ধ্যান উৎসব ২০০৪

হৃদয় হারিয়ে যায় বিস্ময় আর আনন্দে



চিচিং ফাঁকে এডভেঞ্চারের খোঁজে

রোদের মধ্যে গুরু হলো পূর্ব দিকে মুখ করে সূর্যমুখী মেডিটেশন। রোদ সরাসরি পড়ছে সবার চোখে কিন্তু গরম লাগছে না। বরং অনুভূত হচ্ছে এক ঠাণ্ডা, হৃদয় প্রশান্ত করা বাতাস। এরকম অভূতপূর্ব অনুভূতি সত্যিই বিরল।

মেডিটেশন শেষে সুবিশাল পাহাড় শ্রেণীর ভেতর দিয়ে একেবের্কে বয়ে যাওয়া তখতে তাজাল্লির পথে সবাই এগিয়ে যায়। তখতে তাজাল্লি অতিক্রম করে সবাই এবার নিচের দিকে নামতে থাকেন। উপর থেকে ছুটে চলা বার্না ও হংস লেকের দৃশ্য ছিলো অতুলনীয়।

সকালের খাবারের পর সবাইকে নিয়ে যাওয়া হয় বার্না ও ‘চিচিং ফাঁক’ দর্শনে। সাপ ও রামকুকুরের ভয় সত্ত্বেও এমন কাউকে পাওয়া গেল না, যে এই অ্যাডভেঞ্চার থেকে বঞ্চিত হতে চায়। পায়ের নিচ দিয়ে বয়ে যাওয়া বরফ-শীতল পানি ছাপিয়ে সবাই এগিয়ে যায় চিচিং ফাঁকের অ্যাডভেঞ্চার উপভোগ করতে। দু’পাশের খাড়া দেয়ালের ভেতর দিয়ে

অন্ধকারাচ্ছন্ন টানেল পার হয়ে সবাই প্রাকৃতিক আলফা স্টেশনে পৌছায়। পুরো জায়গাটিই গা ছমছমে অদ্ভুত এক শিহরণে ভরা। দেয়ালে রয়েছে অসংখ্য ফার্ন আর লতাপাতা। ওপর থেকে ঝুলছে গাছের শেকড় আর ঝুরি। বছরের বারো মাসই এখানে শীত অনুভূত হয়। এখানে কেউ পাথরের ওপর বসে, কেউ দাঁড়িয়ে দু’মিনিটের চমৎকার একটি মেডিটেশন করে।

চিচিং ফাঁকের পর পরবর্তী আকর্ষণ ছিলো রোপ ক্লাইমিং। তরুণরা এসময় মোটা রশি ধরে পাহাড়ে ওঠানামা করতে করতে যেন হিমালয় অভিযাত্রী হওয়ার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা চালিয়ে গেল। দুপুরের খাবারের পর ছিলো ফ্রি টাইম। তখন যে যার মতো ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ‘জেন মঞ্চ’ তখন ফাঁকা পাওয়াই যাচ্ছিলো না। অনেকে আবার ‘প্রশান্ত’ মঞ্চে উঠে এক নজরে পুরো সেন্টার দেখার সুযোগ হারাতে চাইছিলেন না। ধ্যানঘরে বসে অনেকেই তখন গভীর ধ্যানে মগ্ন। ধ্যানঘরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত চিরযৌবনা

বার্নার কলকল ধ্বনির মিষ্টি প্রাণোচ্ছল হাসি মুহূর্তেই গভীর ধ্যানে পৌছে দিচ্ছিলো। নবনির্মিত ধ্যানঘরের প্রশস্ত বারান্দায় ফুরফুরে হাওয়ায় দাঁড়িয়ে অনেকেই প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করছিলেন। বারান্দার পাশেই রয়েছে শিউলি, বকুল, জবা আর নিমের গাছ। তাতে মাঝে মাঝে দু’একটা মুনিয়া পাখি এ ডাল থেকে ও ডালে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ায়। হৃদয় এখানে সত্যিই হারিয়ে যায়।

সন্ধ্যায় চা-বিস্কিটের পর সবাই শিশুকানন পরিদর্শনে যান। এ সময় শিশুকানন বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়। খাবারের পর একটি ছোট্ট ঘুম দিয়ে রাত ১১টা থেকে শুরু হয় নৈশায়ন। এবারের ধ্যান উৎসবে এটি ছিলো অন্যতম ব্যতিক্রমী আয়োজন। আগের দু’বার সারাদিনব্যাপী মৌন সাধনার সুযোগ থাকলেও এবারই প্রথম রাত জেগে মৌন সাধনার সুযোগ হয়। রাত ১টা পর্যন্ত ধ্যানঘরে নৈশায়নের পর সবাইকে নিজ নিজ হিল স্টেশনে বা উন্মুক্ত প্রান্তরে নৈশায়নের অনুমতি দেয়া হয়।

গুরুজী বলেন, এবারের ধ্যান উৎসবের



সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হচ্ছে প্রবহমান বার্নাধারা ওপর নির্মিত এই নতুন ধ্যানঘর। স্বর্ণের পাদদেশ দিয়ে যেভাবে বার্নাধারা প্রবাহিত হওয়ার কথা বলা হয়েছে, এই ধ্যানঘর এবং পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া বার্না যেন মর্ত্যে তারই ক্ষুদ্র সংস্করণ। পৃথিবীতে যতগুলো ধ্যান কেন্দ্র রয়েছে তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকের পাদদেশ দিয়ে বার্না প্রবাহিত। এ হচ্ছে প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ সঙ্গীত। এমন পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্রষ্টার কাছে নত হয়ে যেতে হয়। এ উদ্দেশ্যেই পাহাড়ে আসা। যুগে যুগে সাধকরা এমন পরিবেশে এসেছেন আত্মউপলব্ধির জন্যে। খুঁজে পেয়েছেন মুক্তির পথ।

গুরুজী যখন ধীরে ধীরে জাব্লে রহমের ওপর দিয়ে অগ্রসর হওয়ার কথা বলছিলেন তখন অনুভূতিগুলোও ধীরে ধীরে হৃদয় ছুঁয়ে যাচ্ছিলো। ধ্যানঘর থেকে বেরিয়ে ধীর



জাব্লে শামসের পথে ধ্যানযাত্রীরা

সারির ভেতর দিয়ে ধ্যানঘরে প্রবেশ করে হৃদয় প্রশান্ত করা চমৎকার এক মেডিটেশন দিয়ে শেষ হয় নৈশায়ন। হালকা কুয়াশার ঘোমটা সরিয়ে সূর্য তখন পাহাড়ের কোণে উঁকি দিচ্ছে। মজাদার ভাপা পিঠা খেতে খেতে পাহাড়ে চড়তে তখন চমৎকার লাগছিলো।

সকালের আহার পর্ব শেষ করে সবাই গুরু করেন ফেরত যাত্রার প্রস্তুতি। ব্যাগ গুছিয়ে একে একে আসতে থাকেন দরবার হলে। এ সময় শিশুকাননের শিশুদের তৈরি হস্তশিল্পসামগ্রী ক্রয় করতে ও গুরুজী, মা-জীর সাথে ক্রোজ ছবি তুলতে বেশ ভীড় লক্ষ্য করা গেল।

মূলত প্রকৃতির মাঝে আত্মনিমগ্ন হওয়া, আত্মউপলব্ধি করা ও নিখাদ কলুষমুক্ত বিনোদনই ছিলো ধ্যান উৎসবের লক্ষ্য। এত আনন্দের পরও ফিরে আসার সময় হৃদয়ের কোণে কেমন যেন একটা কষ্ট অনুভূত হচ্ছিলো। এ কষ্ট ছিলো আনন্দের কষ্ট। এ কষ্ট ছিলো মনের বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার কষ্ট। কারণ লামা হচ্ছে কোয়ান্টাম পরিবারের মনের বাড়ি।

সমাপনী বক্তব্যে গুরুজী স্মরণ করিয়ে দেন শিশুকাননের সেইসব কোমল শিশুদের কথা যারা আমাদের প্রতীক্ষায় থাকে। আমরা অর্থ দিলেই তারা লেখাপড়া করবে, আমরা খাবার পাঠালেই তারা খাবে। না পাঠালে না খেয়ে থাকবে কিন্তু কোনো অভিযোগ করবে না। এ যেন হাজারো শিশুর হৃদয়ের কথা। যারা কখনও অভিযোগ করে না। তাদের হৃদয়ের অভিজ্ঞি আমরা কি অনুভব করতে পারি? আমাদের একটু সহযোগিতার ফলে একদিন এইসব শিশুই সৃষ্টি করবে এক নতুন ইতিহাস, সৃষ্টি করবে এক নতুন পৃথিবী। আমরা সেই নতুন পৃথিবীর অপেক্ষায়।

প্রতিবেদক : শফিক কামাল

রশি ধরে পাহাড়ে উঠছেন কয়েকজন



অনুভূতি অনুভবে ধ্যান উৎসব ২০০৪

অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতা

ধ্যান উৎসব ২০০৪-এ এবার ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও সিলেটসহ সারাদেশ থেকে দুই শতাধিক ধ্যানযাত্রী অংশগ্রহণ করেন। গ্রাজুয়েট-মেহমান নির্বিশেষে এ দলে অনূর্ধ্ব ১০ বছরের শিশু-কিশোররা যেমন ছিলো, তেমনি ছিলেন ষাটোর্ধ্ব প্রবীণ-প্রবীণারা। তবে তরুণ বয়সীরা ছিলেন সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি। এবারের ধ্যানযাত্রীদের অধিকাংশই প্রথমবারের মতো লামায় গিয়েছিলেন। ধ্যান উৎসবে অংশ নিয়ে নানা বিচিত্র ও বর্ণাঢ্য অভিজ্ঞতার ঝুলি তারা মেলে দিয়েছেন এখানে।

চাকরিজীবী মোহাম্মদ মতিউর রহমান বা শিক্ষার্থী মালিহা নাগিসের মতো যারা এর আগে ঢাকার বাইরে খুব দূরে কোথাও যান নি, তাদের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামের লামায় দীর্ঘ এ ধ্যানযাত্রাই জীবনের প্রথম দীর্ঘতম একটি ভ্রমণ। কিন্তু যাত্রা পথের ক্লান্তি বা বাক্তি তাদেরকে কাবু তো করতে পারেই নি বরং আনন্দ দিয়েছে। যেমন মালিহা বলেন, আমিরাবাদ থেকে লামা মেডিটেশন রিসর্ট পর্যন্ত যেতে চাঁদের গাড়ি নামে যে জিপগুলোতে আমরা চড়লাম, আমি তার নাম দিয়েছিলাম আনন্দের গাড়ি। ধুলোর ধোঁয়া উড়িয়ে নাচতে নাচতে ছুটে চলা এই গাড়িতে করে আমরাও হাসতে হাসতে এসে পৌঁছলাম লামায়।

অবশ্য এই ধুলোর আদরমাখা পরশ পেয়ে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন শাহরিয়ার জামান সুমন, মাত্র সম্প্ন হওয়া ১৭৩ ব্যাচে কোর্স করেই যিনি লামায় যাওয়ার জন্যে নাম দিয়েছিলেন। তার ভাষায়– “সারা রাত বাস জার্নি করে ঘুম ঘুম চোখে চাঁদের গাড়িতে ওঠার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ঘুম উধাও। কারণ গাড়ির অদ্ভুতরকম এঁকেবঁকে চলার ছন্দে এবং ধুলো-বালির অপূর্ব আচ্ছাদনে আমি সম্পূর্ণ দিশেহারা। লামায় পৌঁছেও আমার চমকপ্রদ কিছু মনে হলো না। কিন্তু তখনও বুঝতে পারি নি মহান স্রষ্টার কী অপার বিস্ময় অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।

সুমনের মতো অনেকেই যখন এরকম ক্লান্ত, বিরক্ত, গা এলিয়ে শুয়ে পড়বেন কি-না ভাবছেন, ঠিক



হিল স্টেশন সিগমা নির্ধারিত ছিলো মহিলাদের জন্যে

তখনই ছেলেদের এবং মেয়েদের আলাদাভাবে বার্নায় গোসলের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়। এই অভিজ্ঞতার কথাই বলছেন ঢাকার গ্রাজুয়েট প্রকৌশলী সামিনা মুস্তারীন এবং গৃহিণী আসমা আক্তার বানু। সামিনা বলেন, বার্নায় সবাই মিলে লাফালাফি করায় পানি কিছুটা কাদা মেশানো ঘোলাটে হয়ে গেল। তখন ভাবছিলাম, এই পানিতে গোসল! কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল এক মেডিটেশনে গুরুজী বলেছিলেন, বার্নার কাদা গায়ে মাখার জন্যে; এতে ত্বক ভালো হয়। পরে গোসল সেরে ওঠার পর সারা রাতের ভ্রমণের ক্লান্তি ভোজবাজির মতো উধাও হয়ে গেল। এত সতেজ লাগছিলো যে, মনে হচ্ছিলো পুরো এলাকাটা ঘুরে আসতে পারবো এখন।

গৃহিণী আসমা আক্তার বানু বলেন, বার্না দেখে আমি আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলাম। পানিতে নেমে দেখলাম উপরে প্রচণ্ড কড়া রৌদ্র তাপ অথচ বার্নার পানি একেবারে বরফ গলা ঠাণ্ডা পানির মতো। এত ভালো লেগেছে যে, মনে হচ্ছে এই বার্নার পানির আমেজ এখনও আমার সারা গায়ে লেগে আছে।

লামায় পৌঁছার পর সকালের নাস্তা খেয়ে ধ্যানযাত্রীরা চলে যান প্যারেড গ্রাউন্ডে শিশুদের প্যারেড ও ডিসপ্লে দেখতে। শিশুদের নিখুঁত প্যারেড ও ডিসপ্লে প্রদর্শনী দেখে মুগ্ধ হয়েছেন সবাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শ্যামল কৃষ্ণ সরকার বলেন, ছাত্র জীবনে বিএনসিসি করবার সময় এই প্রশিক্ষণগুলো আমরা নিতাম। কঠিন এই পরিবেশনাগুলোই যখন চমৎকারভাবে সেই শিশুদের করতে দেখলাম– যারা এই কিছুদিন আগেও জুতো পরতে পারতো না, বনে-বাদাড়ে পোকা ধরে বেড়াতো– তখন আমার বিস্ময়বোধের কোনো সীমা রইলো না। উপযুক্ত প্রশিক্ষণ আর সুযোগ পেলে এরাই যে হয়ে উঠবে ২০২৫ সালের কর্ণধার, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই।

সিঙ্গাপুর এয়ার লাইসে কর্মরত ইশরাত জাহান রিমিও শিশুদের প্রসঙ্গে বললেন, লামায় আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছে শিশুকাননের শিশুদের। তাদেরকে এত সুশৃঙ্খল এবং বৈজ্ঞানিক খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমি একটি শিশুর সোল সিস্টার হয়েছি।

সিলেটের আদনান মোহাম্মদ স্কুল পড়ুয়া এক কিশোর। লামার শিশুদের সঙ্গে এক বিকেলে ফুটবল খেলতে গিয়ে ও অবাক। “খেলার মধ্যেও যখন দেখলাম ওরা কেউ নিয়ম ভাঙছে না, ক্যাপ্টেনকে পুরোপুরি অনুসরণ করছে, তখন বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছি”, আদনানের



(ওপরে) ধ্যান ঘরে প্রথম যৌথ মেডিটেশনে মগ্ন ধ্যানযাত্রীরা (নিচে) ‘জাবলে শামসে’ সূর্যমুখী মেডিটেশনে বিবেক মঞ্চে মহিলাদের একাংশ

বক্তব্য।

এবারের ধ্যান উৎসবের মূল আকর্ষণ ছিলো নতুন ধ্যানঘর উদ্বোধন। ঢাকার আইডিয়াল স্কুলের ছাত্র নূরুল মুক্তাদীর বাপ্পী এর আগে তিনবার লামায় গিয়েছিলো। কাজেই পুরানো ধ্যানঘরে মেডিটেশন করার সুযোগ তার হয়েছিলো। বাপ্পী জানালো তার তুলনামূলক উপলব্ধির কথা– “এবার নতুন ধ্যানঘরে মেডিটেশন করে স্পষ্টতই পেলাম এক ভিন্ন অনুভূতি। এক পড়ন্ত বিকেলে ধ্যানঘরের বারান্দায় বসে রোদ বাতাস বার্না আর পাখির ডাক– ধ্যানঘর প্রকৃতির অবিচ্ছেদ্য এই আবহে মেডিটেশন করে আমি যে অপার্থিব অনুভূতি পেয়েছি তা আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম অনুভূতিগুলোর একটি।”

এবার জাবলে শামসে যাওয়া হয়েছিলো দ্বিতীয় দিন ভোরবেলা। উঁচু পাহাড়ের পথে ভোরের নরম আলোয় শিশির ভেজা পথে যাত্রা যে কত আরামদায়ক হতে পারে তা উপলব্ধি করেছেন রাজশাহীর গ্রাজুয়েট গৃহিণী রেহানা খাতুন। এতটা পার্বত্য পথ পাড়ি দেয়ার ঝুঁকিকে সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করে তিনি যখন সত্যি সত্যি তা পারলেন, পরম করুণাময়ের কাছে তখন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা ছিলো না।

জাবলে শামসে যাত্রাপথে গুরুজীর নেতৃত্বে দুই শতাধিক নারী-পুরুষ যখন এক সারিতে পাহাড় বেয়ে নামছিলো বা উঠছিলো– তখন সেই দুর্লভ দৃশ্যগুলো ক্যামেরাবন্দি করতে ব্যস্ত ছিলেন সিলেটের গ্রাজুয়েট ফটোগ্রাফার আবদুল মোনায়েম। তার ভাষায়– এতগুলো মানুষকে নিয়ে পাহাড়ি পথের এই যাত্রা– এরকম দৃশ্য ক্যামেরায় ধরে রাখার সুযোগ নিঃসন্দেহে বিরল।

জাবলে শামসে পৌছার পর গুরুজী সবাইকে



প্রাকৃতিক বার্নার উৎসমুখে পাথরখণ্ডের ওপর বসে মেডিটেশনে মগ্ন ধ্যানীরা

সূর্যের দিকে মুখ করে বসে যেতে বললেন। আপাতদৃষ্টে অসম্ভব, অসহ্য একটি ব্যাপার। কিন্তু মেডিটেশনে চোখ বন্ধ করেই সবাই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সাদমানি শারমিন বনি এই অভূতপূর্ব অনুভূতিকে ব্যক্ত করেছেন এভাবে– রোদটা পড়ছে একদম আমার মুখের ওপর, কিন্তু একে আড়াল করার কোনো ইচ্ছে আমার হলো না, বরং কিছুক্ষণ পরই অদ্ভুত এক শীতল অনুভূতিতে ভরে গেল হৃদয়, কৃতজ্ঞতায় চোখ বেয়ে পড়তে লাগলো জলের ধারা। সত্যিই অনির্বচনীয় এ অনুভূতি।

এবার ধ্যান উৎসবের আরেকটি ব্যতিক্রমী পর্ব ছিলো নৈশায়ন। বিশেষ করে মহিলাদের জন্যে এই অভিজ্ঞতা ছিলো স্মরণীয়। কারণ রাতের একটা

লামায় বঞ্চিত জনপদে সেবা কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে লামা মেডিটেশন রিসর্টে আয়োজিত হচ্ছে নানা সেবামূলক কার্যক্রম। আত্মিক উন্নয়নের অনুশীলন আর কোয়ান্টাম শিশুকাননের পাশাপাশি এসব সেবামূলক কার্যক্রম লামাকে পরিণত করেছে অনন্য সেবা কেন্দ্রে।

চিকিৎসা সেবা

২০০০ সালে কোয়ান্টাম চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র, লামার পরিচালক ডা. মনিরুজ্জামানের ৫০ দিনের সাধারণ রোগের চিকিৎসা শিবিরের মধ্য দিয়ে লামা কেন্দ্রে চিকিৎসা সেবা শুরু হয়। প্রতি বছর বিভিন্ন



লামার সেবা কেন্দ্রে সেবা দিচ্ছেন সিস্টাররা।

অংশে তারা পাহাড়ে অবস্থান করে অবলোকন করেছেন রাতের সৌন্দর্য। রাজশাহীর গ্রাজুয়েট চম্পা সমাদ্দার বলেন– রাত দু’টোর সময় ঘরের বাইরে খোলা পাহাড়ে দাঁড়িয়ে আছেন কোনো মহিলা অথচ কোনো নিরাপত্তার ভয় তার মনে নেই, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এরকম অসম্ভব একটি অভিজ্ঞতার প্রতীক্ষ অংশীদার হতে পারায় নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে হলো।

ধ্যান উৎসবে অংশগ্রহণকারী মহিলারা জীবনে এই প্রথমবারের মতো সত্যিকার স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছিলেন। গৃহিণী ফিরোজা আলম– সারা বছরই যাকে সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়– তিনি যেন এই তিনটি দিনকে একান্তভাবেই নিজের করে পেলেন। তার উপলব্ধি– “পরিবারের সদস্যদের বাইরে সংস্বেষের সদস্যদের সঙ্গেও যে এত নিরাপদ, নিশ্চিত ভ্রমণ করা যায়, আমার অভিজ্ঞতায় এটা প্রথম।”

লামাতে অবকাঠামোগত পরিবর্তনের অবিস্বাস্য গতি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন চট্টগ্রামের গ্রাজুয়েট ফিরোজ আশরাফ। দু’বছর আগে তিনি লামায় এসেছিলেন। ইতোমধ্যে এখানে নির্মিত যে নতুন স্থাপনাগুলো– টয়লেট ব্যবস্থা, শিশুকানন হল, জেনারেটরের আলো বা বৃক্ষশোভিত লামা– এ সবই তাকে মুগ্ধ করেছে।

“এরকম দুর্গম এলাকায় ধ্যান উৎসবের মতো

বয়সী পাহাড়ি-বাঙালিদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং ওষুধ বিতরণ করা হয়। সাধারণ রোগের চিকিৎসা শিবিরের পাশাপাশি এখন নিয়মিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের নেতৃত্বে চক্ষু চিকিৎসা শিবির, দন্ত চিকিৎসা শিবির ও শিশুরোগ চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে বিশেষ ব্যবস্থা

বর্ষাকালে পাহাড়ি এলাকায় ম্যালেরিয়া মহামারী রূপ ধারণ করে। তাই প্রতি বর্ষায় এখানে ৪০ দিনব্যাপী বিশেষ ম্যালেরিয়া রোগ প্রতিরোধ কার্যক্রম চলে। এতে ম্যালেরিয়া চিকিৎসা সহ তাৎক্ষণিকভাবে ম্যালেরিয়া নির্ণয় ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এছাড়া ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ও নির্মূলের উদ্দেশ্যে সতর্কতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হচ্ছে।

টিউবওয়েল স্থাপন

বিশুদ্ধ পানি পান করার সুযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০টি টিউবওয়েল দুর্গম এলাকায় স্থাপন করা হয়েছে। অধিকাংশ টিউবওয়েলই এখন বার্নায় পরিণত হয়েছে।

বনায়ন কার্যক্রম

ক্রমাগত বনায়নের ফলে রক্ষ, উষ্ণ লামা এখন পরিণত হয়েছে শীতল, সবুজে সুশোভিত। গত পাঁচ বছরে প্রায় ৩২ একর জমিতে বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ ও ওষধি গুণসম্পন্ন গাছ লাগানো হয়। এখানে রয়েছে নিমস্কারার, পেয়ারা বাগান আর বাউ বন। ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের একটি প্রাকৃতিক কার্যকর উপায় হিসেবে এ পর্যন্ত প্রায় ৪০ হাজার নিমের চারা সহ অন্যান্য গাছের চারা স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। বৃক্ষ রোপণের সুবিধার জন্যে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে গাছের চারা সংগ্রহের

ব্যাপক আয়োজনের প্রতিটি খুঁটিনাটির দিকে যেভাবে খেয়াল করা হয়েছে, তার ফলেই সম্ভব হয়েছে এতগুলো ধ্যানযাত্রীর এরকম স্বচ্ছন্দ উৎসব উপভোগ”– বললেন ডা. আরমেদ মর্ত্তজা চৌধুরী। তিনি সপরিবারে এ উৎসবে অংশ নিয়েছিলেন। “বিশেষ করে খাবারের আইটেমগুলো এত সুস্বাদু ছিলো যে, প্রতিবেলা খাওয়ার পর আমি অপেক্ষায় থাকতাম কখন আবার খাওয়ার সময় হবে”, বলেন ব্যবসায়ী মো. জামাল উদ্দীন।

আবদুল্লাহ সালমান, শামসুল আরিফ বা মাহমুদুল হকের মতো কিশোর-তরুণদের কাছে এবারের ধ্যান উৎসব স্মরণীয় হয়ে থাকবে রোপ ক্লাইমিং বা চিচিং ফাঁক ভ্রমণের মতো এডভেঞ্চারাস অভিজ্ঞতার জন্যে।

বেশ ক’জন মেহমান এবারে ধ্যানযাত্রায় শরীক হয়েছিলেন তাদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। মায়ের সাথে তন্ময় আহমেদ বা স্বামীর সাথে আগত সদ্য বিবাহিতা উর্মি সুলতানা– দু’জন প্রায় একই ভাষায় বললেন– এখানে এসে মনেই হচ্ছে না যে আমরা আলাদা কেউ। বরং সবাই আমাদেরকে তাদেরই একজন হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

সবশেষে ফেরার পালা। এ ব্যাপারে ঢাকার তাসলিমা নাছরীন কিংবা রাজশাহীর মল্লিকা সরকার বা সিলেটের আজিজুর রহমান খান– সবার অনুভূতিই প্রায় এক। যা প্রকৌশলী সামিনা মুস্তারীন খুব সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন, “এখনো প্রতি মুহূর্তে যেন লামাকে অনুভব করি। বারবার মন ছুটে যায় সেখানে। লামায় যে প্রশান্তির সন্ধান পেয়েছি তা কখনোই ভুলে যাওয়ার নয়। তাই লামায় আমাকে যেতেই হবে, কারণ সেটাই আমার মনের বাড়ি।”

প্রতিবেদক : ফেরদৌসী সুলতানা



নিজস্ব নার্সারীতে উৎপাদিত গাছের চারা

পাশাপাশি কোয়ান্টাম মেডিটেশন রিসর্ট নিজস্ব নার্সারীতে বিভিন্ন প্রজাতির চারা তৈরি করছে।

ফাতেহা ও দোয়া মাহফিল, কোরবানী

এলাকার সার্বিক উন্নয়ন এবং অসুস্থ ও সমস্যাগ্রস্তদের জন্যে প্রার্থনা করে মেডিটেশন রিসর্টে প্রতি মাসে অনুষ্ঠিত হয় ফাতেহা ও দোয়া মাহফিল। মাহফিলের পর থাকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা যার প্রতীক্ষায় উৎসুক হয়ে থাকে দুঃস্থ অংশগ্রহণকারীরা। কারণ তাদের অনেকেই ঐ একদিনই মাংস খাওয়ার সুযোগ পায়।

এছাড়া প্রতি বছর ঈদুল আযহায় সদস্যদের অংশগ্রহণে নিয়মিত কোরবানী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ বছর কোরবানীর ঈদে ৫০০ পরিবারকে এক কেজি করে মাংস দেয়া হয়।

এভাবেই সেবার অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে লামা মেডিটেশন রিসর্ট। আর এ বিশাল কার্যক্রম চলছে সবার সম্মিলিত অনুদানে। বঞ্চিত জনপদ পাচ্ছে মানবিক সেবা।

প্রতিবেদক : সুমন ধর

শিশুকাননের শিশুরা

শিশু বলতেই আমাদের চোখে ভাসে মায়ের কোলে চড়ে ঘুরে বেড়ায় যে বাচ্চাটা, যাকে গোসল করিয়ে দিতে হয়, ভাত খাইয়ে দিতে হয়, বুকে জড়িয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে হয়। নরম তুলতুলে গাল, আধো আধো কথা, প্রাণ জুড়ানো হাসি- এরকম শিশুরাই লামা শিশুকাননের শিশু।

গত বছর অক্টোবরের শেষ দিকে অর্থাৎ ডিসপ্লে প্রতিযোগিতার আগে যখন এক মাসের কম সময় হাতে আছে, তখন থেকে আমি এ কাজে জড়িত হতে পেরেছিলাম। ডিসপ্লে জেনে আমরা বেছে নিলাম ‘প্রজাপতি প্রজাপতি কোথায় পেলো ভাই এমন রঙীন পাখা’- এই গানটি, যার সঙ্গে খাপ খাইয়ে আমরা তৈরি করলাম ডিসপ্লে নাচের একটি কাঠামো।

প্রথম যে দিন রিহার্সেলের মাঠে এই শিশুদের সাথে আমার দেখা সেদিন আমি ভাবছিলাম- এদের কোনো কিছু শেখানো কি আমার পক্ষে সম্ভব হবে? ভাবছিলাম- ঠিক আছে, কোনো রকমে কিছু একটা করিয়ে দেবো, এতেই যথেষ্ট হবে এদের জন্যে।

কিন্তু যেই তাদের নিয়ে কাজ শুরু করলাম, তাদের প্রতি আমার উৎসাহ বাড়তে লাগলো। এত ছোট শিশুদের আমি যা করতে বলছি, যে ভাবে করতে বলছি তা-ই করে ফেলছে। আমার কাছে এখনও বিস্ময় হয়ে আছে সেই মুহূর্তটি, রিহার্সেলের প্রথম দিন যখন মাত্র কয়েক বার বুঝিয়ে দেয়ার পর প্রায় ৪০ জন শিশু মিলে চেউ

অর্থাৎ ডিসপ্লে সবচেয়ে কঠিন অংশটি করে ফেললো এবং তখনই আমি বুঝতে পারলাম এই শিশুরা অসাধারণ শিশু, এমন শিক্ষার্থী পেলো প্রশিক্ষকের শেখানোর কাজটা খুব সহজ হয়ে যায়।

শুরু হলো নিয়মিত প্রশিক্ষণ। দুটো গ্রুপ মিলিয়ে মোট ৬৫/৭০ জন। ডিসেম্বর মাসের প্রচণ্ড শীত। ভোর ঠিক ৫.৪০ মিনিটে শিশুকাননে ঘুম থেকে ওঠার ঘণ্টা বাজে। আদর করে বা ডাকাডাকি করে কাউকে ঘুম থেকে ওঠাতে হয় না। একবার ঘণ্টা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তারা নিজেরাই ঘুম থেকে ওঠে। ছোট ছোট হাত দিয়ে বিছানা গোছায়। হাত-মুখ ধোয়, জুতো-মোজা, গরম কাপড় পরে তৈরি হয়ে সূর্য মামা ওঠার আগেই অন্ধকারে লাইন করে তারা মাঠে চলে আসে। এত শীতের মধ্যেও যেন শেখার প্রতি তাদের উৎসাহের কোনো কমতি নেই। যা করতে বলছি নির্দিষ্ট করে যাচ্ছে, পারবো না বা পারি না বলে কোনো কথা নেই তাদের কাছে।

রোদ ওঠা পর্যন্ত মাঠে রিহার্সেল, তারপর ৮টায় সকালের খাবার, ১০ মিনিট ব্রান্সন করার পর আবারো শুরু হয়েছে রিহার্সেল বেলা ১১টা পর্যন্ত। ১১টা থেকে গোসল, খাওয়া। বিকালে ৩টায় নাস্তার পর আবার মাঠে রিহার্সেল। রাতে খাবার খেয়ে রাত ৯টা থেকে ৯.৩০ পর্যন্ত রিহার্সেল। অর্থাৎ রুটিন মাফিক প্রতিটি কাজ।

এতগুলো ছেলে, কিন্তু সারাদিনের এই রুটিনে তাদের এক জনকেও দেখলাম না ভুল করতে বা অনিহা প্রকাশ করতে। ঠিক সময় গোসল, খাওয়া, ঘুম, রিহার্সেল- সব যেন ঘড়ির কাঁটার সাথে চলছে এবং মনেও হচ্ছে না যে কত কঠিন নিয়ম তারা



প্রজাপতি প্রজাপতি গানের তালে তালে নাচছে শিশুরা ।

মেনে চলছে।

তাদের মধ্যে শিশুসুলভ আচরণও ছিলো যা আমাকে খুব আনন্দ দিতো। তবে তারা সে আচরণ করতো রিহার্সেলের বাইরে। যেমন- জড়িয়ে ধরে আবদার করতো, আপু গল্প শোনাও। কখনও ক্যাসেটে গান শুনতে চাইতো আবার কখনও বা কাঁকড়া দিয়ে আমাকে ভয় দেখাতো। তাদের সঙ্গে কাটানো প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি সময় আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময়।

প্রতিবেদক : ফেরদৌসি জামান প্রতিভা

[প্রো-কোয়ান্টার ফেরদৌসি জামান প্রতিভার তত্ত্বাবধানে শিশুকাননের শিশুরা ডিসপ্লে শিখে প্রতিযোগিতায় অর্জন করে বিশেষ সাফল্য।]

এক নজরে কোয়ান্টাম শিশুকানন কার্যক্রম



মা-জীর সাথে শিশুকানন স্কুলের ছাত্ররা

অন্যান্য মানুষ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে অবহেলিত, দুর্গম পাহাড়ি এলাকার শিক্ষা সুবিধা বঞ্চিত, দুঃস্থ অসহায় শিশুদের মেধা ও দক্ষতা বিকাশের প্রচেষ্টায় নিবেদিত কোয়ান্টাম শিশুকানন। ২০০০ সালে মাত্র ৭টি শিশু নিয়ে এর আবাসিক কার্যক্রম শুরু হলো মাত্র চার বছর পর এখন এর ছাত্র সংখ্যা ১২০ জন। শিশুদের মধ্যে বাঙালি ছাড়াও রয়েছে মুরং, মারমা, ত্রিপুরা, বম ও তঞ্চঙ্গ্যা উপজাতির শিশু।

উন্নয়ন কাজ

শিশুকাননে এখন মোট তিনটি আবাসিক হল ও গত বছর নির্মিত ২৭ ফুট X ১১০ ফুট মাপের বিশাল কমন রুম ছাড়াও সম্প্রতি শিশুকানন স্কুলের পাশে আগের নার্সারীর জায়গায় গড়ে উঠেছে বেশ ক’টি নতুন টিনের ঘর। তৈরি হয়েছে এক সঙ্গে ১৬টি টয়লেট। বায়োগ্যাস প্ল্যান্টের আলো ছাড়াও সন্ধ্যা হতেই এখন জেনারেটরের আলোয় ঝলমলিয়ে ওঠে শিশুকাননসহ পুরো এলাকা।

ছাত্র শিক্ষক সংখ্যা

শিশুকানন স্কুলের ছাত্র সংখ্যা আবাসিক-অনাবাসিক মিলিয়ে ১৬১ জন এবং শিক্ষক ৮ জন। স্কুলে বর্তমান ক্লাস সংখ্যা ৯টি, প্লে থেকে ক্লাস সেভেন পর্যন্ত।

পরিচালনা প্রক্রিয়া

শিশুকাননের কার্যক্রম সৃষ্টভাবে পরিচালনার জন্যে রয়েছে একটি পরিচালনা কমিটি। এদের সুচিন্তিত পরামর্শ ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে শিশুকাননের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। পরিচালনা কমিটির উপদেষ্টা জনাব মুজিবুর রহমান, সভাপতি বাবু তিনকড়ি চক্রবর্তী, সহসভাপতি ডা. কামাল উদ্দিন আহমেদ ও বাবু প্রদীপ কুমার।

ভর্তি প্রক্রিয়া

শিশুকাননে আবাসিক ছাত্র ভর্তি নেয়ার জন্যে প্রতি বছরই অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভর্তি পরীক্ষা। অভিজ্ঞ একটি টিম মৌখিক, লিখিত ও ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র নির্বাচন করেন। চলতি সেশনে আড়াই শতাধিক ভর্তিচ্ছু শিশুর মধ্য থেকে ৪০ জনকে নেয়া হয়।

ছাত্রদের যথাযথ মেধার বিকাশের জন্যে মূল পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি নেয়া হয়েছে নানা কর্মসূচি। এর মধ্যে রয়েছে নিয়মিতভাবে দেয়ালিকা প্রকাশ, সপ্তাহে দু’দিন সাংস্কৃতিক শিক্ষা ক্লাস এবং প্রতি দিন শারীরিক শিক্ষা, এসেম্বলী ও কোয়ান্টাম ব্যায়াম। নতুন ভর্তিকৃত ছাত্রদের ভাষা-সমস্যা দূর করার জন্যে রয়েছে কম্যুনিকেশন বাংলা শিক্ষা কোর্স।



খাওয়ার আগে প্রার্থনা করছে শিশুকাননের শিশুরা

প্রতি বছর সংগ্রহ বাড়ছে গড়ে ৩ গুণ বেশি হারে



মাটির ব্যাংক থেকে প্রতি বছর সংগ্রহ বাড়ছে গড়ে ৩ গুণ বেশি হারে আর ১ম বছরের তুলনায় ৬ষ্ঠ বছরে অর্থাৎ ২০০৩-০৪ সালে সংগ্রহ বেড়েছে ২০৪ গুণ বেশি। ১৮ হাজার থেকে সাড়ে ৩৮ লক্ষ।

বঞ্চিত মানুষের সেবা করার জন্যে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয় তার যোগান দেয়ার মতো একটি সহজ ও কার্যকর উপায় হিসেবে ফাউন্ডেশন ছ'বছর আগে হক্কুল ইবাদ মাটির ব্যাংক প্রচলন করে। প্রথম বছরের সংগ্রহ (১৮,৮০২ টাকা) তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও দ্বিতীয় বছরই তা ৪ গুণ বেড়ে হয় ৮১,৬৩৬ টাকা।

তৃতীয় বছর অর্থাৎ ২০০০-০১ সালে তা হয় ২,১১,২৬২ টাকা অর্থাৎ তিনগুণ। এর পরের দু'বছরই দ্বিগুণ হারে, অর্থাৎ ২০০১-০২ সালে ৭,৫৩,৬৬৮ টাকা এবং ২০০২-০৩ সালে ১৭,৩৮,৩৯৭ টাকা সংগৃহীত হয়। আর গত বছর অর্থাৎ ২০০৩-০৪ সালে সংগৃহীত হয় ৩৮,৪৯,৩৫৯ টাকা যা আগের বছরের ২ গুণ বেশি। অর্থাৎ গত ৬ বছরে সংগ্রহ বেড়েছে প্রতিবছর গড়ে ৩ গুণ বেশি হারে।

এই ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধিই প্রমাণ করে মাটির ব্যাংকে দানের ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ বাড়ছে। নিজেদের কল্যাণের পাশাপাশি বঞ্চিতের সেবায় ব্যয় করতে পারার এই সুযোগ পেয়ে তারা আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞ।

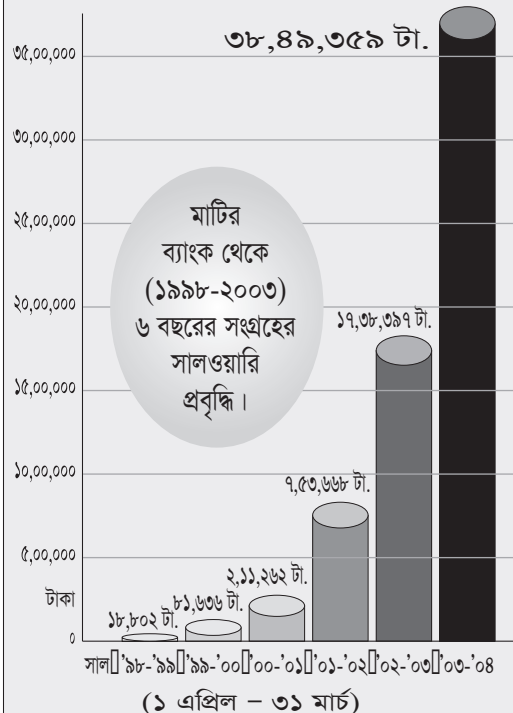
কোয়ান্টাম বুলেটিন

মাটির ব্যাংক সংখ্যা ◆ মে ২০০৪



প্রো-কোয়ান্টাররা মাটির ব্যাংক ভেঙে অর্থ সংগ্রহ করছেন

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মাটির ব্যাংক



গত বছরের সংগ্রহ ৩৮ লক্ষাধিক টাকা

ফাউন্ডেশনের মাটির ব্যাংক কার্যক্রম থেকে ২০০৩-০৪ সালে সংগৃহীত হয়েছে মোট ৩৮,৪৯,৩৫৯ টাকা। এর আগের বছর সংগ্রহ ছিলো ১৭,৩৮,৩৯৭ টাকা অর্থাৎ বেড়েছে ২১ লক্ষ টাকারও বেশি। পরম করণাময়ের অনুগ্রহে এ সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে অসংখ্য মানুষের সেবা ও দানের আন্তরিক নিয়ত।

টাকা সেন্টার থেকে সংগৃহীত হয় ২৯,২৪,১৭৯ টাকা, চট্টগ্রাম সেন্টার থেকে ৪,৯৭,২৮১ টাকা, সিলেট সেন্টার থেকে ৩,০৫,৮৪১ টাকা রাজশাহী সেন্টার থেকে ১,০৪,২৭৬ টাকা এবং লামা সেন্টার থেকে ১৭,৭৮২ টাকা।

এই উল্লেখযোগ্য সাফল্যের পেছনে রয়েছে দায়িত্বশীল প্রো-কোয়ান্টারদের সুসংগঠিত তৎপরতা। বিশেষ করে, বিভিন্ন সেন্টার ও শাখা/সেল পরিচালিত গ্রাজুয়েট সংযোগের সময় মাটির ব্যাংক কার্যক্রমকেও তারা এর অন্তর্ভুক্ত করেন। গ্রাজুয়েটদের বাসায় বাসায় মাটির ব্যাংক বিতরণ করা, ভরে যাওয়া ব্যাংকগুলো সংগ্রহ করা এবং তাদেরকে নতুন ব্যাংক প্রদান করা ছাড়াও মাটির ব্যাংকে দানের বেশ কিছু আকর্ষণীয় ধারণা সৃষ্টি-

ইত্যাদি পদক্ষেপগুলো এ উল্লেখযোগ্য সংগ্রহে বড় ভূমিকা রেখেছে।

বিভিন্ন শাখার সাধারণ গ্রাজুয়েট ও সহযোগীরাও ব্যাপক উৎসাহ এবং আগ্রহের সাথে মাটির ব্যাংকের এই বিপুল সংগ্রহে অংশ নেন। শুধু নিজেরা জমানোই নয়, নিজেদের আত্মীয়-বন্ধুদেরকেও তারা প্রচুর মাটির ব্যাংক বিতরণ করেছেন এবং দানের উপকারিতা সম্পর্কে বলেছেন।

ফলে নীরব দানের মাধ্যমে নিজেদের বিপদমুক্তি ও সাফল্য লাভ এবং একই সাথে অন্যের কল্যাণের উদ্দেশ্য নিয়ে শত শত মানুষ বছরে গড়ে তিনটি ব্যাংক জমা দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, নিয়ত পূরণ এবং সাফল্য লাভে মাটির ব্যাংকে দানের বিস্ময়কর কার্যকারিতা তাদের উৎসাহকে ক্রমাগতই বাড়িয়েছে। সেই সাথে এই সজ্জবদ্ধ সংগ্রহ দিয়ে সংগঠিত বড় দুস্থ পুনর্বাসন কাজে শরীক হওয়ার আনন্দ তো আছেই।

ভবিষ্যতেও তারা আরও বেশি মাটির ব্যাংক কার্যক্রমে অংশ নিতে ও অন্যদেরকে সম্পৃক্ত করার কাজে সক্রিয় হবেন বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

রাত দু'টো। মিসেস নাজমা হঠাৎ একটা গোষ্ঠানীর আওয়াজ পেয়ে ঘুম থেকে উঠে বসলেন। সাথে সাথেই চোখ পড়লো পাশে শুয়ে থাকা স্বামীর দিকে। স্বামী জনাব কামরান ডান হাতটা বুকে চেপে ধরে গোষ্ঠাচ্ছেন। বোঝা যাচ্ছে ব্যথার তীব্রতায় অবশ হয়ে আসছে তার সারা শরীর।

ভয়ংকর এ দৃশ্য দেখে মিসেস নাজমা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। বুঝতে পারছিলেন না কি করবেন। হাই রাড প্রেশারের রোগী স্বামীর শরীর নিয়ে উদ্বেগ ছিলো। কিন্তু তা যে কখনো এরকম রাত দুপুরে স্ট্রোকের উপসর্গে পরিণত হতে পারে সে কথা কল্পনাও করেন নি। বাড়িতে বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ নেই। এত রাতে ড্রাইভারকেও পাওয়া যাবে না। পাশের ফ্ল্যাটের ভাবীকে ডাকবেন না কি মায়ের কাছে ফোন করবেন এসব ভাবতে ভাবতে তিনি যখন অস্থির হয়ে ছুটোছুটি করছিলেন তখন হঠাৎ তার চোখ পড়লো বেড রুমের এক কোণায় ওয়ারড্রোবের উপরে রাখা নীল রঙের একটা মাটির ব্যাংকের উপর। পাশের বাসার ভাবী মাসখানেক আগে এ ব্যাংকটা দিয়ে বলেছিলেন, “ভাবী, আপনি তো প্রায়ই মাজারে মানত করেন। দরজায় কড়া নাড়া ভিক্ষুকদেরও কখনো ফিরিয়ে দেন না দেখেছি। কিন্তু কখনো ভেবে দেখেছেন, মাজারে যে টাকাটা আপনি দিলেন, তা কি কাজে খরচ হচ্ছে? আর ভিক্ষুককে খুচরো পাঁচ/দশ টাকা দিয়েও কি আসলে কোনো লাভ হচ্ছে? সে কি পরদিনই আবার একই বোলা নিয়ে আপনার কাছে হাত পাতেছে না?”

মিসেস নাজমা বললেন, তা অবশ্য ঠিক। কিন্তু এছাড়া আর কী করা যাবে ভাবী? আমার তো এর চেয়ে বেশি সাধ্য নেই। মিসেস ফরিদা তখন বলেছিলেন, “জি ভাবী, এর চেয়ে বেশি আপনাকে করতে হবেও না। এই যে, এই মাটির ব্যাংকটা দেখছেন, এরকম আরও হাজার হাজার ব্যাংকই নিয়েছেন আপনার-আমার মতো সীমিত সামর্থ্যের মানুষেরা। সীমিত আয়ের উপর বাড়তি কোনো চাপ না ফেলেই ধীরে ধীরে জমানো এই ব্যাংকের অর্থকে একত্র করে সম্ভব হচ্ছে এত বড় বড় কাজ যা গুনলে আপনি অবাক হবেন। আর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো- বিপদমুক্তি, রোগমুক্তি বা কোনো সাফল্য লাভে স্রষ্টার রহমত কামনা করে মাটির ব্যাংকে অর্থ রাখার মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন, এমন মানুষের সংখ্যা অনেক। এমন কি এটি এতই পরীক্ষিত একটি ব্যাপার যে, ঘটনাগুলো গুনলে আপনি বিশ্বাস না করে পারবেন না।”

হঠাৎ স্বামীর আবারও গোষ্ঠানীর শব্দে মিসেস নাজমার ভাবনায় ছেদ পড়লো। তৎক্ষণাৎ ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে পাঁচশ টাকার একটি নোট ফেললেন ব্যাংকে। গত এক মাসে বিভিন্ন সময় খুচরো দশ/বিশ টাকা যে ব্যাংকে ফেলেন নি তা নয়। কিন্তু আজ মাঝ রাত্রে যে ভয়ংকর বিপদের মুখোমুখি তিনি, তখন বঞ্চিত মানুষের সেবায় লাগবে এবং সে উসিলায় আল্লাহও নিশ্চয়ই বিপদমুক্তির পথ দেখাবেন- এ বিশ্বাসে টাকাটা তিনি বিনা দ্বিধায় ফেলে দিলেন মাটির ব্যাংকে।

ফোনের দায়াল ঘোরালেন মায়ের বাসায়। তখনই জনাব কামরান বলে উঠলেন, নাজমা আমাকে একটু পানি দাও। তাকালেন স্বামীর দিকে। ব্যাথাটা কি কমেছে একটু? জিজ্ঞেস করলেন। হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লেন জনাব কামরান।

মিনিট দশেক পরেই কলিংবেলের আওয়াজ শুনে দরজা খুলে দেখেন তার মা এবং প্রতিবেশী রুদ্ররোগ বিশেষজ্ঞ ডা. হাফিজ। মেয়ের ফোন পেয়ে ভ্রূলোককে ঘুম থেকে তুলে এনেছেন মিসেস নাজমার মা।

জনাব কামরানকে কিছুটা পরীক্ষা করেই ডা. হাফিজ হাসিমুখে বললেন, কিছু হয় নি ভাবী, একটু গ্যাস ফর্ম করেছে। রাতে নিশ্চয়ই ভারী খাওয়া হয়েছিলো?

সবার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। মিসেস নাজমা বললেন, “আর বলবেন না ভাই, রাতে ভারী খাওয়া ঠিক নয়, জেনেও উনি কাল এক বিয়ে বাড়িতে গিয়ে একগাদা খেয়েছেন সব তেল-চর্বিমাখা খাবার।

ডা. হাফিজ বললেন, “কামরান ভাই, একেবারেই ঠিক হয় নি। আপনি তো জানেন, হাই রাড প্রেশারের রোগীদের জন্যে রাতে ভূরিভোজ করা হলো স্ট্রোকের আদর্শ কারণ। আপনার কপাল ভালো যে, আজ বেঁচে গেলেন। নইলে এরকম ঝুঁকির পরিবেশ তৈরি করে স্ট্রোক না হওয়াটা খুবই বিরল ঘটনা।

মিসেস নাজমা সত্যি মনে মনে স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা পাচ্ছিলেন না। সমস্ত সত্যিই যদি আজ অন্যরকম কিছু হতো, তাহলে কত ভয়ংকর সব ঘটনা ঘটতো, সেসব দৃশ্য কল্পনা করে শিউরে উঠছিলেন তিনি। মাটির ব্যাংক প্রসঙ্গে পাশের বাসার ভাবীর কথাগুলো বারবার মনে পড়ছিলো তার। বঞ্চিত মানুষের সেবায় দানের মাধ্যমে তিনি যে স্রষ্টার কাছ থেকে তার স্বামীর সুস্থতাই চেয়ে নিলেন- এই দৃঢ় বিশ্বাস হলো তার।

মাটির ব্যাংককে ঘিরে এরকম হাজারও চমকপ্রদ ঘটনার মাত্র একটি এখানে বলা হলো। মাটির ব্যাংক কথাটি শুনেই আমাদের আধুনিক শহুরে মানুষদের চোখে হয়তো ভেসে ওঠে দারিদ্র্য পীড়িত একটি কুটির- যার অন্ধকার এক কোণে পড়ে আছে এমন একটি মাটির ব্যাংক, যাতে দুর্দিনের ভরসা হিসেবে একটু একটু করে জমা হয় গৃহকর্তার বহু কষ্টে উপার্জনের সামান্য একটু অংশ।

কিন্তু তারা বিস্মিত হবেন জেনে যে, এরকম ছোট ছোট মাটির ব্যাংকে জমা হওয়া সম্মিলিত অর্থের পরিমাণ এক বছরে হয়েছে সাড়ে ৩৮ লক্ষ টাকা। আর পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে এ সাফল্যের রূপকার কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। তবে তার প্রেক্ষাপট জানতে হলে আরেকটু গোড়া থেকে শুরু করতে হবে।

সৃষ্টির সেবা করার উদ্দেশ্যে যে বিভিন্ন প্রকল্প কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন নিয়েছে তার অর্থায়ন হবে ফাউন্ডেশনেরই সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে, কোনো বিদেশি সাহায্যে বা দাতা গোষ্ঠীর সৌজন্যে নয়- শুরু থেকে এটাই ছিলো ফাউন্ডেশনের আদর্শ। কিন্তু বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই মোটা অংকের অর্থ একসাথে দান করা সম্ভব হয় না আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও।

আবার পরিকল্পিত উদ্যোগের অভাবেও আমাদের দান অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপচয় হয়। হয় দানকে আমরা ভিক্ষায় রূপান্তরিত করি অথবা বড় কিছু করার কল্পনা করতে করতই সময় পার করে দিই। বড় কিছু আর করা হয় না।

আর এসব চিন্তা থেকেই যাত্রা শুরু মাটির ব্যাংকের। ধারণাটি হলো, প্রতিদিন ভিক্ষুককে যে দু/এক টাকা দান করি, সেই টাকা বা বাজার ফেরত খুচরো টাকা বা কোনো উদ্দেশ্য পূরণের পর মানতের টাকা অথবা কোনো আধ্যাত্মিক সাধকের নামে টাকা এই ব্যাংকে দান করা। এতে একসাথে তিনটি উপকার হচ্ছে।

প্রথমত, প্রতিদিন খুচরো টাকা জমাবার ফলে আর্থিক কোনো চাপ পড়ে না এবং ভিক্ষুককে বা অপ্রয়োজনীয় কাজে অর্থ দান নিরুৎসাহিত হয়। দ্বিতীয়ত, সম্মিলিত অর্থ একটা বড় অংকে পরিণত হয়ে বাস্তব এবং ফলপ্রসূ একটি প্রকল্পে সাহায্য করে এবং হক্কুল ইবাদে সমাজের সর্বস্তরের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে। তৃতীয়ত এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো, দানকারী এর মাধ্যমে শুধু পারলৌকিক পুণ্য অর্জনের সুযোগই পান না, দৈনন্দিন জীবনেও পান অনেক জটিল সমস্যার সহজ সমাধান এবং শারীরিক, মানসিকভাবে ভালো থাকার অনুভূতি, যা পরম করুণাময়ের অনুগ্রহেই সম্ভব।

মাটির ব্যাংকে অর্থদান এবং সাফল্য লাভের মধ্যকার যোগসূত্রটা খুবই সহজ। আসলে যখন একজন মানুষ সমস্যা বা বিপদে পড়ে মাটির ব্যাংকে নিয়ত করে তখন বিপদমুক্তির জন্যে স্রষ্টার কাছে তার প্রার্থনা একটি বাস্তব ভিত্তি পায়। সে তখন বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, বিপদ যত বড়ই হোক না কেন, পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে তার সমাধান হওয়া কোনো অসম্ভব কিছু নয়। একদিকে এই বিশ্বাস, অন্যদিকে আরেকজন বিপন্ন মানুষকে সাহায্য করার বিনিময়ে দান-প্রতিদানের প্রাকৃতিক সূত্রানুসারেই তার সমস্যা মুক্তি ঘটে। এজন্যে মাটির ব্যাংকে নিয়ত করাটা এত ফলপ্রসূ।

প্রশান্তি ও প্রাচুর্যের জন্যে দানের গুরুত্ব সম্পর্কে পৃথিবীর সকল ধর্মেও বলা হয়েছে। যেমন আল-কোরআনে আল্লাহ বলেন, “আমাকে কর্তে হাসানা বা উত্তম ঋণ (সৃষ্টির সেবায় দান) প্রদান কর। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের কল্যাণ করবো” (সূরা : মায়েরা, আয়াত : ১২)। অর্থাৎ আন্তরিক দান হচ্ছে সকল কল্যাণের নিশ্চয়তা। আল্লাহ আরো সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন, “যারা তাদের উপার্জন থেকে রাতে বা দিনে প্রকাশ্যে বা গোপনে দান করে তাদের জন্যে পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোনো ভয় বা পেরেশানী থাকবে না। (সূরা : বাক্বারা, আয়াত : ২৭৪)

ভগবত গীতায় নিঃস্বার্থ দানকে উৎসাহিত করে বলা হয়েছে, এটাই সাত্ত্বিক বা শ্রেষ্ঠ দান যা যথার্থ উপকারে লাগে। বুদ্ধাবাণী-খৃস্টাবাণীতেও নির্মোহ দানকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

অর্থাৎ এখানে মাটির ব্যাংকের সরাসরি প্রসঙ্গ না থাকলেও যখন বলা হচ্ছে দিনে রাতে, গোপনে ও প্রকাশ্যে দান এবং এর মাধ্যমে ভয় ও পেরেশানী মুক্তি, তখনই আমরা এর বাস্তব দিকগুলো দেখতে পাই।

গভীর রাতে স্বামী বা সন্তান হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে বা আপাতদৃষ্টে সমাধানের কোনো সহজ পথ নেই এমন গভীর বিপদে পতিত হলে যে ভয়, উদ্বেগ বা অস্থিরতা আমাদেরকে গ্রাস করে তা থেকে মুক্তি লাভের প্রার্থনা করে দানের সুযোগ আমরা তাৎক্ষণিকভাবে নিতে পারি এই মাটির ব্যাংকের মাধ্যমে। এর জন্যে আমাদের অন্য কোথাও যেতে হচ্ছে না বা দানের অর্থের সঞ্চয়বহার নিয়ে ভাবতে হচ্ছে না।

তাই পরম করুণাময়ের সন্তুষ্টির জন্যে দিনে বা রাতে- যে কোনো সময় প্রকাশ্যে বা গোপনে দান করার চমৎকার সুযোগ আপনি গ্রহণ করতে পারেন মাটির ব্যাংক-এর মাধ্যমে। এই সাদাকা বা মানত বা দান আপনাকে এক দিকে যেমন ভয় বিপদ পেরেশানী ও টেনশন মুক্তির জন্যে স্রষ্টার রহমত পেতে সাহায্য করবে, অপরদিকে বছর শেষে এই সজ্ঞাবদ্ধ দান বহু ভাগ্যবিদ্বস্ত মানুষের জীবনে জাগাবে আশার আলো। কারণ সং নিয়তে ও সজ্ঞাবদ্ধভাবে হওয়ার কারণে মাটির ব্যাংকে দানের বরকত ও প্রতিদান অনেক বেশি।

প্রতিবেদক : রাব্বিয়া নাজরীন

মাটির ব্যাংক : আপনার করণীয়

- আপনার যে কোনো কাজের সাফল্যের জন্যে মানত বা সদকার টাকা মাটির ব্যাংকে রাখুন।
- বিপদ বা সমস্যা মুক্তির জন্যে মানতের টাকাও রাখুন।
- চাকরি লাভের নিয়তে টাকা রাখুন।
- পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার আগে টাকা রাখুন।
- রোগ মুক্তির জন্যে টাকা রাখুন। অসুস্থ কাউকে দেখতে গেলে মাটির ব্যাংক নিয়ে যান যাতে সুস্থতা কামনা করে সবাই এতে অর্থ রাখতে পারেন।
- আত্মীয়-বন্ধুদের সাফল্য সংবাদ যেমন, পরীক্ষা পাশ, সন্তান জন্ম, জন্মদিন ও

- বিবাহবার্ষিকীতে তাদেরকে উপহার হিসেবে মাটির ব্যাংক দিন।
- ভিক্ষুককে দুই/এক টাকা দিয়ে আপনি তার দারিদ্র্য দূর করতে পারবেন না। বরং তা তাকে ভিক্ষুক থাকতেই উৎসাহিত করে। তাই এ টাকা মাটির ব্যাংকে রাখুন যা বড় দুস্থ পুনর্বাসন প্রকল্পে কাজে লাগবে। নবীজী ভিক্ষাবৃত্তিকে সবসময় নিরুৎসাহিত করেছেন।
- আপনার নিজের বা আত্মীয়-বন্ধুদের দোকান বা নিজস্ব প্রতিষ্ঠান থাকলে সেখানে মাটির ব্যাংক রাখুন এবং দর্শনাধীর্দের টাকা রাখতে উদ্বুদ্ধ করুন।
- বাসায় মাটির ব্যাংকে পরিবারের ছোট-বড় সবাইকে টাকা রাখতে উদ্বুদ্ধ করুন।
- বাসার ড্রয়িং রুমে মাটির ব্যাংক রাখতে পারেন যাতে অতিথি, আত্মীয় এবং বন্ধুদের

- টাকা রাখতে অনুরোধ করতে পারেন।
- মাটির ব্যাংকে দানের ফলে আপনার বা পরিচিতদের কি কি উপকার হয়েছে সুযোগ পেলে সে বিষয়ে অন্যদের বলুন এবং উদ্বুদ্ধ করুন।
- স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সহপাঠীদের এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।
- প্রবাসে বসবাসরত আত্মীয়-বন্ধুদের মাটির ব্যাংকের কথা বলুন এবং দান করতে উদ্বুদ্ধ করুন।
- ব্যাংক ভরে গেলে তা ফাউন্ডেশনে বা নিকটবর্তী শাখা/সেলে জমা দিয়ে নতুন ব্যাংক উপহার হিসেবে গ্রহণ করুন।
- পরিচিত, বন্ধুদের মধ্যে যে ব্যাংক আপনি বিতরণ করছেন তাদের ৩/৪ মাস পর ব্যাংকের কথা জিজ্ঞেস করুন এবং জমা দিতে উদ্বুদ্ধ করুন।

কেন মাটির ব্যাংক ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ুন কবীর

কেন আমি মাটির ব্যাংকে অর্থ রাখি, তার উত্তর হলো— এর মাধ্যমে আমার জীবনে এত সব জটিল সমস্যা সমাধানের ঘটনা আছে যা শুনলে অবিশ্বাস লাগবে। সেরকমই দু'একটি ঘটনা এখানে বলছি।



আমার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের বিরুদ্ধে তারই এক আত্মীয় একটি মিথ্যা ও বানোয়াট মামলা করেছিলেন। পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে কোর্টে চালান দেয় এবং সেখান থেকে জেল হাজতে।

আত্মীয়ের এই বিপদে তার সাহায্যে এগিয়ে এলাম। আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করলাম। জানলাম এ ধরনের কেসে ছ'মাসের আগে জামিন হয় না। পাশাপাশি মাটির ব্যাংকেও দু'ভাগে মানত করলাম। একভাগ জামিনের জন্যে, আরেকভাগ মামলা থেকে সম্পূর্ণ অব্যাহতির জন্যে।

পরম করুণাময়ের রহমতে পনেরো দিনের মধ্যে জামিন হয়ে গেল এবং তিন মাসের মধ্যে উভয় পক্ষের সমঝোতায় মামলাটি সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি হলো। এত সহজে সবকিছু হয়েছিলো কারণ, একদিন যখন জানলাম মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা একজন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট তখন নিজের পরিচয় দিলাম এবং তিনিও বেশ সহানুভূতির সঙ্গে মামলাটি নিষ্পত্তির ব্যাপারে সহযোগিতা করলেন।

গত বছর জুলাই মাসে আমার বাসার গৃহকর্মী ছেলেটি কাউকে কিছু না বলে চলে গেল। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পেলাম না। তিন দিন পার হয়ে গেল। ইতোমধ্যে জি.ডি করলাম, পত্রিকায় হারানো বিজ্ঞপ্তির ব্যবস্থা করলাম আর মাটির ব্যাংকে মানত করলাম। ৪র্থ দিন সকালে মানতের পরিমাণ দ্বিগুণ করলাম। সেদিন পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি ছাপানোর কথা থাকলেও জায়গার অভাবে ছাপলো না। মাত্র আড়াই ঘণ্টা পর অর্থাৎ সকাল সাড়ে ৮টায় টেলিফোনে জানলাম যে, ছেলেটিকে পাওয়া গেছে। মজার ব্যাপার হলো, মানতের টাকা আমি যে পরিমাণ বাড়িয়েছিলাম তার চেয়ে বেশি পরিমাণ টাকা বিজ্ঞপ্তি

না ছাপানোর জন্যে পত্রিকা অফিস থেকে ফেরত পেলাম।

[ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ুন কবীর টিএন্ডটি বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রকৌশলী]

মাটির ব্যাংকে দানের দ্বিগুণ লাভ মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসাইন

মাটির ব্যাংকে মানতের নিয়ত করে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় উল্লেখ-যোগ্য একটি সংযোজন হলো সহকারি প্রধান শিক্ষক পদে আমার নির্বাচিত হওয়া। লিখিত পরীক্ষায় নির্বাচিত হওয়ার পর গত ডিসেম্বরে এর মৌখিক পরীক্ষা ছিলো। পরীক্ষার আগে ৫০০০ টাকা মানত করলাম।

পরীক্ষা সন্তোষজনক হলো। আত্মবিশ্বাসী ছিলাম যে, নির্বাচিত হবো। কিন্তু রেজাল্ট দেখে চমকিত হলাম। কারণ সারা বাংলাদেশ থেকে আগত ৪০ জন সহকারি প্রধান শিক্ষকের মধ্যে মেধাক্রমে আমি প্রথম স্থান লাভ করেছি। স্রষ্টার কাছে কৃতজ্ঞতায় অন্তর ভরে গেল।

ইদানীং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের ফলে অনুভব করছি মাটির ব্যাংক আর সাফল্য যেন একে অপরের পরিপূরক। আল্লাহকে গভীরভাবে স্মরণ করে মাটির ব্যাংকে মানত করলে দ্বিগুণ লাভ। একদিকে সাফল্য লাভে স্রষ্টার রহমত, অপরদিকে সৃষ্টির সেবায় অংশগ্রহণের গভীর আনন্দ।

[মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসাইন চট্টগ্রাম সরকারি মুসলিম উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকারি শিক্ষক।]



ব্যথা ভালো হয়ে গেল বর্ণা রানী গুণ

আমার মায়ের বয়স নব্বইয়েরও বেশি। গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ তিনি বুকের ব্যথায় খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। পরীক্ষা করে জানা গেল তার বুকের ডান পাজরের একটি হাড় বাঁকা হয়ে



মাংসে গাঁথে গেছে। ব্যথা এত প্রচণ্ড ছিলো যে ওষুধ খেয়েও মা সবসময় কান্নাকাটি করতেন, আর আমরা অসহায়ের মতো তা দেখতাম।

মাটির ব্যাংকের টাকা দুস্থদের কল্যাণে ব্যয় হয় শুনে আগে থেকেই আমার মা এ ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিলেন, আমাদেরকে টাকা ফেলতে বলতেন। এবার আমরা মায়ের জন্যে এতে টাকা রাখতে লাগলাম। ধীরে ধীরে তিনি ব্যথা থেকে মুক্তি পেলেন। এখন তিনি হাঁটতে না পারলেও মমতাময়ী মা হিসেবে আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন।

[বর্ণা রানী গুণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত]

চল্লিশের এক ভাগ সীতাব আলী

অংশীদারদের সাথে জমি নিয়ে আমার সমস্যা হচ্ছিলো। তাদের অসহযোগিতার কারণে জমিটুকু বিক্রি করা সম্ভব হচ্ছিলো না। বহু ভাবে বৈঠক করেও সমস্যার সমাধান হচ্ছিলো না। দু'বছর ধরে মাটির ব্যাংকে পাঁচ হাজার করে আল্লাহর নামে মানত করেছি, মেডিটেশন করেছি, সমাধান হয় হয় করেও হয় নি।

এবছর ২১ ফেব্রুয়ারি মানতের পরিমাণ নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে গুরুজী বলেছিলেন, সমস্যা বা সম্পদের মোট পরিমাণের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ মানত করলে তা ফলপ্রসূ হতে পারে। পরদিন বাসস্থান সিলেটে না ফিরে বিশেষ উদ্দেশ্যে রাজশাহী রওনা হলো। ইতোমধ্যে আমি সমস্যার একটি মূল্য নির্ধারণ করলাম এবং চল্লিশের এক ভাগ করলাম অর্থাৎ পনের হাজার টাকা মাটির ব্যাংকে মানত করলাম। স্রষ্টার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস ছিলো, এবার তা সমাধান হবে।

রাতে মোবাইলের মাধ্যমে জানতে পারলাম আমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। ত্রেতা বায়না করার জন্য আমাকে খুঁজছেন এবং অংশীদাররাও নিজ উদ্যোগে সমাধানের প্রস্তাব নিয়ে বাসায় এসেছেন। আমি বিস্ময়ে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করি। গুরুজীর ঘোষণার পরের দিন সাফল্য— এটা মনে হলে আজো আমি বিস্ময়বোধ করি।

[সীতাব আলী, ব্যবসায়ী ও সমাজকর্মী]

কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংক

সাফল্য ও অভিজ্ঞতা



মাটির ব্যাংকে নিয়মিত অর্থ রাখেন চট্টগ্রামের গ্রাজুয়েট জনাব জি.এম. সিদ্দীক আহমেদ ও তার পরিবারের তিন প্রজন্মের সব সদস্য

অসম্ভব হলেও সত্যি

সর্দার মুহাম্মদ নূর-উজ-জামান



আমার রঙানীমুখী পোশাক শিল্প ঋণের বিপরীতে ব্যাংকে ৬৫ লাখ টাকার সিকিউরিটি ডিপোজিট ছিলো। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, ব্যাংক থেকে এই টাকা তুলে সমপরিমাণ মূল্যের জমি কিনে



ব্যাংকে মানত করার কিছু দিনের মধ্যেই আমার মেয়ে আল্লাহর রহমতে সুস্থ হয়ে যায়। মাটির ব্যাংকের এই বরকতের কথা আমি এখন আমার পরিচিতদের আগ্রহভরে বলি।

[শিল্পী বেগম, স্কুল শিক্ষিকা]

জমির বরাদ্দ পেলাম

মোজাম্মেল হক

পূর্বাচলে রাজউকের প্লট বরাদ্দ পাওয়ার জন্যে আবেদন করেছিলাম। কিন্তু তারপর থেকেই শুনতে লাগলাম, এ জমি পেতে হলে মন্ত্রীর সুপারিশ লাগবে, টাকা ঢালতে হবে বা মাস্তান ভাড়া করতে হবে



ইত্যাদি নানা হতাশার বাণী। আমি এসব কোনো কিছু না করে কাগজপত্রের আইনগত দিকগুলো একজন আইনজীবীকে দিয়ে পরীক্ষা করলাম আর মাটির ব্যাংকে একটি বড় মাপের অর্থ দানের মানত করলাম। সং নিয়তের প্রতিদান যে আল্লাহই দেন তার প্রমাণ আরেকবার পেলাম সফল আবেদনকারীদের তালিকায় আমার নামটিও দেখে।

[মোজাম্মেল হক একজন ব্যবসায়ী]

নিত্যসঙ্গী মাটির ব্যাংক

আশা রানী দেবী

মাটির ব্যাংকের সাফল্যের কথা সবার মুখে মুখে শুনতাম। সবই যে বিশ্বাস করতাম তা নয়। কিন্তু এখন আমি এবং আমার পরিবার পুরোপুরি এটার উপর আস্থাশীল। কারণ এর কার্যকারিতার এত অসংখ্য প্রমাণ পেয়েছি যা বলে শেষ করা যাবে না।

পূজো উপলক্ষে আমার স্বামীকে হাতে কাজ করা রাজশাহী সিল্কের একটি ফতুয়া উপহার দিয়েছিলাম। দামের চাইতেও জিনিসটা ছিলো খুবই শখের। কারণ দামী কাপড়ের প্রতি অনাসক্ত স্বামীকে বহু কষ্টে রাজী করিয়েছিলাম ফতুয়াটা পছন্দ করতে বাজারে যেতে।

সেসময় শীতকাল থাকায় তিনি সেটা গায়ে দেন নি। তাই সযত্নে রেখে দিলাম আলমিরাতে। কিন্তু কিছুদিন পর বের করতে গিয়ে দেখি ওটা আলমিরাতে নেই। বহু খোঁজাখুঁজি করেও পেলাম না। দু’বছর পার হয়ে গেলো। এর মধ্যে মাঝে মাঝেই কাপড়-চোপড় ঘেঁটে দেখি পাওয়া যায় কি না।

এসময়ই অনেকটা পরীক্ষা করার মতো মাটির ব্যাংকে টাকা রাখলাম। যেন ভাবটা এরকম যে সাথে সাথেই পেয়ে যাবো। কিন্তু তাতো হবার নয়। যা-ই হোক, কিন্তু আশ্চর্য হয়ে গেলাম যখন তার কিছুদিন পর ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে অপ্রয়োজনীয় কাগজের ভেতর থেকে বের হলো ফতুয়াটা।

এরপর থেকে ছোট-বড় সব কাজে সবসময়ই মাটির ব্যাংক আমার আশ্রয় নিত্যসঙ্গী। কারণ সমস্যা সমাধানে এত দ্রুত ফল আর কিসে হয় তা আমার জানা নেই।

[আশা রানী দেবী, রাজশাহী প্যারামাউন্ট স্কুলের শিক্ষিকা]

মাটির ব্যাংক

চম্পা সমাদ্দার

আমার নাতনীর জ্বর কোনো কিছুতেই ভালো হচ্ছে না। তার সুস্থতা কামনা করে মাটির ব্যাংকে টাকা ফেললাম। ধীরে ধীরে সে সুস্থ হয়ে উঠলো।

আমার চাকরিতে প্রমোশন আটকে গিয়েছিলো। মাটির ব্যাংকে টাকা ফেলে সব জটিলতা দূর হয়ে তাড়াতাড়ি প্রমোশন পেয়ে গেছি।

[চম্পা সমাদ্দার, চাকরিজীবী]

শারীরিক জটিলতা আর হয় নি

ডা. কামাল উদ্দিন আহমেদ

একজন ডেন্টাল সার্জন হিসেবে ব্যথার রোগীদের সাথেই আমার ব্যবস্থাপনা। একবার এক জটিল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিলাম এরকম এক রোগীকে নিয়ে। দুর্বল এক রোগিণীর সাধারণ একটা দাঁত ফেলতে গিয়ে দাঁতের সাপোর্টিং হাড়ের বেশ কিছুটা ভেঙে গেল যা আমার ২২ বছরের প্র্যাকটিসে প্রথম। এ অবস্থায় যা যা হতে পারে, যেমন অনিয়ন্ত্রিত রক্তপাত— যা সামাল দিতে বড় হাসপাতালে মেজর অপারেশন অথবা মুখ-গলা প্রচণ্ডভাবে ফুলে যাওয়া ইত্যাদি উপসর্গের কথা ভেবে আমি কিছুটা ঘাবড়ে গেলাম। যা-ই হোক, আমার এখানে সম্ভব সর্বোচ্চ চিকিৎসা দিয়ে রোগিণীকে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতে বললাম। মনে মনে রোগিণীর চিকিৎসার পরবর্তী ধাপগুলো গ্ল্যান করার পাশাপাশি তার আরোগ্য কামনায় মাটির ব্যাংকেও বেশ কিছু টাকা ফেললাম।

আল্লাহর অশেষ রহমতে প্রদিন সকালে রোগিণী জানালেন সামান্য দুর্বলতা ছাড়া আর কোনো অসুবিধাই তিনি বোধ করছেন[] না। [ডা. কামাল উদ্দিন আহমেদ ডেন্টাল সার্জন]

আমাদের পরিবার এখন নিরাপদ

কোহিনূর বেগম

২০০১ সালে আমাদের পরিবার সন্ত্রাসের শিকার হয়। একটা ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমাদের প্রতিবেশির সাথে ভুল বোঝাবুঝির ফলে দু’পক্ষের মধ্যে মারামারি হলো।

আমার এক ছেলে এ ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে এবং সন্ত্রাসীদের মূল টার্গেটে পরিণত হয়।

এ ঘটনাটা যেদিন ঘটলো সেদিন ঝামেলা এড়ানোর নিয়তে মাটির ব্যাংকে ১০০ টাকা ফেলেছিলাম। এরপর প্রতিদিনই কিছু না কিছু ফেলতাম। আল্লাহর অসীম রহমতে আমাদের পরিবার এখন নিরাপদ। কারণ সন্ত্রাসীরা আমার ছেলেকে আর খুঁজে পায় নি, আক্রমণও করতে পারে নি।

[রাজশাহীর কোহিনূর বেগম একজন গৃহিণী]

সীমিত সামর্থ্যকে কাজে লাগাচ্ছি

নিজাম হাসান সাদী

তখন ভোর ৬টা। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে চাদের মুড়ি দিয়েও শীতের ঠাণ্ডা বাতাস টের পাচ্ছিলাম। হঠাৎ চোখ পড়লো— নিচের ডাস্টবিনের দিকে— যেখানে ৬-৭ বছরের তিনটি ছেলে-মেয়ে খালি পায়ে এবং প্রায় খালি গায়ে

কাগজ কুড়াচ্ছে। ওদের একজন হঠাৎ ডাস্টবিনে একটি জুসের প্যাকেট পেয়ে মহা উল্লাসে তাতে স্ট্রু লাগিয়ে খেতে চেষ্টা করলো তলায় পড়ে থাকা দু-এক ফোঁটা জুস।

দৃশ্যটা দেখে চোখে পানি এসে গেল। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হতে লাগলো। সেই সময়ই কোয়ান্টাম মাটির ব্যাংকে অর্থ দানের ধারণা পেয়ে যেন বুকের বোঝাটা হাল্কা হলো। কারণ বড় কিছু করতে না পারলেও এই বর্ষিত মানুষদের জন্যে এখন নিজের সীমিত সামর্থ্যটুকুকে তো কাজে লাগাতে পারছি।

[নিজাম হাসাদ সাদী বুয়েটের ছাত্র]

যান্ত্রিক ত্রুটিও হার মেনেছে শিমুল মাহমুদ

আমার কম্পিউটারটি ১৯৯৮ সালে কেনা। সময়ের তুলনায় এখন বেশ পুরানো। ২০০২ সালের শুরুতে একবার অনেক চেষ্টা করেও কম্পিউটারটি রান করাতে পারছি না। মনিটরে হার্ডডিস্ক ফেইলিওর দেখাচ্ছে। আমার মন খুব খারাপ কারণ নতুন কম্পিউটার কেনার মতো টাকা হাতে নেই। এদিকে লেখালেখি এবং একটি নিজস্ব পত্রিকা বের করার যাবতীয় কাজ এই কম্পিউটার দিয়েই হয়। আবার এরকম হার্ডডিস্ক এখন বাজারে পাওয়া যায় না। আর নষ্ট হয়ে যাওয়া হার্ডডিস্কে রাখা গত ৪ বছরের ডাটা রিকভারীরও সম্ভাবনা প্রায় নেই। একা বসে কিছুক্ষণ ভাবার পর মাটির ব্যাংকে কিছু টাকা রেখে আবার কম্পিউটার নিয়ে বসলাম। আমি কম্পিউটারের কিছুই জানি না। তবু শেষ চেষ্টা হিসেবে অসীম সাহসে হার্ডডিস্কটাকে ইনস্টল করে বায়োস সেটআপে গিয়ে বিভিন্ন অপশন অন/অফ করলাম। আমাকে অবাক করে দিয়ে কম্পিউটার রান হলো। সেই কম্পিউটার এখনও ভালো সার্ভিস দিচ্ছে।

[শিমুল মাহমুদ সাংবাদিক]

শান্তিপূর্ণ সমাধান

মঈনুল ইসলাম

১৯৮৯ সালে চট্টগ্রামের হালিশহরে আমাদের নিজস্ব বাড়িটি তৈরির সময় এর সুয়ারেজ লাইনের সংযোগ দেয়া হয়েছিলো অনতিদূরের সরকারি বড় ড্রেনটার সঙ্গে। দু’বছর আগে ঐ জায়গাটার ওপর একটি পাকা দোকান নির্মাণের সময় আমাদের আপত্তির জবাবে

ভবিষ্যতে যে কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে সহযোগিতার আশ্বাস দেয়া হলো।

কিন্তু কিছুদিন আগে সুয়ারেজ লাইনটা বন্ধ হয়ে গেল। বেশ চেষ্টার পর আমরা বাধ্য হলাম সেটা পরিত্যাগ করে নতুন সংযোগের ব্যবস্থা করতে। তখনই তাতে বাধ সাধলো অবৈধ দখলদাররা। এদিকে ড্রেন বন্ধ হওয়ায় দৈনন্দিন কাজে পানির ব্যবহারও বন্ধ করতে হলো।

অবশেষে স্থানীয় নেতাদের সহযোগিতায়ও যখন আশু সমাধানের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিলো না, তখন মাটির ব্যাংকে মানত করলাম এবং কিছু অংশ রাখলামও। আল্লাহর অশেষ রহমতে পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যেই সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হলো। আমরা নতুন সুয়ারেজ লাইন স্থাপন করলাম।

[মঈনুল ইসলাম কম্পিউটার প্রোগ্রামার]

মোবাইল সেট ফেরত পেলাম মো. আব্দুল মোমিন মুকুল

বগুড়া থেকে রাজশাহী এসেছিলাম কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে অংশ নিতে। ওয়ার্কশপ চলাকালীন আমার মোবাইলটি পকেটে বন্ধ অবস্থায় ছিলো। কিন্তু সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ বগুড়ায় ফেরার সময় দেখি সেটি আর নেই। সঙ্গে সঙ্গে অডিটোরিয়ামে গেলাম, কিন্তু দারোয়ানকে পেলাম না। ঐ মুহূর্তেই আমি মাটির ব্যাংকে একটা পরিমাণ অর্থ ফেলার নিয়ত করলাম। অতএব, বাসায় ফিরে তার অর্ধেকটা রাখলাম। কিন্তু যখন মনে পড়লো পুরো টাকাটা ব্যাংকে ফেললে বরকত আরও দ্রুত হয় তখন বাকি টাকাটাও রাখলাম ব্যাংকে। আশ্চর্য ব্যপার, এর আগে তিন দিন ধরে বিভিন্ভাবে চেষ্টা করে কোনো খোঁজ না পেলেও সেদিন সন্ধ্যায় আমার নম্বরে ফোন করার পরপরই একজন কেউ ফোন ধরলো এবং জানা গেলো সে হচ্ছে ঐ দারোয়ানের মেয়ে। ফোনটি তারা ফেরত দিতে চায়, তা-ও জানালো। পরদিন দারোয়ান নিজে রাজশাহী সেন্টারে এসে মোবাইল সেটটি ফেরত দিয়ে গেলেন।

[মো. আব্দুল মোমিন মুকুল ব্যবসায়ী]

দিনের কাজ শুরু করি মাটির ব্যাংকে টাকা ফেলে

সন্দীপ ধর

দান করতে আমার খুব ভালো লাগে। কিন্তু সঠিক খাত খুঁজে পেতাম না। কোয়ান্টাম কোর্স করার পর আমি সঠিক দানের খাত পেলাম, মাটির ব্যাংক।

আমি একজন ব্যবসায়ী। প্রতিদিন অফিসে গিয়ে মাটির ব্যাংকে দান করে আমি দিনের কাজ শুরু করি। একদিনের কথা— সেদিন আমি আর্থিকভাবে এতটাই সংকটে ছিলাম যে দশ টাকা রিস্তা ভাড়া দিয়ে অফিসে পৌঁছার পর মাটির ব্যাংকে দেবার মতো একটি টাকাও ছিলো না। শেষ পর্যন্ত অন্য এক জায়গা থেকে টাকা

এনে মাটির ব্যাংকে রাখলাম। এরপর চোখ বন্ধ করে ভাবছিলাম, আমার এত টাকার দরকার অথচ একটি টাকাও নেই পকেটে! হঠাৎ কারও ডাকে ভাবনায় ছেদ পড়লো এবং অবাক হয়ে গেলাম যখন দেখলাম একলক্ষ টাকা কাজের চুক্তি নিয়ে একজন আমার কাছে এসেছে। আমার টাকার সমাধানটা পুরোপুরি মিটে গেলো।

[সন্দীপ ধর সিলেটের ব্যবসায়ী]

নেশা ছাড়তে পেরেছি সৈয়দ নাজমুল আলম

যশোর সেলের মেডিটেশন প্রোগ্রামে এসেই মাটির ব্যাংকের সাথে পরিচয়। তখন আমি মারাত্মকভাবে নেশাগ্রস্ত। এক সময় সিদ্ধান্ত নিলাম, নেশা ছাড়বো, আবার পড়াশোনায় মনোযোগী হবো। নিয়মিত মাটির ব্যাংকে টাকা রাখতে লাগলাম। সেই সাথে চললো প্রতিদিন দুবেলা মেডিটেশন। নিঃশ্ব ও ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের কল্যাণে মাটির ব্যাংকে এই দানই বোধহয় আমাকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রেখেছিলো। এখন সিগারেট ছাড়া আমার অন্য কোনো নেশা নেই। আশা করছি শীগগিরই এটা ছেড়ে দিতে পারবো। মানুষের কল্যাণের পাশাপাশি মাটির ব্যাংকে নিঃস্বার্থ দান ব্যক্তির নিজের মানসিক প্রশান্তি ও সাফল্যের পথকে সুগম করে— এ বিশ্বাস এখন আমার দৃঢ় হলো।

[সৈয়দ নাজমুল আলম ছাত্র]

জটিল সমস্যার দ্রুত সমাধান দিল আফরোজ মুনা

একবার আমার কর্মস্থল সফটওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে আমাকে একটি সফট-ওয়্যারের ডেমনস্ট্রেশন তৈরি করে দিতে বলা হলো দু’দিনের মধ্যে। আমি চেষ্টাও করলাম, কিন্তু দু’দিনের মাথায় যেটুকু করতে পারলাম তা কোনোভাবেই সন্তোষজনক ছিলো না। আমার দক্ষতা বা অফিসের সুনাম ইত্যাদি সম্পর্কে যে বাজে ধারণা হবে এসব ভেবে খুব অস্থির লাগছিলো। হঠাৎ মনে পড়লো মাটির ব্যাংকের কথা। কাজটা ভালোভাবে যেন করতে পারি এ প্রার্থনা করে সে মুহূর্তে আমার কাছে যা অর্থ ছিলো তার সবটাই মাটির ব্যাংকে রাখলাম। অবাক কাণ্ড, পরদিন অফিসে গিয়ে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই পুরো বিষয়টা গুছিয়ে ফেলতে পারলাম। জটিল সমস্যাগুলোর সমাধান হয়ে গেল অবিশ্বাস্য দ্রুততায়। শুধু তা-ই নয়, আমার ডেমনস্ট্রেশন খুবই ভালো হয়েছিলো বলে কাজটাও আমরা পেয়েছিলাম।

[দিল আফরোজ মুনা কম্পিউটার প্রোগ্রামার]

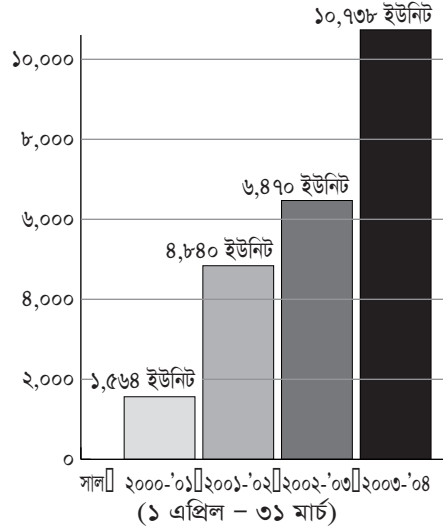
শ্বেচ্ছা রক্তদান আন্দোলনে নব দিগন্তের সূচনা

সৃষ্টির সেবায় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন শ্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম এখন এ ধারায় একটি মডেলে পরিণত হয়েছে। ২০০০ সালে কোয়ান্টাম ল্যাব প্রতিষ্ঠার মাত্র চার বছরের মাথায়ই এটি অর্জন করেছে তার লক্ষ্যমাত্রা। গত মার্চ মাসে কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে সরবরাহ করা হয়েছে ১,৩২৪ ব্যাগ রক্ত যা ৫ম বছরে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রারও ৩২% বেশি। পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে এ সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছে অগণিত মানুষের নিঃস্বার্থ সেবা আর দানের আন্তরিকতা।

প্রথম বছর অর্থাৎ ২০০০-০১ সালে সারা বছরের মোট সংগ্রহ যেখানে মাত্র ১,৭৮১ ব্যাগ, ৪ বছর পর ২০০৩-০৪-এ তা এসে দাঁড়ায় ১০,৪৩১ অর্থাৎ প্রায় ৬ গুণ। এ বছর ব্লাড ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে ৯৪টি। যার মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছে ৭,১১৯ ব্যাগ রক্ত। বাকি অর্থাৎ ৩,৩১২ ব্যাগ রক্ত দাতারা সরাসরি ল্যাবে এসে দিয়ে গেছেন।

৪র্থ বছরে কোয়ান্টাম ল্যাবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলো আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ রক্তের আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবে পরিণত হওয়া। ২০০৩ পর্যন্ত ল্যাব শুধু হোল ব্লাড ও আরসিসি দিতে পারতো। গ্রহীতার প্রয়োজনে রক্তের অন্যান্য উপাদান সরবরাহ করা যেতো না। এসময়ই “আপনার আন্তরিক দান বাঁচাবে লক্ষ প্রাণ”— এ আবেদন নিয়ে কোয়ান্টাম ল্যাবকে সমৃদ্ধ করার জন্যে অর্থ সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু হয়। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আন্তরিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের মাধ্যমে সংগৃহীত হয় অর্থ কোটি টাকা। এ অর্থে কেনা হয় রক্তের কম্পোনেন্ট সেপারেটর (সেন্ট্রিফিউজ মেশিন), ক্রীনিং-এর জন্যে আধুনিক এলাইজা মেশিন, -৯০° ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রার ডিপ ফ্রিজ এবং প্রাটিলেট সংরক্ষণের জন্যে প্রাটিলেট ইনকিউবেটর।

ফলে ২০০৩ সালের আগস্ট মাস থেকেই কোয়ান্টাম ল্যাব প্রাটিলেট, ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা, প্রাটিলেট রিচ প্লাজমা, আরসিসিসহ রক্তের সকল উপাদান সরবরাহ করছে। যা ডেঙ্গু, আইটিপি, ব্লাড ক্যান্সার, হিমোফিলিয়া, লিউকেমিয়া, আগুনে পোড়া স্ত্রীয়ার এনিমিয়াসহ বিভিন্ন রোগীর প্রয়োজনে



কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে (২০০০-০৩) রক্ত সরবরাহের সালওয়ারি প্রবৃদ্ধি

আরও বেশি সেবা দিচ্ছে।

কোয়ান্টাম ল্যাব প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকেই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত পাঁচটি মৌলিক ক্রীনিং সম্পন্ন করে রক্ত প্রদানের ব্যাপারে আপোষহীন মনোভাব নিয়ে কাজ করে আসছে। রক্তে হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি, সিলিলিস, এইডস বা ম্যালেরিয়া ইত্যাদি যে কোনো একটির জীবাণুর উপস্থিতি সম্পর্কে কোনো রকম সংশয় বা প্রশ্ন দেখা দিলে সে রক্তের ব্যাগ সাথে সাথে বাতিল ও ধ্বংস করা হয়। এই আপোষহীন মনোভাবের কারণে কোয়ান্টাম ল্যাব থেকে সরবরাহকৃত রক্তের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা এখন পুরোপুরি আস্থাশীল।

তাদের এই আস্থার ফলেই প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরে যেখানে মাত্র ১,৫৬৪ ব্যাগ রক্ত সরবরাহ করা হয়েছিলো সেখানে গত ২০০৩-০৪ সালে অর্থাৎ ৪র্থ বছরে রক্ত সরবরাহ হয়েছে ১০,৭৩৮ ব্যাগ অর্থাৎ প্রায় ৭ গুণ বৃদ্ধি। গড়ে প্রতি মাসে সরবরাহ করা হয়েছে ৮৯৫ ব্যাগ। এ বছর মার্চ মাসে সরবরাহ করা হয়েছে সর্বোচ্চ ১,৩২৪ ব্যাগ রক্ত। এর মধ্যে হোল ব্লাড ৮০৮ ব্যাগ, আরসিসি ৩২৭ ব্যাগ, ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা ৬৬ ব্যাগ, প্রাটিলেট রিচ প্লাজমা ৪৮ ব্যাগ এবং প্রাটিলেট কনসেন্ট্রেট ৩৪ ব্যাগ।

গত বছর বিভিন্ন কারণে ৩৮৫ ব্যাগ রক্ত বাতিল ও ধ্বংস করা হয়। এর মধ্যে হেপাটাইটিস বি সন্দেহে ২০৫ ব্যাগ, হেপাটাইটিস সি সন্দেহে ৮ ব্যাগ, সিলিলিস সন্দেহে ২৯ ব্যাগ রক্ত বাতিল করা হয়। বাকিগুলো কম সংগ্রহ, হেমোলাইজড বা মেয়াদোত্তীর্ণ হবার কারণে বাতিল করা হয়।

কোয়ান্টাম ল্যাবের কনসালটেন্ট রক্ত পরিসঞ্চালন বিশেষজ্ঞ ডা. এম এম হাবীবুল্লাহ প্রতিদিন নিয়মিত স্লাইড বা ডিভাইজ নিরীক্ষা করেন। এছাড়া মেডিক্যাল অফিসার ডা. রাজু আহমেদ এবং ডা. খাইরুল ইসলাম রক্ত সংগ্রহ ও ক্রীনিং তত্ত্বাবধান করেন। এছাড়া ল্যাবের অনারারী ডিরেক্টর প্রফেসর ডা. এবিএম ইউনুস ল্যাব পরিচালনা ছাড়াও মাঝে মাঝে আকস্মিক ভিজিট করেন।

বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, টেকনোলজিস্ট, ল্যাব



-৯০° সেলসিয়াস তাপমাত্রার ডিপ ফ্রিজ

কর্মী, কর্মকর্তা ও শ্বেচ্ছাসেবকদের আন্তরিক সেবার মানসিকতার ফলেই পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে কোয়ান্টামের সরবরাহ করা প্রতি ইউনিট রক্ত ও রক্ত উপাদান হয়ে উঠেছে নিরাপদ, নিশ্চিত মনে ব্যবহার যোগ্য।

শুধু রক্ত সরবরাহই নয়, শ্বেচ্ছায় রক্তদান-কারীদের সম্মানিত করার কাজটিও কোয়ান্টাম ল্যাব গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। প্রায় এক দশকের চেষ্টায় কোয়ান্টাম গড়ে তুলেছে দেশের সবচেয়ে সুসংগঠিত ব্লাড ডোনার পুল। এখানে এক ব্যাগ রক্ত দিলেই ডোনার বিনামূল্যে পান ৫টি বেসিক ক্রীনিং রিপোর্ট। তিনবার রক্ত দিলে যে কেউ হতে পারেন সম্মানিত লাইফ লং ব্লাড ডোনার। জুলাই ২০০৩ সালে ফাউন্ডেশন আয়োজন করে সহস্র রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠান, যাতে আজীবন রক্তদাতাদের ক্রেস্ট প্রদান করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলাম, বিশেষ অতিথি প্রবীণতম রক্ত বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডা. মুজিবুর রহমান এবং বিশেষ অতিথি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ। এরকম বিপুল আয়োজনে শ্বেচ্ছায় রক্তদানকারীদের সম্মান জানানোর প্রচেষ্টা দেশে এই প্রথম। আজীবন রক্তদাতাদের ক্রেস্ট ছাড়াও বিশেষ সনদপত্র ও আই.ডি কার্ড প্রদান করা হয়। এখন প্রায় প্রতি মাসেই শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।

কোয়ান্টাম শ্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম তার এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে ভবিষ্যতেও সৃষ্টির সেবায় রাখবে অনন্য দৃষ্টান্ত- পরম করুণাময়ের কাছে এটাই সবার প্রার্থনা।

প্রতিবেদক : সুমন ধর



ল্যাবের অনারারী ডিরেক্টর প্রফেসর ডা. এবিএম. ইউনুস (ডানে উপবিষ্ট) এলাইজা মেশিনের প্রসেসিং দেখছেন। পাশে সাহায্য করছেন মেডিক্যাল অফিসার ডা. রাজু আহমেদ। অন্যদিকে সেন্ট্রিফিউজ মেশিনে সেল সেপারেশনের প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করছেন কনসালট্যান্ট ডা. এম.এম. হাবীবুল্লাহ।



কোয়ান্টাম ল্যাব পরিদর্শনে কিরারানো কাই-এর সভানেত্রী মিসেস হিরোকো কাওয়াহারা নেতৃত্বে জাপানী শ্বেচ্ছাসেবী দল

এপ্রিলে সর্বোচ্চ ১৩৯৮ ইউনিট রক্ত সরবরাহ

পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে গত এপ্রিল মাসে কোয়ান্টাম ব্লাড সেন্টার এ যাবৎ কালের সর্বোচ্চ পরিমাণ রক্ত, প্রায় এক হাজার চারশত (১৩৯৮) ইউনিট, সরবরাহ করেছে। এর মধ্যে প্লাটিলেট কনসেন্ট্রেট ১৪১ ইউনিট, ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা ৫৮ ইউনিট, ফ্রেশ প্লাজমা ৪ ইউনিট, প্লাটিলেট রিচ প্লাজমা ৪৭ ইউনিট, আরসিসি ৩২৩ ইউনিট এবং হোল ব্লাড ৭৮৪ ইউনিট।

এছাড়াও ডোনার'স অনারারিয়াম হিসেবে ২৩ ইউনিট এবং ডোনার'স ডিসকাউন্ট হিসেবে ১৮ ইউনিট রক্ত সরবরাহ করা হয়।

ল্যাভে এসে রক্ত দেয়ার আগ্রহ বাড়ছে

গত কয়েক মাসে উল্লেখযোগ্য হারে রক্তদাতারা কাকরাইল ল্যাভে এসে রক্ত দিচ্ছেন। রক্তদাতাদের এই আগ্রহের ফলে গত এপ্রিল মাসে ল্যাভে রক্ত সংগ্রহের পরিমাণ ছিলো ৪০৪ ইউনিট।

জুন-জুলাই মাসের কর্মসূচি

খুলনায় :

কোর্স :

১৮২ ব্যাচ : ৪, ৫, ৬ ও ৭ জুন
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

যশোরে :

কোর্স :

১৮৩ ব্যাচ : ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ জুন
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

ঢাকায় :

পরিচিতি সভা :

১৮৪ ব্যাচ : ৯ জুন (বুধবার)

১৮৬ ব্যাচ : ৭ জুলাই (বুধবার)

কোর্স :

১৮৪ ব্যাচ : ১৮, ১৯, ২০ ও ২১ জুন

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

১৮৬ ব্যাচ : ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ জুলাই

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ :

২৫ জুন (শুক্রবার)

মেধাঘন ও সাফল্যায়ন :

২৩, ২৪, ৩০ জুন ও ১ জুলাই

(বুধ, বৃহস্পতি এবং বুধ ও বৃহস্পতিবার)

চট্টগ্রামে :

পরিচিতি সভা :

১৮৫ ব্যাচ : ৩ জুলাই (শনিবার)

কোর্স :

১৮৫ ব্যাচ : ৯, ১০, ১১ ও ১২ জুলাই

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ :

২ জুলাই (শুক্রবার)

রাজশাহীতে :

পরিচিতি সভা :

১৮৭ ব্যাচ : ২৪ জুলাই (শনিবার)

কোর্স :

১৮৭ ব্যাচের : ৬, ৭, ৮ ও ৯ আগস্ট

(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ :

২৩ জুলাই (শুক্রবার)



৫ম বার্ষিক নির্বাহী ওয়ার্কশপ

আত্মনির্মাণের চেতনা বিকাশে দ্বিতীয় ধাপের কাজ শুরু

“২০০৩-২০০৪ সাল অর্থাৎ প্রতিষ্ঠার ৮ম বছরে এসে বলা যায়, পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে ফাউন্ডেশন আত্মনির্মাণের চেতনা বিকাশে দ্বিতীয় ধাপে উন্নীত হয়েছে। দশ বছর আগে কোয়ান্টামের সূচনা লগ্নে যে মেডিটেশনকে মনে করা হতো এক ধরনের পাগলামি, তা-ই বিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। কোয়ান্টাম মেথডের ব্যাপারে জানার আগ্রহ সাধারণভাবে অনেক বেড়েছে।

ফাউন্ডেশনের স্বচ্ছ রক্তদান কার্যক্রম এখন দেশের এক অনন্য রক্ত কার্যক্রম হিসেবে সংশ্লিষ্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কোয়ান্টাম মেডিটেশন রিসর্ট ও শিশুকানন নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে কৌতূহলী করে তুলেছে অগণিত মানুষকে।

ফাউন্ডেশনের স্ব-অর্থায়ন ক্ষমতা পেয়েছে বলিষ্ঠ ভিত্তি। সবার উপরে অসংখ্য তরুণ-তরুণী অবিদ্যামুক্ত হয়ে নিজেকে সত্যের আলোয় আলোকিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছে। আর এক ঝাঁক তরুণ-তরুণী ফাউন্ডেশনকে গ্রহণ করেছে নিজেকে জীবনের মিশন হিসেবে। সৃষ্টির সম্ভাব্যতার জন্যে সবকিছু ত্যাগ করতে তারা প্রস্তুত। পরম করুণাময় এদেরকে সহ আমাদের সবাইকে কবুল করুন।”

গত ৩০ এপ্রিল ও ১ মে, ২০০৪ দুইদিনব্যাপী বার্ষিক নির্বাহী ওয়ার্কশপে পেশকৃত কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের বার্ষিক প্রতিবেদন (২০০৩-২০০৪)-এর উপসংহারে এ কথা বলা হয়। ঢাকার কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে অনুষ্ঠিত এ প্রাণবন্ত কার্যসূচিতে সারা দেশ থেকে আগত দেড় শতাধিক নির্বাহী অংশগ্রহণ করেন। রিপোর্টে আরও বলা হয় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সকল কর্মকাণ্ড পরিচালিত হচ্ছে নৈতিক

পুনর্জাগরণ ও মানবিক মহাসমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে। আর বর্তমান নৈতিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের মূল কারণ ভোগবাদী ‘জোর যার মুল্লুক তার’ দৃষ্টিভঙ্গির উৎস অবিদ্যা থেকে মুক্তি লাভের মাধ্যমেই একজন মানুষ অনন্য মানুষ হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে পারে, নির্মিত হতে পারে মানবিক মহাসমাজের প্রাথমিক ভিত্তি। আর এ পরিবর্তনের কাজটি শুরু করতে হবে নিজের ভেতর থেকে। এ উদ্দেশ্যে ২০০৩ সালকে আত্মনির্মাণের বছর হিসেবে ঘোষণা করে ফাউন্ডেশন আয়োজন করে অবিদ্যা বিষয়ক পাঁচটি গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপসহ আরও ১৫ দিন বিশেষ ওয়ার্কশপ ও আত্মউন্নয়নমূলক অন্যান্য কর্মসূচি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, এ বছর ফাউন্ডেশনের স্ব-অর্থায়ন ক্ষমতার ভিত্তিও আরো সংহত হয়েছে। প্রো-মাস্টারদের নিয়মিত মাসিক অনুদান গত বছরের তুলনায় ৫৬% বেড়েছে। সদস্যদের নিয়মিত অনুদান হচ্ছে একটি সংগঠনের আয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নিশ্চিত ভিত্তি। সদস্য সংখ্যার তেমন কোনো বৃদ্ধি ছাড়াই আয়ের এ প্রবৃদ্ধি সংঘের সাথে সদস্যদের একাত্মতায় নতুন মাত্রা সংযোজিত হওয়ার লক্ষণ। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সহ সকল খাতে আয় বৃদ্ধি ও মাটির ব্যাংকে আগের বছরের চেয়ে ২১ লক্ষাধিক টাকা অর্থাৎ দ্বিগুণেরও বেশি সংগ্রহের মাধ্যমে আর্থিক ও সেবার ব্যাপারে ফাউন্ডেশনের উপর সাধারণের বলিষ্ঠ আস্থা ই প্রকাশ পেয়েছে। একাত্মতা, সত্যতা, দক্ষতা ও মিতব্যয়িতার এ ধারা অব্যাহত থাকলে করুণাময়ের অনুগ্রহে আমরা অচিরেই বিশাল কর্মকাণ্ডের সূচনা করতে পারবো।

আমার জীবনের একটি সঠিক সিদ্ধান্ত তারিন

কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আমি কনফিউশনে অর্থাৎ দ্বিধায় ভুগি খুব বেশি। এই



কোর্সের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ছিলো না। কিন্তু কোর্সে অংশ নেয়ার পর এখন আমি যে পরিবর্তন উপলব্ধি করছি, সে শব্দটিতে কনফিউশনের ‘সি’ আছে ঠিকই, কিন্তু আগের শব্দের চেয়ে তা একেবারেই আলাদা। আর তা হলো কনফিডেন্স অর্থাৎ আত্মবিশ্বাস। আমার শ্রেষ্ঠতম কিছু অভিজ্ঞতার মধ্যে এ চারটা দিন উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে সারাজীবনের জন্যে।

আমার বাবা খুব অসুস্থ, তার হার্টে পেসমেকার লাগানো হয়েছে। স্পন্ডিলাইটিসও আছে তার। কোর্সের ৩য় দিন বিকেল বেলায় অন্যকে নিরাময় করার হিলিং মেডিটেশনে আমি আমার বাবাকে নিয়ে এসেছিলাম। ক্লাসের পর বাসায় গিয়ে তাকে ব্যথার কথা জিজ্ঞেস করতাই তিনি জানানেন, সকালে বেশ ব্যথা থাকলেও বিকেলের পর থেকে আর ব্যথা টের পাচ্ছেন না। আমার তখন মনে হলো এ কোর্সটা আরও আগে করলে হয়তো আমার বাবাকে আরও সুস্থ করে তুলতে পারতাম। আমার জীবনের অনেক ক্ষেত্রে যেসব সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগেছি সেগুলোকে এড়াতে পারতাম।

প্রজ্ঞার মেডিটেশনটি আমার ভালো লেগেছে। পারিবারিক মেডিটেশনেও হয়েছে অদ্ভুত অনুভূতি। পরিবারের সবাইকে এভাবে অনুভব করার অভিজ্ঞতা সত্যিই অবর্ণনীয়। কোর্সের প্রতিক্ষেত্রেই আমার মনে হয়েছে নতুন থেকে নতুনতর অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করছি। এত সহজে মাত্র ৪ দিনে কীভাবে সবকিছু শিখে গেলাম, এবং আমার দ্বিধাশ্রুতার অভ্যাসটা কীভাবে এত দ্রুত চলে গেল, তা ভেবে অবাক লাগছে। আমি মনে করি, আমি আমার জীবনের সঠিক কোনো সিদ্ধান্ত যদি নিয়ে থাকি, তবে তা হলো এই মেডিটেশন কোর্সটি করা।

[অভিনেত্রী তারিন ১৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

রিজুভিনেশন কোর্স

আগামী ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর, ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে রিজুভিনেশন কোর্স। দু’দিনের এই কম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন কোর্স-এর আসন সংখ্যা সীমিত। তাই প্রবেশপত্র দ্রুত সংগ্রহ করে নেয়ার জন্যে সকল কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটকে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

কোয়ান্টাম মেথড প্রয়োজন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে

ড. তাসলিমা মনসুর

বাড়ির নাম ছিলো ‘চাঁদের হাট’। মরহুম জাস্টিস আবু মোহাম্মদ আবদুল্লাহ তার স্ত্রী চাঁদ আর চৌদ্দ সন্তানকে ঘিরে বাড়ির নাম রেখেছিলেন ‘চাঁদের হাট’। সেই চৌদ্দ জনের একজন বাবা-মায়ের আদরের ‘পরীমা’; আজকের তাসলিমা মনসুর- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা ডীন।

জীবন তাকে দু-হাত ভরে দিয়েছে। ইতিবাচক মানসিকতায় বাবা-মায়ের ছায়ায় বেড়ে ওঠার সুযোগ তিনি আকর্ষণ উপভোগ করেছেন। তাই আত্মবিশ্বাসী এই মানুষটি জীবনের কোনো বাঁকেই হাল ছেড়ে দেন নি। সেই ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ বাবা মারা যান। ‘চাঁদের হাট’ নেমে আসে অমাবস্যার কালো ছায়া। সাংঘাতিক কষ্টের সেই দিনগুলোতে নিজ বাড়ি ছেড়ে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। এতগুলো ভাই-বোনের বড় পরিবার দেখে সবাই মুখ ঘুরিয়ে নিলেও বাবার শেখানো ইতিবাচক জীবন-চেতনা এবং অবিচল বিশ্বাসই আস্থা যুগিয়েছে। ঐ সময়ের সপ্তম শ্রেণীর তাসলিমা এরপর কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি. পাশ করেছেন মানবিক বিভাগ থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদ থেকে প্রথম শ্রেণীতে অনার্স এবং মাস্টার্স কমপ্লিট করেছেন। ১৯৮৭ সালে আইন বিভাগে পার্ট-টাইম লেকচারার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৯৪ সালে ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন-এর SOAS অর্থাৎ স্কুল অব ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ থেকে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রী লাভ করেন ইসলামিক ল’-এর উপর। সময় পরিক্রমায় ২০০২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা ডীন হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেন। ৫৪টি ইনকোয়ারি কমিটির মেম্বর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে। তার বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্রিকায়, জার্নালে। একটি বই বেরিয়েছে, আরো একটি বেরানোর অপেক্ষায়।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে সমাজের প্রতি তার কমিটমেন্ট পূরণ করে যাচ্ছেন। আর পরিবার জীবনে স্বামী ইঞ্জিনিয়ার এ.আই.এম. মনসুর, মেয়ে তানজিলা মনসুর (ব্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত) এবং স্কুল পড়ুয়া ছেলে তাহমিদ মনসুরকে নিয়ে তার সুখের নীড়। কিন্তু জীবনতো নদীর মতো, সেখানে জোয়ার যেমন আছে তেমনি আছে ভাটা। আছে চর পড়ে নদীর গতি স্তিমিত হয়ে যাওয়া। তাই কর্মক্ষেত্রে এবং ব্যক্তিজীবনে সফল এবং সুখী এই মানুষটি ধাক্কা খেলেন হঠাৎ স্বামীর ভয়াবহ অসুস্থতায়, নিজের ডীনশীপ চলে যাওয়ার বেদনায়। সকল বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীর জন্যে প্রায় দু’বছরের একান্ত প্রচেষ্টায় আইন অনুষদের পৃথক ভর্তি পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করে দেয়ার আনন্দ তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে উপভোগ করতে পারলেন না। কেননা একদিকে পরিবার নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি, অন্যদিকে ডীন হিসেবে আরো কিছুদিন দায়িত্ব পালন করতে না পারার বেদনা তাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। এমন মুহূর্তে এক ছাত্রের মাধ্যমে খোঁজ পেলেন কোয়ান্টাম মেথডের। নিজের বহু গুরুত্বপূর্ণ কাজ সরিয়ে রেখে স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে কোর্স করলেন ১৭১ ব্যাচে এবং অকপটে স্বীকার করলেন- “আমার জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় চারটি দিন”। তিনি এ-ও বললেন, “ছাত্ররাও শিক্ষকদের কিছু দিতে পারে- এটা শিখেছি কোয়ান্টামে এসে।”

কোর্স করার পর এখন তার স্বামী সম্পূর্ণ সুস্থ। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে সামলে নিয়েছেন গুলশানের সেই বিশাল প্রজেক্ট; যার দুশ্চিন্তায় স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

ডীনশীপ না থাকার আক্ষেপ, সংসার-স্বামী-সন্তান নিয়ে দুশ্চিন্তা এখন আর নেই। ভারমুক্ত মন নিয়ে কাজ করতে পারছেন ডিপার্টমেন্টে। কলিগদের সাথে প্রাণ খুলে মিশতে পারছেন। কারণ মেডিটেশন তাকে দিয়েছে আত্মবিশ্বাস; যে কোনো বিষয়কে সহজ, সাবলীল ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণের মানসিকতা। সংসারে ফিরে এসেছে শান্তির ফল্গুধারা। মেডিটেশনের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠেছেন তার মেয়ে, ভাই (নিটোল মটসের চেয়ারম্যান), ভাবী এবং বোনরা। অমোঘ নিয়তি মৃত্যুর কোলে হারিয়ে যাওয়া বাবা-মা, ভাইকে পারিবারিক মেডিটেশনের মাধ্যমে নতুন করে অনুভব করার আনন্দে তিনি চোখের জলে ভেসেছেন।

দেশকে তিনি ভালবাসেন। দেশের ঐতিহ্য, সভাবনা ইত্যাদি সম্পর্কে তার বিশ্বাসের প্রতিফলনই তিনি দেখেছেন কোর্সের বক্তব্যে। তার ছাত্র-ছাত্রীদের



তিনি উদ্বুদ্ধ করেন লেখাপড়া শেষ করে দেশেই ক্যারিয়ার গড়তে। সে কারণেই আর্কিটেকচারে অসাধারণ রেজাল্ট করা মেয়েকে তিনি দেশেই ক্যারিয়ার গড়তে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

তিনি বলেন, এখনকার অস্থির, হতাশ তরুণ সমাজকে সঠিক দিক-নির্দেশনা এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে উদ্বুদ্ধ করার যে কাজ কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন করছে তা খুবই সমরোপযোগী। দেশপ্রেম এবং মানবতার সেবায় তারা যে নিজেদের মেধা-শ্রম-সময়কে কাজে লাগাতে পারে- এ ধারণা এবং সুযোগ করে দেয়ার জন্যেও ফাউন্ডেশন প্রশংসার দাবিদার।

ড. তাসলিমা মনসুর বলেন, আসলে একজন মানুষের কাজ হলো স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করা, যা তখনই সম্ভব যখন সে আত্মবিশ্বাসী হবে। আর এজন্যে প্রয়োজন দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম মেথড চর্চা করা। শুধু তা-ই নয়, সমাজের প্রত্যেক ক্ষেত্রে শান্তি আনতে, নিজেদের মধ্যে সহমর্মিতা আনতেও কোয়ান্টাম মেথড তথা মেডিটেশন প্রয়োজন প্রতিটি ক্ষেত্রে। যে ইতিবাচক চিন্তা তিনি নিজে ধারণ করেছেন তার চারপাশের মানুষদেরও এখন তাতে উদ্বুদ্ধ করছেন স্বভাবসুলভ দৃঢ় কণ্ঠে।

বিশেষত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে যত এই ইতিবাচক শিক্ষার বাণী, জীবন যাপনের বিজ্ঞানের বাণীকে ছড়িয়ে দেয়া যাবে, ততই তা ভবিষ্যত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ তৈরির স্বপ্নকে দ্রুত সফল করবে। সেজন্যেই আমার প্রস্তাব, প্রাইমারি পর্যায় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার সকল স্তরে মেডিটেশনকে পাঠ্যক্রমে ঢোকানো হোক, বলেন তাসলিমা মনসুর।

একজন নারী এবং আইনবিদ হিসেবে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তার কমিটমেন্ট সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ সচেতন। তিনি মনে করেন ইসলামে নারীদের মর্যাদা ও অধিকারকে যেভাবে স্বীকৃত ও বাস্তবায়িত করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে নারী অধিকার রক্ষার সবচেয়ে উপযোগী উপায়। তার পিএইচডি গবেষণার বিষয়ই ছিলো ‘ইসলামিক ল’ এন্ড উইমেন’। ড. তাসলিমা মনসুর শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্যে ২০০৩ সালে লাভ করেন ‘অনন্য শিক্ষা পুরস্কার’।

তার মতে, মেয়েরা যদি পরিবারের কাছ থেকে আত্মবিশ্বাস এবং সহযোগিতা পায়, তাহলে তারা অনেক বড় কিছু করতে পারে। আমাদের পরিবারগুলোতে তাই এখন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটতে হবে। এজন্যেও কোয়ান্টামের চেতনা রাখতে পারে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা।

পারিবারিক ও ব্যক্তিজীবনে পরিপূর্ণ মানুষটি সবশেষে মুক্তমনে স্বীকার করেছেন তার এতদিনকার প্রাপ্তির পেছনে কোনো টার্গেট ধরে কাজ করেন নি। কিন্তু মেডিটেশন কোর্স করার পর তিনি এলোপাথাড়ি কাজের পরিবর্তে টার্গেট ঠিক করে কাজ করছেন। নতুন করে মনছবি নির্মাণ করেছেন এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি বিশ্বাস করেন- এই মনছবি সফল হবেই। কেননা টেনশনমুক্ত হয়ে স্থিরভাবে কাজ করা এবং সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার ক্ষমতাকে তিনি আরও শাণিত করতে পেরেছেন এখন। তিনি মনে করেন- মেডিটেশনই পারে মানুষের দূরদৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টিকে সজাগ করতে, তাই সমাজের সর্বস্তরে এর প্রচলন আবশ্যিক।

প্রতিবেদক : শম্পা রায়

গণমাধ্যমে মেডিটেশন চর্চাকারীদের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভা

গত ২ মার্চ, মঙ্গলবার সকাল ১১টায় কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে অনুষ্ঠিত হয় গণমাধ্যমে মেডিটেশন চর্চাকারীদের অংশগ্রহণে এক ঘরোয়া মত বিনিময় সভা।

বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব ফওজুল করিম (তারা ভাই)-এর সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও টেলিভিশনে কর্মরত প্রায় ৩৫ জন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ও শুভাকাঙ্ক্ষী মিডিয়াব্যক্তিত্ব। তারা মেডিটেশন সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। আমার দেশ-এর চিফ রিপোর্টার জনাব আহমেদ নূরে আলম বলেন, কোয়ান্টাম মেথড করে আমি এবং আমার পরিবার অনেক উপকৃত হয়েছি। আমার সন্তানদের দেখে উপলব্ধি করি উর্চতি বয়সের ছেলে-মেয়েদের সমস্যাগুলো তারা সহজেই এড়াতে পেরেছে মেডিটেশন চর্চার ফলে। আর সাংবাদিকতা পেশার জন্যে এটা আরও উপযোগী।

এই গুরুত্ব উপলব্ধি করেই কাজী রওনাক হোসেন বলেন, যত ব্যস্ততাই থাকুক, কোর্স করার পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি মেডিটেশন ছাড়ি নি, তা ৫ মিনিটের হলেও। মনছবি মিসাইলের মতো কাজ করে এ বাণীর অসংখ্য প্রমাণ পেয়েছি। একবার বেশ কড়াডাকড়ির সময় আমেরিকার ভিসা পেতে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আমাকে এতটাই সাহায্য করলো যে, ইমিগ্রেশনে আমি যে লোককে দেখলাম তার চেহারা আগেই কল্পনায়

এসেছিলো এবং তিনি আমার কাগজ-পত্র না দেখেই ভিসা দিয়ে দিলেন।

তবে সাংবাদিকতার ব্যস্ততাই কারও কারও নিয়মিত চর্চাকে ব্যাহত করেছে। বাংলাদেশ টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক মিসেস খুরশিদা হক বলেন, কোর্স করে আমার মাইগ্রেন ভালো হয়ে গিয়েছিলো। তবে নিয়মিত চর্চা করতে না পারলেও কোর্সে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি যা আমাকে যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সহজ রেখেছে। আমার মেয়েরাও এই কোর্স করেছে।

যুগান্তরের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার কাজী আবদুল হান্নান বলেন, ব্যস্ততার কারণে নিয়মিত করা না হলেও কোর্স করার পর থেকে আজও সমস্যাগ্রস্ত হলে মনে হয় একটা বিদ্যার চর্চা করেছিলাম যা ছিল প্রো-অ্যাকটিভ দৃষ্টিভঙ্গি ও স্থির বিশ্বাস নিয়ে কাজ করার প্রেরণা। গত ১০ বছরে এ শিক্ষাই আমাকে সাফল্যের পথে চালিত করেছে।

অনেকটা একই ভাষায় বললেন বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার আনিসুর রহমান। সংকট বা সমস্যা ভারাক্রান্ত হলেই মেডিটেশনের দ্বারস্থ হই। এরকম মতবিনিময় অনুষ্ঠান নিয়মিতভাবে আয়োজন করলে চর্চায় আরও সুবিধে হতো। আর মেডিটেশন শুধু জাগতিকতার জন্যে নয়, আত্মিক সাধনার পথও খুলে দেয়।

এনটিভির বার্তা সম্পাদক খায়রুল আনোয়ারও মতবিনিময় অনুষ্ঠান নিয়মিত করার উপর জোর দেন। কেননা তার মতে এটা সাংবাদিকদের প্রো-অ্যাকটিভ হবার শিক্ষাকে মজবুত করবে।

জনকণ্ঠের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার রেজোয়ানুল হক রাজা বলেন, নিয়মিত চর্চা না করলেও মেডিটেশনের প্রতি আমার ভালবাসা যে বিন্দুমাত্র কমে নি তা টের পেলাম যখন এ অনুষ্ঠানে আসার আমন্ত্রণ পেয়ে খুবই আত্মহ বোধ করলাম।

দিনকালের সিনিয়র রিপোর্টার মিসেস মাহমুদা চৌধুরী বলেন, কোর্স করে মনে হলো এত শান্তি, এত তৃপ্তি আমি এর আগে কখনো পাই নি। ক্রোধ, ক্ষোভ, টেনশন, অস্থিরতা থেকে মুক্ত হয়েছি। নিজে পাওয়ার বদলে অন্যকে দেয়ার মানসিকতা অর্জন করেছি যা এখনও আমাকে তৃপ্তি দেয়।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার বার্তা সম্পাদক গোলাম মহিউদ্দিন খানও বলেন, মেডিটেশনে আত্মনিমগ্ন হওয়ার মাধ্যমেই একজন মানুষ নিজের ভুল-ভ্রান্তিগুলোকে শনাক্ত করতে পারে এবং অন্যের প্রতি সহমর্মিতা ও ভালবাসা জগাতে পারে।

ইনকিলাবের সহকারি সম্পাদক, এ বছর একুশে পদক প্রাপ্ত কবি আবদুল হাই শিকদার মেডিটেশনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছেন বেশ আগে। সৃজনশীল মানুষদের নানারকম ব্যতিক্রমী ভাবনায় আচ্ছন্ন হবার মতো তিনিও একবার জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে আত্মহত্যার ব্যাপারে আত্মহী হয়েছিলেন। আর সেসময়ই পরিচয় গুরুজীর



মতবিনিময় অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণ রাখছেন দৈনিক বাংলার বার্তা সম্পাদক ফওজুল করিম (তারা ভাই)। তার ডান পাশে উপবিষ্ট গুরুজী, ইত্তেফাকের সহকারি সম্পাদক জিয়াউল হক, আমার দেশ-এর চিফ রিপোর্টার আহমেদ নূরে আলম ও শিল্পপতি কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ। বাম পাশে আছেন বাসস-এর বার্তা সম্পাদক শাহজাহান মিঞা ও মাসিক সরগাম-এর সম্পাদক-প্রকাশক কাজী রওনাক হোসেন।



মতবিনিময় অনুষ্ঠানে আলোচনা করছেন কবি আবদুল হাই শিকদার।

সঙ্গে। এরপর ধীরে ধীরে তিনি এই ভাবনা থেকে সরে এসে ইতিবাচক হয়ে ওঠেন। এখন তার উপলব্ধি-দৃষ্টিভঙ্গি বদলান, জীবন বদলে যাবে। এখন আমি মানুষকে ক্ষমা করতে পারি। জীবনের প্রতি মায়া এবং মোহ দুটোই বেড়েছে। এমন কি একবার সন্তানসীদের আক্রমণে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মৃত্যুর হাতছানি উপেক্ষা করেছি এই আশাবাদ দিয়ে।

ইত্তেফাকের সিনিয়র রিপোর্টার শাহজাহান সরদার তার কৃতি পুত্রদের উদাহরণ টেনে বলেন, আজকের তরুণ প্রজন্মকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিতে এই কোর্স খুবই উপযোগী যার উপস্থাপন শৈলীও অসাধারণ। সহকারি সম্পাদক জিয়াউল হক বলেন, দেশকে ভালো কিছু দেয়ার লক্ষ্যে একটি গতিশীল সংগঠন হিসেবে কোয়ান্টাম যে ভূমিকা রাখছে তা খুবই ইতিবাচক।

বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার বার্তা সম্পাদক শাহজাহান মিঞা বলেন, আমি প্রায়শই আত্মমগ্ন হওয়ার চেষ্টা করি। মনের এই সাধনাই আসলে যোগাতে পারে আত্মবিশ্বাস ও আত্মশুদ্ধি।

সভাপতির সমাপনী বক্তব্যে দৈনিক বাংলার বার্তা সম্পাদক সর্বজন শ্রদ্ধেয় জনাব ফওজুল করিম (তারা ভাই) বলেন, আমি খুব স্পষ্টভাবেই বলি ও বিশ্বাস করি, আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনো সাফল্যই মনোসংযোগ বা ধ্যানমগ্নতা ছাড়া আসে নি। এটা প্রতিদিনের জীবনেরই একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ। যা ছাড়া কোনো মুক্তি বা উন্নতি নেই।

মেডিটেশন কোর্সের বিভিন্ন ব্যাচের গ্রাজুয়েট এবং আগ্রহী মিডিয়া ব্যক্তিত্বদের নিয়ে প্রথমবারের মতো এ মতবিনিময় সভার আয়োজন অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

সভায় লামা মেডিটেশন রিসর্টের ব্যাপারে সাংবাদিকদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ সৃষ্টি হয়। পরে ২৮ থেকে ৩০ মার্চ প্রায় ৩৫ জন সাংবাদিক, কবি ও সাহিত্যিক লামা সফর করেন।

গ্রহণা : রাবিয়া নাজরীন

প্রথম সারিতে বাঁ থেকে বাসসের বার্তা সম্পাদক গোলাম মহিউদ্দিন খান, ইত্তেফাকের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার শাহজাহান সরদার, জনকণ্ঠের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার রেজোয়ানুল হক রাজা, বাসসের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার আনিসুর রহমান, যুগান্তরের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার কাজী আব্দুল হান্নান ও এনটিভির বার্তা সম্পাদক খায়রুল আনোয়ার।

(নিচে) ল্যাব পরিদর্শনকালে অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন দিনকালের সহকারি সম্পাদক আমিনুর রহমান সরকার ও দৈনিক ইত্তেফাকের সহকারি সম্পাদক ফাইজুস সালেহীন (বাঁ থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় জন) এবং সর্ব ডানে বিটিভির বার্তা সম্পাদক মিসেস খুরশিদা হক।



প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

আমার কোনো ব্যথা নেই মো. মোতাহার হোসেন মিয়া

মেরদগুর ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলাম। বিভিন্ন প্রফেসরও দেখিয়েছি। একজন বললেন, আপনি কিছু দিনের মধ্যে প্যারালাইজড হয়ে যাবেন। তখন থেকে মানসিক ভাবে ভেঙে অর্ধমৃত হয়ে পড়ি। কিন্তু এখানে এসে অনুভব করলাম, কোথায় আমার ব্যথা। এখন আমি পরিপূর্ণ সুস্থ। আগে সারাদিন অফিস করে বাসায় যাবার পর মেজাজ চড়া হয়ে থাকতো। অকারণে সবাইকে বকাঝকা করতাম। কিন্তু এখন আমার বেশ পরিবর্তন এসেছে যা আমার স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করছে। এখন তাদের বকাঝকা করি না। আমার জীবনের এটি একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কোর্স।

[মো. মোতাহার হোসেন মিয়া, বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেমসের প্রকৌশলী, ১৬৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ওষুধ থেকে মুক্তি

ডা. জোহরা জামিলা খান

গত ২০ বছর ধরে মাইগ্রেনে ভুগছি। দিনে ৫টা এবং রাতে ৬টা করে ওষুধ খেতাম প্রতিদিন। পরিস্থিতি এমন ছিলো যে, আমাকে দেখলে ওষুধের

দোকানের লোকেরা খুশি হয়ে উঠতো। কেননা আমি বেশি বেশি ওষুধ কিনতাম। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করলাম, গত চারদিনে কোনো ওষুধ না খেয়েই আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি।

এছাড়া অহেতুক রাগ করতাম আর ভাবতাম যাদের রাগ নেই তাদের আবার আত্মসম্মান আছে নাকি? এখন আমার সে ভুল ভেঙেছে। এখন আমি জানি— রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন।

[ডা. জোহরা জামিলা খান, চিকিৎসক, বিএসএমএমইউ-এ কর্মরত। ১৬৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি

ইফতেখার আহমেদ

একজন বলছেন আমি ভালো নেই, মাথা ব্যথা। তিনি সত্যি কথা বলছেন— এটা এক রকম দৃষ্টিভঙ্গি। আবার অন্যজন বলছেন— ‘আলহামদুলিল্লাহ, আমি ভালো আছি।’ মাথা ব্যথার দিক থেকে হয়তো



তিনি ভালো নেই কিন্তু তার দৃষ্টিভঙ্গি হলো— স্রষ্টা আমাকে সব দিক থেকে ভালো রেখেছেন। আমার প্রশ্ন ছিলো— কোনটা গ্রহণ করবো? এ কোর্সে এসে তার উত্তর পেয়েছি। ‘ভালো আছি’ বলবো ভালো থাকার প্রত্যাশায়। কেননা নেগেটিভ দৃষ্টিভঙ্গি নেগেটিভ বাস্তবতা এবং পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গি পজিটিভ বাস্তবতা সৃষ্টি করে। দৃষ্টিভঙ্গির এ ধারণাটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিতে পারে। এ জন্যেই বলা হয়— দৃষ্টিভঙ্গি বদলান জীবন বদলে যাবে।

[ইফতেখার আহমেদ, মেকানিক্যাল শেষ বর্ষ (বুয়েট), ১৭৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ডাক্তার বলেছিলেন—

আর হাঁটতে পারবো না

রিজিয়া বেগম

আমি যে ডায়াসে এসে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারবো এটা ছিলো অবিশ্বাস্য। ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন— বাকি জীবন আপনি আর হাঁটতে পারবেন না। পাঁচজন অর্থোপেডিক দেখিয়েছি, সবাই বলেছেন— আমি ভালো হবো না। সুস্থ পা নিয়ে যারা হেঁটে বেড়ায় তাদের দেখে হাঁটতে না পারার কষ্টে আমি অনেক কেঁদেছি।



কোর্সে প্রথম দিন যখন আসি, গুরুজীর প্রত্যয় আর সাহসপূর্ণ একটি কথা ছিলো— পায়ে ব্যথা তো কী হয়েছে ওটা পা বেয়ে চলে যাবে। সম্পূর্ণরূপে আমি বিশ্বাস ফিরে পেলাম। এরপর বিকেলে যখন পায়ে ব্যথার কথা জিজ্ঞেস করলেন, অবাক হয়ে দেখলাম সত্যিই ব্যথা অনেক কমে গেছে। অবশেষে ৪র্থ দিন আমি লাঠি ছাড়াই ডায়াসে উঠে এসেছি। আমি বারো আনা ভালো হয়ে গেছি।

[রিজিয়া বেগম, চাকরিজীবী, ১৭৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

অসীম সম্ভাবনা

ফারজানা হক

এসেছিলাম অনেক মানসিক কষ্ট, শারীরিক সমস্যা আর সিদ্ধান্তহীনতা নিয়ে। আর আজকে এখান থেকে বেরিয়ে যাবো আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে, আত্ম আবিষ্কারের আনন্দে হুংকার দিয়ে।

জন্মের পর থেকে

চারপাশের নেতিবাচক পরিবেশে বড় হতে হতে আমাদের ভেতরের শক্তিকে হারিয়ে ফেলি। এ কোর্সে এসে নিজের মধ্যে স্রষ্টা প্রদত্ত অফুরন্ত সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করেছি। একে কাজে লাগিয়ে নিজের উন্নতি এবং সুন্দর পৃথিবী গড়তে নিজের অবদান রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করছি।

[ফারজানা হক, শিক্ষার্থী, ১৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

তারা এখন স্বাবলম্বী

ফেরদৌসী সুলতানা, নাজমুন নাহার ও শম্পা রায়— কোয়ান্টাম পরিবারের তিন কন্যা ছাত্রী। সদ্য সমাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষে তিন জনই প্রবেশ করেছেন কর্মজীবনে। পেশা হিসেবে বেছে নিয়েছেন শিক্ষকতা।

“পড়াশোনার পাট শেষ।

ভালো রেজাল্ট থাকা সত্ত্বেও

লবিং না থাকার কারণে চাকরি হচ্ছিলো না। ক’দিন পর আবাসিক হল ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু গুরু দিক-নির্দেশনা ও ফাউন্ডেশনের সাথে একাত্মতা নতুনভাবে ভাবতে শেখালো। নিয়মিত মেডিটেশন, মনছবি ও প্রতিটি কাজে অংশগ্রহণ ত্বরান্বিত করেছে আমার সাফল্যকে। অল্পদিনেই ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভিস (UODA) এ শিক্ষক হিসেবে যোগদান করলাম। পাশাপাশি আবাসন সমস্যারও সমাধান হয়ে গেল।”— এভাবেই তার অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন ফেরদৌসী সুলতানা।

নাজমুন নাহার ও শম্পা রায় দু’জনেই তাদের মাস্টার্সের ফলাফল প্রকাশিত হবার



বাম থেকে শম্পা রায়, নাজমুন নাহার ও ফেরদৌসী সুলতানা

আগেই কলেজ অব ডেভেলপমেন্ট অলটারনেটিভিস (CODA)-এ শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। ফাউন্ডেশনের প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ, নিয়মিত মেডিটেশন, মাটির ব্যাংকে অর্থদান তাদের প্রাপ্তিকে সহজলভ্য করে তুলেছে। ফলে পরীক্ষা, ভাইভা, ডেমনস্ট্রেশন— সব ক্ষেত্রেই তাদের পারফরমেন্স ছিলো উল্লেখ করার মতো।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এদের প্রত্যেকের জীবন সুন্দরভাবে সাজাতে সহায়তা করেছে। জীবনকে করেছে অনেক সহজ ও সাবলীল। কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততার পাশাপাশি তারা এখন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমেও উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছেন।

প্রতিবেদক : সাইফুদ্দিন হাওলাদার

মেডিটেশন এবং আমেরিকায় পড়াশোনা

লস্কর মোহাম্মদ কাশিফ

মে মাস, ২০০৩। এক বৃষ্টিমুখর দিনে স্থানীয় গীর্জায় ইয়েল ইউনিভার্সিটির সমাবর্তন অনুষ্ঠান

চলছে। এক এক করে নাম ডেকে সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে। আমার নাম ডেকে ঘোষণা করা হলো— উইনার অব দ্য দে' ফরস্ট প্রাইজ। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কারণ দে' ফরস্ট প্রাইজ শুধু পদার্থবিজ্ঞানে বর্ষসেরা শিক্ষার্থীকে দেয়া হয়। অপ্রত্যাশিত এ সাফল্য ছাড়াও আমেরিকায় পড়াশোনা করার সময় গত প্রায় পাঁচ বছর ধরে মেডিটেশন ও ইতিবাচক চিন্তা আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছে।

১৯৯৯ সালের আগস্ট মাসে আমেরিকায় আসি আন্ডারগ্রাজুয়েট লেভেলে পড়বার জন্যে। আমেরিকায় জীবনযাত্রার সাথে খাপ খাওয়াতে প্রথমে অসুবিধা হয়েছে। কিন্তু আমার সবসময়ের



অটোসাজেশন ছিলো, জি.পি.এ. (৪ এর মধ্যে) ৩.৯ এর উপরে থাকবে। দ্বিতীয় বর্ষের শেষে পরীক্ষার আগে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে থাকায় প্রস্তুতি ভালো হলো না, দুটো বিষয়ে বি+ পেয়ে জি.পি.এ. নামলো ৩.৯ এর নিচে। কিছুটা হতাশ হই। কিন্তু পরে মায়ের সাথে টেলিফোনে কথা হলে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, সাময়িক ব্যর্থতা কোনো ব্যর্থতা নয়, বরং চূড়ান্ত মনোবলিতের স্থির বিশ্বাস রাখতে হবে। আমি ভুল শুধরে আবার পড়াশোনায় পূর্ণ মনোযোগ দিলাম। ৩য় ও ৪র্থ বর্ষে আমি ইয়েল সোসাইটি অব ফিজিক্স স্টুডেন্টসের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হই।

সাফল্যের সাথে গ্রাজুয়েশন করার পর

পি.এইচ.ডি. করার জন্যে, স্ট্রাটর অশেষ রহমতে, মনোবলি অনুযায়ী বিশ্বের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হার্ভার্ড এবং এম.আই.টি-তে ভর্তির সুযোগ পেয়ে হার্ভার্ডের অফার গ্রহণ করি।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে আসার সময়ে আমার স্যুটকেস হারিয়ে যায়। যার মধ্যে ছিলো গত চার বছরের অমূল্য ট্যাক্স রিটার্নের কপি এবং এক হাজার ডলারের কাপড় ও বই। মা জানার পর নিয়ত করেন যে, স্যুটকেস পাওয়া গেলে মাটির ব্যাংকে ৫০০০ টাকা দেবেন এবং আমিও একশো ডলার মানত করি। আশ্চর্য! সেদিন বিকেলেই আমি পোস্টকার্ড পেলাম দু'হাজার মাইল দূরের কলোরাডো অঙ্গরাজ্যের এক হোটেল মালিকের কাছ থেকে। যিনি আমার স্যুটকেসটি পেয়েছেন। অথচ এর আগের আড়াই মাস খোঁজাখুঁজি করে, এমনকি কুরিয়ার কোম্পানির গুদামঘরে গিয়েও কোনো খোঁজ পাই নি। স্যুটকেস পাবার পর দেখলাম যে, কাগজপত্র সব ঠিকঠাক অবস্থায় আছে।

এখনো চলার পথ অনেকটা বাকি। চূড়ান্ত মনোবলি বাস্তবায়নের পথে বিভিন্ন বাধা আসতেই পারে। কিন্তু মেডিটেশন, মনোবলির সাথে সম্পৃক্ততা এবং কঠোর পরিশ্রমের সমন্বয় ঘটিয়ে আমি একদিন গন্তব্যে পৌঁছবো এ আমার বিশ্বাস।

[লস্কর মোহাম্মদ কাশিফ, আমেরিকার হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে ফিজিক্সে পি.এইচ.ডি. করছেন]

নতুন আলো দেখছি

মো. রকিবুল হাসান

আমি এক ব্রোকেন ফ্যামিলির সন্তান। সে কারণেই এক সময় বাজে বন্ধুদের পাশায় পড়ে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়েছিলাম। এছাড়া ছিলাম অত্যন্ত রাগী ও অগোছালো। ভাগ্যক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে যাই। কিন্তু হতাশা আবার নতুন করে পেয়ে বসলো। এ কোর্সে এসে আমি আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। আমার বিশ্বাস, জীবনটা এখন নতুন উদ্যমে সাজাতে পারবো।

[মো. রকিবুল হাসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি অনার্সের ছাত্র, ১৬৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



ধূমপান ত্যাগের আশ্চর্য টেকনিক অভিজিৎ ভট্টাচার্য

আমি ধূমপায়ী ছিলাম। কোর্সের ১ম দিন খুব একটা বিশ্বাস করতে পারি নি যে, এটা ত্যাগ করতে পারবো। একমাস আগে একবার ছেড়েছিলাম। এক সপ্তাহ বন্ধ ছিলো, আবার ধরেছি। কিন্তু গতকাল কোর্সের ৩য় দিনে ধূমপান ত্যাগের টেকনিক শেখানো হলো, আমি আটোসাজেশন দিলাম— ধূমপানের সময় আমার বমি হবে। গতকাল রাতে বাসায় ফেরার সময় সিগারেট



টানছিলাম— সত্যিই আমার বমি এলো। বাসায় ফিরে আবার নিচে এসে আরেকটা ট্রাই করলাম, পারলাম না। আজকে সকালে একটা সিগারেট ধরলাম, বমি এলো। বুঝলাম আমি ছাড়তে পারবো। আগে মনের ওপর জোর করে বিরত হতে চেয়েছি। তাই বেশিদিন পারি নি। কিন্তু এ দু'দিন আমার ভেতরটাই আর সিগারেট গ্রহণ করতে পারছে না।

[অভিজিৎ ভট্টাচার্য, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, ১৭৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

অস্থিরতা মুক্তির পথ

আহমেদ ইউসুফ লিটন

ছোটবেলায় আমি পরিপার্শ্ব থেকে কিছু নেগেটিভ কথা শুনতাম। সেই সব নেগেটিভ কথা আমার জীবনকে প্রভাবিত করেছে। পরবর্তীতে এক ধরনের অস্থিরতা নিয়ে শূন্যতা পূরণের আশায় আমি মাজারে, আশ্রমে, পার্কে ছুটে বেড়িয়েছি। কিন্তু সে শূন্যতা পূরণ হয় নি। এ কোর্সের মাধ্যমে মনে হলো আত্মিক শূন্যতা পূরণের একটা পথ পেয়ে গেছি।

[আহমেদ ইউসুফ লিটন, সোনারগাঁও জাদুঘরে কর্মরত, ১৭৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



রাগ নিয়ন্ত্রণ করেছি

নুসরাত আজিজ

কোর্স করে জীবনে প্রথম বারের মতো আমি বাচ্চাদের সাথে রেগে কথা বলি নি। যা মেডিটেশনের ফল। কোর্সে বড় প্রাপ্তি হলো নেতিবাচক কথা থেকে মুক্তি। সেই সাথে নিজের রাগ

নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি। এ কোর্সটি আগে করা থাকলে জীবনে অনেক অপ্রীতিকর ঘটনা থেকে বেঁচে যেতাম। আমি বিশ্বাস করি, মানুষের মনোবৈদিক বিকাশের জন্যে এটি একটি অনন্য কোর্স।

[নুসরাত আজিজ, চট্টগ্রাম ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষিকা, ১৬৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



ওজন কমেছে ১০ কেজি

আয়েশা খাতুন

যোগ ব্যায়াম দেহকে সুস্থ রাখে জানলেও নিজে করতাম না। প্রায় দু'বছর প্রচণ্ড কোমর ব্যথায় ভুগছিলাম। ডাক্তার বেড-রেস্টে থাকতে বললেন। তখন মা-জীর পরামর্শে কোয়ান্টাম ব্যায়াম শুরু করি। মনে হতো এত ব্যথা কি ব্যায়াম করলে যাবে? কোমর, হাঁটু ভেঙে বসতে পারি না। ওজন ৮৩ কেজি। হাঁটলে পায়ের তলায় ফোসকা পড়ে যেত। তবু কষ্ট করে নিয়মিত ব্যায়াম করতাম ও হাঁটতাম। আট মাসের চেষ্টা সাধনায় আমার শরীরের ব্যথা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেছে। ওজনও কমেছে ১০ কেজি। এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থভাবে চলা-ফেরা ও কাজ-কর্ম করতে পারি।

[আয়েশা খাতুন, ৮৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



প্রশ্ন : কোরআনে বলা হয়েছে পুরুষগণ নারীদের শাসনকর্তা। তাহলে নারীদের নেতৃত্ব দেয়ার বৈধতা কতটুকু?

উত্তর : নিঃসন্দেহে পুরুষ পরিবারের প্রধান, কারণ তিনি পরিবারের লালনকর্তা। পরিবারের ভরণ-পোষণ করেন তিনি। কিন্তু এই প্রধান বা নেতৃত্ব দেয়ার ব্যাপারটা আপেক্ষিক। কারণ নেতৃত্ব তার কাছেই যায়, যিনি যোগ্য। স্ত্রী যদি স্বামীর চেয়ে বেশি উপার্জন করেন, চিন্তা ভাবনায় বেশি পরিণত হন, তাহলে স্বাভাবিক ধারায়ই মূল নেতৃত্ব তার কাছে চলে যাবে। তিনি হয়তো সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু তা তুলে ধরেন স্বামীর মাধ্যমে। তবে এই নেতৃত্ব একজনকেই দিতে হবে। আর শাসনকর্তা হলে তো অধিকারের স্বীকৃতি দেয়াটা আরও জরুরি। কারণ পরামর্শ ছাড়া শাসনের কাজ হয় না।

কোরআন শরীফের মূল বাণীকে অনুসরণ করতে হলে শুধু অনুবাদকর্মের উপর ভরসা করলে হবে না। কারণ তা তাফসীরকারের নিজস্ব উপলব্ধি দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। সেজন্য পুরো পটভূমিটা সামনে রাখতে হবে, শান্তি ও কল্যাণময়তার দৃষ্টিভঙ্গিকে লালন করতে হবে।

প্রশ্ন : আমি চাই আমার স্ত্রী ও মায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকুক। কিন্তু আমার মায়ের আচরণের কারণে আমার স্ত্রী মাঝে মাঝে খুব বেশি ক্ষেপে যায়। এক্ষেত্রে আমার কী করণীয়?

উত্তর : অনেক পুরুষেরই এই উভয় সংকট হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আপনাকে কুশলী হতে হবে। স্ত্রীকে বোঝান, “মা আর ক’দিন? বৃদ্ধ হয়েছেন। এরপর কর্তৃত্ব তো তুমি একাই করবে। অতএব যতদিন তিনি বেঁচে আছেন, তার আচরণকে ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখার চেষ্টা কর। নিজের মায়ের মতো তার সেবা যত্ন কর। আর এখন মা যা করছেন, তা হয়তো একসময় পুত্রবধূ হিসেবে তার শাশুড়ির কাছ থেকে পাওয়া আচরণেরই প্রতিক্রিয়া। শিক্ষার আলো বধিত একজন মানুষের এ আচরণকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখার দায়িত্ব আমাদেরই বেশি।” এভাবে স্ত্রীকে বোঝান। প্রয়োজনে আপনার মায়ের হয়ে তার কাছে ক্ষমা চান। কিন্তু স্ত্রীর সাথে রাগারাগি করবেন না।

আর আপনার মায়ের সাথে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করবেন। কারণ আপনি যত ভালো ব্যবহার করবেন তিনি তত আশ্বস্ত হবেন যে, ছেলে তারই আছে। তিনিও তার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাতে সচেষ্ট হবেন।

প্রশ্ন : স্বামীর প্রতি শাশুড়ীর মাত্রাতিরিক্ত কর্তৃত্বপূরণগত অসহনীয়। তিনি কোনোভাবেই বুঝতে চান না বিয়ের পর আমার নিজের মতো করে সংসার করবার আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে। মা’কে কষ্ট দেয়া অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলে স্বামীর দিক বিবেচনা করে অশান্তি থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করি। স্বামীর অসহায় দুর্বলতাও কষ্টকর। আমার কী করা উচিত?

উত্তর : শাশুড়ি এবং পুত্রবধূর দ্বন্দের মূল কারণ সামাজিক। আমাদের উপমহাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় একানুবর্তী পরিবারে যতদিন পর্যন্ত কোনো বউ পুত্র সন্তানের মা না হতো ততদিন তার অবস্থান নড়বড়ে থাকতো। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ছেলেকে বলা হয় বংশের বাতি আর মেয়েকে বলা হয়, এ-তো অন্যের ঘরে চলে যাবে। যদিও এখন এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কিছুটা পরিবর্তন এসেছে।

এসমস্ত কারণে মায়ের কাছে ছেলে হলো তার অবস্থান শক্ত করার খুঁটি। এই ছেলেকেই যখন মা বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে আসেন তখন তিনি ভোগেন এক অন্তর্দ্বন্দ্ব। অবচেতনভাবেই তিনি ভাবতে শুরু করেন— এখন হয়তো ছেলের কাছে তার গুরুত্ব কমে

পারিবারিক অবিদ্যা বিষয়ক প্রশ্ন

উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

গেছে। সম্পর্কের টানাপোড়েন এভাবেই শুরু হয়।

শাশুড়িকে এই অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে মুক্তি দিতে বউয়ের ভূমিকাই হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শাশুড়ির চেয়ে বয়সে ছোট হলেও চিন্তাভাবনায় সে আধুনিক। তার উচিত শাশুড়ির মনে এরকম ধারণা তৈরি করা যে, আমি আপনার প্রতিপক্ষ নই। আমি এসে আপনার ছেলেকে ছিনিয়ে নিচ্ছি না, বরং ছেলের সাথে সাথে আমাকেও পাচ্ছেন। এ কথা যদি আপনি শাশুড়িকে বোঝাতে পারেন, তাহলে দেখবেন দূরত্ব এমনিতাই কমে গেছে।

প্রশ্ন : অপশিক্ষা, অশিক্ষা থেকে জাতির নিষ্কৃতির উপায় কী?

উত্তর : উপায় একটাই। প্রথমে নিজেকে অপশিক্ষা, অশিক্ষা, অবিদ্যা থেকে মুক্ত করা। আমরা নিজেকে না বদলে জাতি নিয়ে ভাবনায় ব্যস্ত হয়ে পড়ি।

কোরআন শরীফে একটি আয়াত আছে, আল্লাহ তায়াল্লা ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেরা চেষ্টা করে। কিন্তু কয়েকটি আয়াত একসঙ্গে অনুধাবন করলে এ আয়াতটির মর্মার্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ তায়াল্লা ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেরদের পরিবর্তন আনে ভেতর থেকে। কাজেই জাতি বদলাতে হলে আগে ব্যক্তির ভেতরটা বদলাতে হবে।

প্রশ্ন : আমার ছোট বোনের স্বামী বিয়ের পাঁচ দিন পর থেকে যৌতুকের জন্যে বোনের উপর মানসিক নির্যাতন শুরু করে। একসময় শারীরিক নির্যাতনও শুরু করে। নয় বছরের বিবাহিত জীবনে তাদের ৭ বছরের একটি ছেলে ও ৯ মাসের একটি মেয়ে হয়েছে। মেয়েটির জন্মের পর মারধর আরও বেড়ে গেছে। মেধাবী, শিক্ষিত ও স্বামীর চেয়ে বেশি বেতনে চাকরি করা সত্ত্বেও আমার বোন সমাজের ভয়ে ডিভোর্স নিতে চায় না। সে স্বভাবে খুবই চাপা এবং মানসিকতায় সেকেলে। ওর স্বামীর এত সব অত্যাচারের কথা আমরা জেনেছি মাত্র সেদিন। এখন কি সব জেনে শুনেও ওকে ওর মতই চলতে দেয়া উচিত?

উত্তর : আসলে এক্ষেত্রে আপনাদের সিদ্ধান্ত দেয়ার সুযোগ তেমন নেই। কারণ যে অত্যাচারের কথা শুনে আপনারা ক্ষুব্ধ হছেন, সে অত্যাচারের মাত্রা

যদি অসহনীয় পর্যায়ে হতো তাহলে আপনার বোন নিজেই অনেক আগে ডিভোর্সের সিদ্ধান্ত নিতেন। কারণ তার নিজের উপার্জন ক্ষমতা আছে, স্বামী ছাড়াও একা চলবার আর্থিক ভিত্তি আছে। কিন্তু তারপরও দীর্ঘ নয় বছর তিনি সংসার করছেন; এর দু’টো কারণ হতে পারে। এক, স্বামীর হাতে নিগূহীত হলেও তা হয়তো তার জন্যে অসহনীয় পর্যায়ে নয়। আর দুই, হয়তো এত কিছু পরও তার স্বামীর জন্যে রয়েছে তার একধরনের আকর্ষণ।

প্রশ্ন : মেয়ের সম্মতি ছাড়া মেয়েকে জোর করে বিয়ে দেয়া যাবে না। কিন্তু মেয়ে যদি তার বাবা-মায়ের অমতে কাউকে বিয়ে করতে চায়, তাহলে কী করণীয়?

উত্তর : মেয়েটির জন্যে পরামর্শ হলো, মা বাবার সম্মতি ছাড়া বিয়ে করা উচিত নয়। কারণ এরকম হাজার বিয়ের কথা আমরা জানি যা বাবা-মায়ের অনিচ্ছাতে হওয়ার ফলে কখনো পুরোপুরি স্বচ্ছন্দ সম্পর্কের হয় নি।

তবে অনেক ক্ষেত্রে এমন হতে পারে যে পাত্র মেয়ের যোগ্য হওয়ার পরও সঠিক বোঝাপড়ার অভাবে অভিভাবকরা আপত্তি করতে পারেন। সেক্ষেত্রেও মা-বাবার সম্মতি আদায় করা সম্ভব। আর কৌশলটি হলো, তাদেরকে দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দেয়া যে, বিয়ে করলে আমি এখানেই করবো এবং তোমাদের দোয়া নিয়েই করবো।

প্রশ্ন : স্ত্রীর সাথে বিভিন্ন বায়না নিয়ে মতের অমিল হলে প্রায়ই কথা কাটাকাটি হয়। সংসারে শান্তির জন্যে আমি তাহলে কী করতে পারি?

উত্তর : এখানে আপনার জন্যে টিপস হলো, স্ত্রীকে সবসময় ‘হাঁ’ বলুন। কারণ স্ত্রী হলো আপনার জীবনের অংশীদার। আপনাকে সবচেয়ে আপনজন ভেবেই তিনি আবদার করেছেন। স্ত্রীকে সবসময় ‘হাঁ’ বলার মানে হলো, যুক্তিসঙ্গত এবং সাধ্যের মধ্যে হলে অবশ্যই তা পূরণ করবেন। আর সাধ্যের মধ্যে না হলেও সেসময় ‘হাঁ’ বলুন। কিন্তু দু’দিন পর সময় সুযোগ মতো তাকে বলুন যে, সেসময় তো বলেছিলাম। আমি এটা করতেও চাই। কিন্তু আমার এই অসুবিধার কারণে করতে পারছি না। দেখবেন তিনি আর উচ্চবাচ্য করছেন না। কারণ এতে একদিকে কোনো প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করার তৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া যেমন হচ্ছে না তেমনি স্ত্রী হিসেবে আপনার এই আন্তরিক দুঃখপ্রকাশ দেখে তিনিও আপনার প্রতি সহমর্মী হবেন। তাই স্ত্রীকে সবসময় ‘হাঁ’ বলুন। এতে হারাবার কিছু নেই, পাওয়ার আছে অনেক।

প্রশ্ন : আমাদের পরিবারে আমিই একমাত্র কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। পরিবারে আর কেউই এ ব্যাপারে আগ্রহ বোধ করে না। বাবা-মা প্রচুর অবিদ্যাক্রান্ত। তাদেরকে কিছু বোঝাতে চাইলেও বোঝেন না। তারা মনে করেন, জীবনটা শুধু পড়ালেখা করে উপার্জন করার জন্যেই। এখন আমার কী করণীয়?

উত্তর : অনেক সময়ই বাবা-মাকে বোঝাতে সময় লাগে। কারণ তারা আজন্ম লালিত পরিবেশেই অভ্যস্ত। বেশিরভাগ মানুষই প্রচলিত এই দ্রাস্ত ধারণার শৃঙ্খল ভেঙে বেরুতে পারেন না। কিন্তু তুমি যেহেতু এ সম্পর্কে সচেতন হয়েছ, তাই তোমার দায়িত্ব হলো অবিদ্যা থেকে মুক্ত হয়ে নিজের জীবনকে সঠিকভাবে গড়ে তোলা। তাহলে এমন এক সময় আসবে যখন তোমার পরিবারের সদস্যরা সহ আরও অনেক মানুষকে জীবন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলতে পারবে যার প্রভাব তাদের উপর পড়বে।

স্ত্রীকে সবসময়
‘হাঁ’ বলুন।
এতে হারাবার কিছু নেই,
পাওয়ার আছে অনেক।

সিলেট সেন্টার

অবিদ্যা বিষয়ক ওয়ার্কশপ

গত ৭ মে, ২০০৪ শুক্রবার সিলেটে অবিদ্যা ওয়র্কশপের ওয়ার্কশপ গুরুজীর পরিচালনায় গুলশান সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়। এ ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন ২৩০ জন গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টার।

সুনামগঞ্জ সেলের ওয়ার্কশপ



সুনামগঞ্জ সেলের উদ্যোগে গত ৯ এপ্রিল স্থানীয় সুনামগঞ্জ প্রেসক্লাব মিলনায়তনে সারাদিনব্যাপী এক গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। সিলেট সেন্টারের পরিচালক জনাব মো. সীতাব আলীর পরিচালনায় এতে প্রায় ৪০ জন গ্রাজুয়েট অংশগ্রহণ করেন।

শাপলাবাগ সেলের নতুন নাম উপশহর সেল

গত ১ এপ্রিল শাপলাবাগ সেল নতুন নামে “উপশহর সেল” হিসাবে আনুষ্ঠানিক ভাবে যাত্রা শুরু করে। পরিবর্তিত নতুন ঠিকানা : উপশহর সেল বাসা # ২৫, রোড # ৩৭, ব্লক # সি শাহজালাল উপশহর, সিলেট (বাংলাদেশ ব্যাংক কোয়ার্টারের পাশের গলি) ফোন : ০১৭২-৮৮৫৯৭৩, ০১৭১-১১০৮৫১৮

উপশহর সেলের ১ম ওয়ার্কশপ



গত ১৪ এপ্রিল উপশহর সেল ১ম বারের মতো দিনব্যাপী ওয়ার্কশপের আয়োজন করে স্থানীয় একটি চাইনিজ রেস্টুরেন্টে। পরিচালক জনাব মো. সীতাব আলী ছাড়াও আলোচনা করেন জনাব সালেহ উদ্দিন ও অধ্যক্ষ আব্দুস শহীদ। এ ওয়ার্কশপে উপস্থিত ছিলেন ৪৭ জন।

আবশ্যিক

দেশের যে কোনো এলাকায় কাজ করতে আগ্রহী প্রো-অর্গানাইজার এবং লামা শিশুকাননের জন্যে শিক্ষক ও এমবিবিএস ডাক্তার আবশ্যিক। আগ্রহীরা নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন : কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ১১৯/পি শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭।

ফাউন্ডেশন সংবাদ

চট্টগ্রাম সেন্টার

গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ

গত ২ এপ্রিল, ২০০৪ চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের শাহ আলম বীর উত্তম মিলনায়তনে আয়োজিত হয় অবিদ্যা শীর্ষক ২য় ওয়ার্কশপ। মূলত শিক্ষার্থী জীবনে অবিদ্যা নিয়ে এ ওয়ার্কশপে চার শতাধিক সদস্যের উপস্থিতিতে আলোচনাসহ গুরুজী চারটি মেডিটেশন পরিচালনা করেন।

নির্বাহী ওয়ার্কশপ

গত ৯ এপ্রিল চট্টগ্রাম সেন্টারের উদ্যোগে ফাউন্ডেশনের সেমিনার হলে দিনব্যাপী নির্বাহী ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান আলোচক ছিলেন কেন্দ্রীয় মাস্টার্স পাঠচক্রের পরিচালক মওলানা ছায়ীদুল হক ও কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল জনাব মো. নাজিমুদ্দিন।

ওয়ার্কশপটিতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ুন কবির। গ্রন্থপন্ডিতিক ব্যতিক্রমধর্মী পরিবেশনায় অর্ধশতাধিক নির্বাহী ও প্রো-কোয়ান্টায়ারের উপস্থিতিতে ওয়ার্কশপটি পরিচালনা করেন চট্টগ্রাম সেন্টারের অর্গানাইজার জনাব মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন।

নবীন গ্রাজুয়েট বরণ অনুষ্ঠান

গত ১২ মে চট্টগ্রাম সেন্টারে আয়োজিত হয় ১৭৯ ব্যাচের নবীন গ্রাজুয়েটদের বরণ অনুষ্ঠান। এতে বক্তব্য রাখেন ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ুন কবীর এবং জনাব মুজিবুর রহমান।

চট্টগ্রাম সফরে মা-জী

গত ২০, ২১ ও ২২ এপ্রিল তিন দিনের সফরে চট্টগ্রামে আসেন মা'জী। এই সফরকালে তিনি বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি বেশ কিছু মত বিনিময় সভা এবং কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও সাইকি কার্যক্রমের সদস্যদের সাথে ২টি সর্গক্ষণ্ড ওয়ার্কশপে মিলিত হন।

লামা সফরে ৫২ জন

গত ১৪ মে, শুক্রবার লামা সেন্টারে অনুষ্ঠিত ফাতেহা অনুষ্ঠানে আগ্রাবাদ সেল ও বড়পোল সেলের মোট ৫২ জন সদস্য অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, এই সফরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক এসোসিয়েট অংশ নেন।

মিরপুর শাখার ওয়ার্কশপ

গত ২১ মে মিরপুরস্থ রাডা এম.সি.এইচ-এফ.পি সেন্টারে মিরপুর শাখার উদ্যোগে সুস্বাস্থ্য ও নিরাময় বিষয়ক এক গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১০৬ জন অংশ নেন, যাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক— ৩৩ জন ছিলেন এসোসিয়েটস। আলোচনা করেন মওলানা ছায়ীদুল হক, ডা. আহমেদ মর্তুজা, জনাব মনির হোসেন মনির, জনাব জহিরুল ইসলাম প্রিন্স ও মিস রাবিয়া নাজরীন। সুস্বাস্থ্য ও নিরাময়ের জন্যে মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বিস্তারিত ও প্রাজ্ঞভাবে উপস্থাপিত হয় এ ওয়ার্কশপে।

মহাপ্রয়াণ



গত ২৬ এপ্রিল রাত ৯টায় বারডেমের আইসিইউ-তে বার্ধক্য জনিত কারণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন হালিমা খাতুন। (ইন্না লিল্লাহি রাজিউন) মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো ৭৮ বছর।

তার সুযোগ্য সন্তানদের মধ্যে একজন কোয়ান্টাম বুলেটিন সম্পাদক বিশিষ্ট শিল্পপতি জনাব কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ। দু'বছর আগে মরহুমা হালিমার ব্রেন স্ট্রোক করার পর থেকে জনাব মাহতাব প্রতিদিনই বাইরে বেরনোর আগে তার মাকে মেডিটেশনে হিল করতেন। এমন কি মৃত্যুর আগে বেশ শারীরিক জটিলতার সময়ও এই হিল করার পর তিনি বেশ আরাম বোধ করেছিলেন। সেসময় তিনি তার সন্তানকে বলেন— যে যা-ই বলুক কখনো কোয়ান্টাম ছাড়বে না। মেডিটেশন চালিয়ে যাবে।

পরম করুণাময় এ জ্ঞানদীপ্ত নারীর আত্মাকে শান্তিতে রাখুন।

রাজশাহী সেন্টার

দাফন কার্যক্রম

মার্চ ২০০৪ থেকে রাজশাহীতে চালু হয়েছে দাফন কার্যক্রম। দাফনে অক্ষম দরিদ্র বা নাম পরিচয়হীন লাশের যথাযথ মর্যাদায় সংকার কাজের জন্যে ফাউন্ডেশনের রাজশাহী সেন্টারে একটি টিমের তত্ত্বাবধানে সকল প্রকৃতি সম্পন্ন করা হয়েছে।

ব্যায়ামের পরিচিতি সভা

রাজশাহী সেন্টার গত ২৮ এপ্রিল আয়োজন করে ব্যায়ামের এক পরিচিতি সভা। এক ঘণ্টাব্যাপী এ অনুষ্ঠানে প্রায় ৮০ জন অতিথির উপস্থিতিতে রাজশাহী সেন্টারের পরিচালক জনাব কায়সার পারভেজ মেহেন্দি কোয়ান্টাম ব্যায়ামের ইতিহাস ও পরিচিতি তুলে ধরেন।

শিশুকাননের দুই শিক্ষার্থী প্রাথমিক বৃত্তি পেয়েছে

শিশুকাননের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবার যোগ হয়েছে এক নতুন মাত্রা। গেল বছর বান্দরবান জেলার লামা থানায় প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে যে ৩১ জন বৃত্তি পেয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে শিশুকাননের দু'জন ছাত্র। তারা হলো খংইয়া মুরং ও নানওয়াই মুরং। অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে তারা জানায়, এই সাফল্যের পেছনে ছিলো মনছবি ও তাদের শিক্ষকদের আন্তরিক প্রচেষ্টা। ওদের স্বপ্ন ওরা অনেক বড় হবে। ওদের সামনে এখন আগামী সুন্দর বাস্তবতা।



খংইয়া মুরং



নানওয়াই মুরং

মাসিক মুক্ত আলোচনায় শুদ্ধানন্দ মহাথের

যুগে যুগে মহামানবদের প্রচারিত বাণীর নির্যাস একই



যে দুঃখ একজন মানুষকে রাজপুত্র হয়েও, ভোগবিলাসের সমস্ত হাতছানিকে উপেক্ষা করে গৃহত্যাগী করেছিলো, প্রবৃত্ত করেছিলো দীর্ঘ আত্মনিমগ্নতায়, বোধিত লাতের মাধ্যমে তিনি পেলেন সে দুঃখকে জয় করার উপায়।

গত ১১ মে, মঙ্গলবার কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ঢাকা কেন্দ্রে আয়োজিত ‘মহামতি বুদ্ধের জীবন ও শিক্ষা’ বিষয়ে মাসিক মুক্ত আলোচনায় একথা বলেন প্রধান অতিথি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৌদ্ধব্যক্তিত্ব, বাংলাদেশ বৌদ্ধকৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি ও ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহারের অধ্যক্ষ মাননীয় শুদ্ধানন্দ মহাথের।

তিনি বলেন, দুঃখ সংক্রান্ত চতুর্থ সত্য উপলব্ধির পর মহামতি বুদ্ধ এর প্রতিকারের জন্যে যে দুই ধর্মচক্রের কথা বলেন, তার প্রথম হলো মধ্যপন্থা অনুসরণ অর্থাৎ, জীবনে অতি সুখ-বিলাস-ব্যসন যেমন পরিত্যাগ, তেমনি অতি সংযম ও কুচ্ছাসাধনও অপ্রয়োজনীয়। আর ২য় ধর্মচক্রে আর্থ অষ্টাঙ্গিক মার্গে

তিনি আটটি সং পথের কথা বলেন। আর তা হলো, সংদৃষ্টি, সংসংকল্প, সংবাক্য, সংকর্ম, সংজীবিকা, সংপ্রচেষ্টা, সংস্মৃতি এবং সংসমাধি। আর এর যথার্থ উপলব্ধির জন্যে একজন মানুষকে মেডিটেশন বা ধ্যানে আত্মগম্ব হতে হবে। সংঘবদ্ধভাবে নিজেকে পরিপূর্ণ করে অহিংসা ও মানবীয় গুণাবলিতে সমৃদ্ধ হতে হবে। তিনি বলেন, সকল ধর্মের মূল বাণীই এক। যাতে বলা আছে অন্যের উপকার করার কথা, কর্মফল অর্জনের গুরুত্বের কথা, ভিন্ন মতাবলম্বীর প্রতি সহনশীলতার কথা। মহামতি বুদ্ধ যে সাম্য-মৈত্রীর কথা বলেছেন, তার সাথে যুগে যুগে আগত ধর্মীয় মহামানবদের প্রচারিত শিক্ষার নির্যাস একই।

ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকারকে নিশ্চিত করার এ শাস্ত্র বাণীকে অনুসরণ করে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মানুষের নৈতিক পুনর্জাগরণ ও এক মানবিক মহাসমাজ গঠনে যে ভূমিকা রাখছে, তিনি তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

পঞ্চাশের দশকের শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. কাজী মোতাহার হোসেন, ড. মো. শহীদুল্লাহ এবং ড. জিসি দেবের উদ্যোগে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের যে শুভ উদ্যোগ আমাদের দেশে সূচিত হয়েছিলো ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় সে ধরনের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ আবারও শুরু হতে পারে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রতিবেদক : রাবিয়া নাজরীন



বছর শুরু রক্তদানের পুণ্যে

সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শান্তির সপক্ষে ১লা বৈশাখ ৩টি স্বেচ্ছা রক্তদান ক্যাম্প

এ বছর বাংলা নববর্ষ অর্ধসহস্রাধিক নর-নারী বরণ করেছেন রক্তদানের পুণ্য অর্জনের মধ্য দিয়ে। বাঙালীর হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী এই বিশেষ দিনটিতে ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে, শান্তির সপক্ষে রক্তদান’- এ আহ্বান জানিয়ে ঢাকার রমনা পার্ক ও টি.এস.সি.-তে আয়োজিত হয়েছিলো তিনটি স্বেচ্ছা রক্তদান ক্যাম্প। রমনা পার্কে ২টি ও টি.এস.সি.-তে একটি মিলিয়ে তিনটি ক্যাম্পে মোট রক্ত সংগৃহীত হয় ৫৬৮ ইউনিট, যা একদিনের ক্যাম্পে একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

দেড় শতাধিক নিবেদিত প্রো-কোয়ান্টিমারের একান্ত প্রচেষ্টায় উৎসবের আমেজে সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায় রক্ত দিয়েছেন রক্তদাতারা।

ভোর ৬:৩০ মিনিটে আরম্ভ হয় ক্যাম্পগুলো।

তখন থেকেই স্বেচ্ছায় রক্তদানে উৎসাহীদের আগমন লক্ষ্য করা যায়। ধীরে ধীরে সময়ের সাথে বাড়তে থাকে রক্তদাতাদের ভিড়। দুপুরের কড়া রোদের অসহ্য গরমে অপেক্ষা করেও রক্ত দিয়েছেন অনেকে। উন্মুক্ত রক্তদাতাদের দেখে রক্তদানে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন আরও অনেকে।

রক্তদান ছাড়াও বিপুল সংখ্যক মানুষ এসেছিলেন নিজের রক্তের গ্রুপটি জেনে নিতে। রমনায় আয়োজিত দুটি ক্যাম্পের মধ্যে শতায়ু অঙ্গনের ক্যাম্পটিতে সংগৃহীত হয় ২৪০ ইউনিট এবং অপরটিতে হয় ১৬৬ ইউনিট। অপরদিকে টি.এস.সি. এলাকায় আয়োজিত ক্যাম্পে মোট সংগ্রহ হয় ১৬২ ইউনিট রক্ত।

প্রতিবেদক : শাহেদ হাসনাইন রাবিত



(বামে) তাঁর রমনার ক্যাম্পের সামনে অগ্রহীদের ভিড়। (ডানে, উপরে) টি.এস.সি.-র ক্যাম্পে সুশোভিত ফেস্টুন ঝুলিয়ে ডোনারদের মোটিভেট করছেন কোয়ান্টিমাররা। (ডানে, নিচে) শতায়ু অঙ্গনের ক্যাম্পে ডোনাররা রক্তদানের জন্যে ফর্ম পূরণ করছেন।



ফাস্টফুড ও কোমল পানীয় তরুণদের রোগের ঝুঁকি বাড়াচ্ছে

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে চর্বি ও উচ্চ ক্যালরিয়ুক্ত ফাস্টফুড এবং কোকাকোলাসহ অন্যান্য নামের কোমল পানীয় গ্রহণের কারণে উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ ও শরীরের ওজন বৃদ্ধিজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা উদ্বেগ। সংস্থার ১৯২টি রাষ্ট্র ক্ষতিকর খাদ্য ও পানীয় নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নিতে সম্মত হয়েছে। এজন্যে একটি কনভেনশন প্রণয়ন করা হতে পারে।

জেনেভায় অনুষ্ঠিত ৫৭তম সম্মেলনে যোগদান শেষে দেশে ফিরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন সংস্থার বিদায়ী সভাপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন।

সূত্র : ইত্তেফাক ২৫ মে, ২০০৪

রিজুভিনেশন কোর্স

আগামী ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর, ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে রিজুভিনেশন কোর্স। দু'দিনের এই কম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন কোর্স-এর আসন সংখ্যা সীমিত। তাই প্রবেশপত্র দ্রুত সংগ্রহ করে নেয়ার জন্যে সকল কোয়ান্টাম থ্রাজুয়েটকে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

জুলাই-আগস্ট মাসের কর্মসূচি

ঢাকায়

পরিচিতি সভা :

১৮৬ ব্যাচ : ৭ জুলাই (বুধবার)

১৮৮ ব্যাচ : ৪ আগস্ট (বুধবার)

কোর্স :

১৮৬ ব্যাচ : ১৬, ১৭, ১৮ ও ১৯ জুলাই (শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

১৮৮ ব্যাচ : ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ আগস্ট (শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

চট্টগ্রামে

পরিচিতি সভা :

১৮৫ ব্যাচ : ৩ জুলাই (শনিবার)

কোর্স :

১৮৫ ব্যাচ : ৯, ১০, ১১ ও ১২ জুলাই (শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

থ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ :

২ জুলাই (শুক্রবার)

রাজশাহীতে

পরিচিতি সভা :

১৮৭ ব্যাচ : ২৪ জুলাই (শনিবার)

কোর্স :

১৮৭ ব্যাচ : ৬, ৭, ৮ ও ৯ আগস্ট (শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

থ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ :

২৩ জুলাই (শুক্রবার)

সিলেটে

পরিচিতি সভা :

১৮৯ ব্যাচ : ২৮ আগস্ট (শনিবার)

কোর্স :

১৮৯ ব্যাচ : ৩, ৪, ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর (শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

থ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ :

২৭ আগস্ট (শুক্রবার)



ডাক্তার বলেছিলেন- হাঁটবেন না, দাঁড়িয়ে
কোনো কাজ করবেন না। আমি এখন
হাঁটি, কাজ করি এবং
রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়ি।

— বেগম শামসুন নাহার



ভ্রান্ত ধারণাকে বদলে নতুন বিশ্বাসে উজ্জীবিত হতে পারলে একজন মানুষ যে কত কিছু করতে পারে তার প্রমাণ আমি। যে আমি হাঁটা তো দূরের কথা, দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না- এই নিয়তিকেই মেনে নিয়েছিলাম, সেই আমিই যখন শুনলাম প্রতি তিন মাসে একজন মানুষের শরীরের হাড়ের কোষ বদলে তৈরি হয় নতুন কোষ এবং যেখানে তিন মাস পর কোষই থাকছে না, সেখানে বছরের পর বছর ধরে ব্যথা থাকার কোনো যুক্তি নেই; তখন এই আত্মবিশ্বাস আমাকে এত শক্তি যোগালো যে, আজ আমি শুধু ব্যথা ও রোগমুক্তই নই, তারুণ্যের প্রাণোচ্ছল উদ্দীপনায় ভরপুর একজন মানুষ।

গত চার বছর ধরে আমার হাঁটতে ব্যথা। গুয়ুধ, থেরাপি সবরকম চিকিৎসার পর ডাক্তারের শেষ পরামর্শ ছিলো- হাঁটুর হাড় ক্ষয়ে গেছে, ব্যথা থাকবেই। হাঁটুর ওপর ভার পড়লে ব্যথা আরও বাড়বে। তাই হাঁটবেন না বা দাঁড়িয়ে কোনো কাজ করবেন না। রুকু, সেজদা দিয়ে নামাজ পড়বেন না। অতএব আমি এই পঙ্গুদশাকেই নিয়তি মনে করলাম। সুস্থ মানুষদের মতো ওঠাবসা করে নামাজ পড়ার বদলে বসে, ইশারায় নামাজ পড়তাম।

এমন সময়ই হঠাৎ করে ১৭৫ ব্যাচের কোর্সে আসা। প্রথম দিন ১০ ঘণ্টা ক্লাস করেই মনে হলো, আমি পারবো। সত্যি সত্যি দ্বিতীয় দিন থেকেই আমি স্বাভাবিকভাবে রুকু-সেজদা দিয়ে নামাজ পড়তে লাগলাম। মনে হলো, আমার পায়ে যেন কখনো কোনো ব্যথা ছিলো না।

এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ। একটি গুয়ুধও খেতে হয় না। কোয়ান্টাম ব্যায়াম শিখেছি। প্রতিদিন ব্যায়াম করি, পরিমিত খাবার খাই। সকালে একা ১ ঘণ্টা হাঁটতে হাঁটতে যখন বলি 'Live long, happy & strong' তখন সত্যি সত্যি আমি অনুভব করি এই ৫৮ বছর বয়সেও আমি কত সুস্থ ও প্রাণোচ্ছল হয়ে উঠেছি।

নিয়মিত মেডিটেশন করি। আগ্রহ নিয়ে অংশ নিচ্ছি ফাউন্ডেশনের প্রতিটি কার্যক্রমে- সাইকিক কোর্স, কোয়ান্টায়ন, সাপ্তাহিক ও মাসিক যৌথ মেডিটেশন, ওয়ার্কশপ ইত্যাদিতে। এই সুস্থতা, কর্মোদ্দীপনা ও আত্মবিশ্বাস আমার জীবনের পরম পাওয়া, যা আমি পেয়েছি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করে। জীবনকে সুন্দর ও সুস্থ রাখার পদ্ধতির সাথে সাথে আমি পেয়েছি চমৎকার পরিবেশের একটি সৎসঙ্গ।

ব্যাকপেইন আর নেই আশিকুল হক চৌধুরী

৬/৭ মাস
আগে আমার
ব্যাক পেইন
এবং স্পান্ডি-
লাইটিসের
সমস্যা দেখা
দিয়েছিলো।
ছুটে গেলাম
পরিচিত এক



বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে। নির্ভরযোগ্য ফিজিওথেরাপিস্টের অপ্রতুলতার কথা শুনে এবং এরকম মাত্র একজনের কথাই উনি বললেন দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ভারতেও খোঁজ নিয়ে দেখলাম একই ব্যাপার। তারপর খুঁজতে লাগলাম ইন্টারনেটে। সেখানে দেখলাম মেডিটেশনের কথা বলা হয়েছে। স্পান্ডিলাইটিস বা ব্যথা-বেদনা নিরাময়ের জন্যে মেডিটেশনকে কার্যকর উপায় হিসেবে চিহ্নিত করে সেখানে বেশ কয়েকটি ওয়েব সাইটের বিবরণ দেয়া হয়েছে।

এদিকে আমার ছেলেও ইতোমধ্যে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সটি করে গেল। তার মধ্যে দেখলাম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। যে ছেলেকে সামান্য ধমক দিলেই প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতো, কোর্সের পর সেই ছেলেকেই যখন দেখলাম ধমক দেয়ার পরও হাসছে, তখন অবাক হওয়াই স্বাভাবিক। মাত্র এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছে- এমন একটি ছেলে যখন প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলে যে, রাত জেগে পড়াশোনা করে পরীক্ষা দিতেও তার কোনো অসুবিধা হয় নি কারণ সে আধঘণ্টা মেডিটেশন করে নিজেই চাঙ্গা করে নিয়েছিলো, তখন যে কোনো বাবাই তা শুনে উদ্ভুদ্ধ হবে।

তাই আমার ছেলে যখন বললো, মেডিটেশন কোর্স করলে আমার ব্যথা ভালো হয়ে যাবে, তখন আমি খুবই উজ্জীবিত হলাম। আজকে কোর্স করে পরম করুণাময়ের শুকরিয়া আদায় করি। ব্যাক পেইন ৯৯.৯৯% ভালো হয়ে গেছে। শুধু তা-ই নয়, আনন্দময় এ চারটি দিনে আমি বহুদিন পর প্রাণবন্তভাবে হেসেছি প্রচুর। সাফল্যের যে সূত্র ধরে নিজের অজান্তে এসেছি এতটা পথ, কোর্সের আলোচনায় সেই ইতিবাচক নির্দেশনাগুলোই আমারও হৃদয়ঙ্গম করে অনুপ্রাণিত হয়েছি। আফসোস হচ্ছে, কেন আরও আগে এ কোর্সে এলাম না।

[স্বাক্ষর ফার্মাসিউটিক্যাল লি.-এর নির্বাহী পরিচালক আশিকুল হক চৌধুরী ১৭৮ ব্যাচের থ্রাজুয়েট]

আমাদের মঞ্চ নাটকের এক নিবেদিত প্রাণ শিল্পী ফেরদৌসী মজুমদার। টেলিভিশনেও অভিনয় করছেন দীর্ঘদিন। অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এই শিল্পী কোয়ান্টাম মেথড কোর্সের ১৫৬ ব্যাচে অংশ নিয়েছেন। কোয়ান্টাম বুলেটিনের সাথে একান্ত সাক্ষাতকারে তিনি বলেছেন কোর্সে অংশগ্রহণের অনুভূতির কথা। বলেছেন নিজেকে নিয়ে, ছেলেবেলা, পরিবার ইত্যাদি নিয়ে নানা স্মৃতিচারণের কথা।

ফেরদৌসী মজুমদার : জীবন মঞ্চের সফলতমদের একজন

যে মেয়েটিকে মায়ের হাতে মার খেতে হয়েছিলো বাবাকে নকল করে দেখানোর অপরাধে; আর বাবার পিটুনি খেতে হয়েছিলো টেলিভিশন দেখতে যাবার অপরাধে, সে মেয়েটি ৩১ বছর ধরে টেলিভিশনের পর্দা আলোকিত করে রেখেছেন, মঞ্চ দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তার অনন্য অভিনয় প্রতিভায়। হ্যাঁ, আমরা অভিনেত্রী ফেরদৌসী মজুমদারের কথাই বলছি। বড় ভাই শহীদ মুনীর চৌধুরীর হাত ধরে যাত্রা শুরু, সে যাত্রা আজো চলছে অসংখ্য মানুষের হৃদয়ের মুগ্ধতা আর ভালবাসা নিয়ে, যা তিনি অর্জন করেছেন নিজ যোগ্যতায়। সাফল্য আর স্বীকৃতিতে তার প্রাপ্তির ভাণ্ডার পূর্ণ।

প্রচণ্ড রক্ষণশীলতা আর ধর্মপরায়ণতার সাথে আধুনিকতার একটি চমৎকার মিশেল ছিলো পারিবারিক আবহে। ১৪ জন ভাই-বোন আর বাবা-মা নিয়ে বিশাল সংসারে বাবা ডিস্ট্রিক্ট জজ পরহেজগার খান বাহাদুর আব্দুল হালিম চৌধুরী হাতে ধরে ধরে তাদের নামাজ পড়তে শিখিয়েছেন, লেখাপড়া করিয়েছেন। সেই সাথে এটাও বুঝিয়েছেন যার যার কাজের জবাব তাকেই দিতে হবে। এভাবে দায়বদ্ধতার একটা ব্যাপার তৈরি হয়ে গিয়েছিলো মনের মাঝে সেই ছোট বেলাতেই। যা আজও, এ পরিণত বয়সে, সমানভাবে তাজ্জিত করে। ভোরবেলা উঠে নামাজ পড়া, পড়তে বসা— এই ছিলো তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য।

মিথ্যা বলাকে ধরা হতো ভয়ংকর অপরাধ হিসেবে। অনেক বড় অপরাধের ক্ষমা পেয়ে যেতেন শুধু সত্য বলার কারণে। বাবার এই শিক্ষা আজো তার হৃদয়ে গেঁথে আছে। সেই আলাতে তিনি নিজের পরিবার গড়েছেন। নিজের মেয়েকে মানুষ করেছেন সত্য বলার আদর্শে। বাসার গৃহকর্মীদেরও কাজের প্রথম শর্ত মিথ্যা না বলা।

জীবনে অনেক বাধা-বিপত্তি এসেছে। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে শোকর-গুজার থাকার শিক্ষা পেয়েছিলেন পিতার কাছে। তাই কখনো হাল ছাড়েন নি। সুখে-দুঃখে সব সময় বিধাতাকে স্মরণ করেছেন। যে সুপ্রীম পাওয়ার চন্দ্র-সূর্যসহ সমগ্র বিশ্ব জগত নিয়ন্ত্রণ করেন তিনি মানুষকেও নিয়ন্ত্রণ করেন। আর মৃত্যু হলো অমোঘ সত্য, কেউ তাকে এড়াতে পারে নি— এই বোধগুলো বাবা ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন মনের ভেতর। আজ এতকাল পরেও এসবই বিপদে শক্তি যোগায়, আস্থা দেয়— বললেন ফেরদৌসী মজুমদার।

অনেক বড় বয়সেও বাবার তীব্র শাসনে যেমন ছিলেন তেমনি মায়ের মমতাও তাকে ভরিয়ে রাখতো সবসময়। বাবা মারতেন পড়া না পারলে আর মা উম্মে কবীর আফিরা বেগম চোখের জল ফেলতেন। আজ বোঝেন বাবার শাসন যদি না থাকতো, মায়ের সেই স্নেহ যদি না থাকতো তবে মানুষ হওয়া হতো না।

তার কাছে পারিবারিক ঐতিহ্য তাই বিরাট ব্যাপার। তিনি মনে করেন ব্র্যাকেন ফ্যামিলিগুলোর জন্যে বাবা-মা সমানভাবে দায়ী। কেননা তারা বাচ্চার চাহিদা হয়তো মেটাচ্ছেন ঠিকই, কিন্তু তাদের জন্যে যে স্যাক্রিফাইস করা প্রয়োজন, সেটা করছেন না। পরিবারে ভালো ভালো কথা বলার রেওয়াজটাও বিরাট ব্যাপার।

এমনি বাবার শাসন, মায়ের আদরে ভরা সংসারে বড় হতে হতে মুসলিম গার্লস স্কুল থেকে এস.এস.সি এবং ইডেন কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করলেন। ইন্টারমিডিয়েট পড়াকালীন বড় ভাই মুনীর চৌধুরীর উৎসাহে শওকত ওসমানের লেখা নাটক ডা. আবদুল্লাহর কারখানায় যন্ত্রমানবের ভূমিকায় অভিনয় করলেন। বাবার চোখ এড়ানোর কী ভয়-আতংক তখন! এরপর ইউনিভার্সিটিতে বাংলায় ভর্তি হলেন। অভিনয়ও চলছিলো ছাত্র-শিক্ষকদের যে নাট্য সংগঠন ছিলো সেটা থেকে। তারপর ১৯৬৪-তে টেলিভিশন এলো। প্রথম নাটক করলেন ‘একতলা-দোতলা’। চতুর্দিকে জয়-জয়কার। বাঘের মতো রাগী বাবার চোখেও মুগ্ধতা, মেয়ের

সাফল্যে আনন্দিত। কিন্তু শাসন তখনো রয়েছে। পেছন ফিরে তাকাতে হয় নি আর। বাংলায় অনার্স-মাস্টার্স এবং তারপর আরেকবার এয়ারাবিকে মাস্টার্স করলেন। পাশাপাশি অভিনয় করেছেন পুরো দমে।

টিভির পাশাপাশি মঞ্চেরও তিনি নিবেদিত প্রাণ শিল্পী। কি সেই অনুপ্রেরণা শক্তি, যা তাকে এতদূর এনেছে— এ প্রশ্নের জবাবে জানালেন, কাজের প্রতি ভালবাসাই তার শক্তি। তিনি কখনো ভাবেন নি বিখ্যাত হবেন। পত্র-পত্রিকার প্রচ্ছদে ছবি যাবে। শুধু অভিনয়কে ভালবেসে গেছেন। কেননা কাজ যত ছোট হোক না কেন তাকে ভালবাসা উচিত; যেন তা নিজেকে তৃপ্ত করে। অন্যকে মুগ্ধ করে। সেই সঙ্গে রয়েছে আশাবাদী চিন্তা, কখনো হতাশ না হওয়া, আত্মবিশ্বাসী থাকা। নিজেকে আশাবাদী বলে মনে করেন তিনি। যেটা এসেছে পরিবার থেকে। কখনো হতাশ না হবার শিক্ষা, আফসোস না করার শিক্ষা বাবা-মা ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। এই বোধটি নতুন করে জাগ্রত হয়েছে কোয়ান্টামে এসে— তিনি জানান। ২০০১ সালে যখন তার বা পা ভাঙলো, তিনি সবার সামনে চোখের জলে ভেসে না গিয়ে বিধাতার কাছে সহনশীলতার দয়া ভিক্ষা করেছেন। কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন যে, কোমরে চোট লাগে নি।

শরীর যখন খুব খারাপ তখন তিনি সহকর্মী মিসেস তহুরা কালামের পরামর্শে মেডিটেশন কোর্স করেন ১৫৬ ব্যাচে। কোর্স করে তার উপলব্ধি— খুব উপকার পেয়েছি। সুস্থ হওয়ার সাহস এবং আশা জেগেছে। প্রথম থেকে তিনি যে পারিবারিক শিক্ষার কথা বলে আসছিলেন, তার সাথে কোয়ান্টামের শিক্ষা মিলে তাকে নতুন দিশা যোগালো। আবার তিনি নতুন করে পজিটিভ চিন্তা করতে শুরু করলেন। একজন মুগ্ধ শ্রোতা হয়ে তিনি গুরুজীর প্রতিটি কথা আত্মস্থ করেছেন। ঈশপের গল্পের মতো কোর্সের প্রতিটি মেসেজ তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে তার সেই পারিবারিক ঐতিহ্যের কথা। যেখানে মা শিখিয়েছিলেন মানুষের জন্যেই মানুষ। কারো নিন্দা না করা, ভালো কথা বলা, ভালো চিন্তা করা, দেশকে ভালবাসা, মানুষকে ভালবাসার মাধ্যমে হৃদয়ে শান্তি লাভের শিক্ষা ইত্যাদি যা পেয়েছেন বাবা-মার কাছে; আবার তা সাজিয়ে নিয়েছেন গুরুজীর অসাধারণ বয়ানে। কেননা ভাঙা বাঁ পায়ে অপারেশনের পর যখন সব ঠিক হওয়ার পথে তখন ডান পায়ে আর্থরাইটিস দেখা দিলো। শরীরের যন্ত্রণার সাথে সাথে যখন মনও অস্থির তখন মেডিটেশন তাকে সাহস দিয়েছে, দিয়েছে বাঁচার আশা। তার ভাষায়, সে আশাতে অনুপ্রাণিত হয়ে আমি বাসায় নিয়মিত মাটির ব্যাংকে টাকা ফেলি। মেয়ে, স্বামীও আমার আরোগ্য কামনা করে মাটির ব্যাংকে টাকা ফেলেন।

প্রতি মুহূর্তে কৃতজ্ঞ থাকাই ফেরদৌসী মজুমদারকে দিয়েছে সুখী সংসার। স্বামী বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, মেয়ে সু-অভিনেত্রী ত্রুপা মজুমদারকে নিয়ে সুখের জীবন তার। বাবার এ্যাডভার্টাইজিং ফার্মে কাজ করছে জার্নালিজমে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ত্রুপা। সন্তানের সাথে বাবা-মায়ের বন্ধুত্বের সম্পর্কের এক উজ্জ্বল উদাহরণ এই নাট্য পরিবার। ফেরদৌসী মজুমদারও তাই বলছিলেন, বাবা-মা ও সন্তানের মাঝে নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও বন্ধুত্বের পারিবারিক এই ব্যাপারটি তিনি কোয়ান্টামে এসেও অনুভব করেছেন এবং এই প্রজন্মের বাবা-মা-সন্তান সবারই এর সাথে একাত্ম হওয়া উচিত।

ব্যক্তি জীবনে অভিনয়ের পাশাপাশি শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন এই সুবক্তা ও আত্মবিশ্বাসী মানুষটি। এখানেও তিনি বলেছেন একজন ছাত্রের পারিবারিক শিক্ষার সাথে সাথে জীবন সম্পর্কে সঠিক গাইডলাইনের কথা। একজন শিক্ষক হিসেবে তিনি মনে করেন— কোয়ান্টাম এই গাইডলাইন দিতে পারে। চরিত্র গঠনেও এই নির্দেশনার প্রয়োজন রয়েছে। মেজাজকে নিয়ন্ত্রণ করে সর্বদা জয়ী থাকার মন্ত্র “রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন” সবারই গ্রহণ করা উচিত।

ইতিবাচকতা, আত্মবিশ্বাস আর ভালবাসার বার্নার্দারায় প্রবাহিত সফল এই মানুষটির জীবনে কোনো বাধা পাঁচিল হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। এমনকি মারাত্মক শারীরিক অসুস্থতাও। যেখানে চলৎশক্তিহীন হয়ে যাবার কথা সেখানে তিনি চলেছেন। আবার স্বপ্ন দেখেছেন আগের গতিময় জীবন ফিরে পাবার। যার প্রেরণা তিনি নতুন করে খুঁজ পেয়েছেন কোয়ান্টাম মেথডে। তিনি মনে করেন এই উজ্জীবনী সুধার স্বাদ সবারই গ্রহণ করা উচিত।

প্রতিবেদক : শম্পা রায় ও সুমন ধর



শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আমার সালাম নিবেন। আমি
রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত ৫৮
ব্যাচের প্রাজুয়েট। আমার
সাইকি কোর্সটা করার খুব
ইচ্ছে ছিলো কিন্তু এখন
আমাকে ভিসার জন্যে
ছুটোছুটি করতে হচ্ছে।



আমি ৯৭ সালে মেডিটেশন কোর্স করার পর
ফাউন্ডেশনের সাথে অতটা একাত্ম ছিলাম না। কিন্তু
একদিন হঠাৎ ফাউন্ডেশনে গিয়ে আপনাদের সবার
প্রতি আমার মন শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে। আমি একাত্ম
বোধ করি। এখন আমার খুব আফসোস হয় এতদিন
কেন যোগাযোগ রাখি নি। এখন আমার ইচ্ছা দেশের
বাইরে গেলেও আমি যোগাযোগ রাখবো। যাবার
আগে আমি একবার আপনার ও মা-জীর সাথে
সশরীরে দেখা করে যাবো। আমার কিছু স্বপ্ন আছে,
যা আমি খুব ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি। কখনো
মনে হয় সেসব শুধু স্বপ্নই; আবার কখনো মনে হয়
সময়ের ব্যবধানে তা বাস্তবে রূপান্তরিত হবে।

আপনার দেখা না পেলে এ জীবনে হয়তো অনেক
আত্মোপলব্ধি থেকে বঞ্চিত থাকতাম। আপনার কাছ
থেকে সার্বিক কল্যাণের জন্যে কিছু উপদেশ পেলে
ধন্য হবো। আমি প্রার্থনা করছি শীঘ্রই যেন আপনার
কিছু উপদেশ ও দোয়া সংগে নিয়ে যেতে পারি।
ফাউন্ডেশনের সবার জন্যে শুভ কামনা রইলো।

ডা. নাসরীন সুলতানা রিয়া

গুরুজীকে লেখা চিঠি

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আসসালামু আলাইকুম। গত
২৪ মার্চ সূচনা হলো আমার
জীবনের একটা অনন্য সফল
দিনের। আমি আইসিএমএ
ডিসেম্বর ২০০৩-এর পরীক্ষায়
ফাউন্ডেশন লেভেলে সারা
দেশের মধ্যে সর্বোচ্চ নম্বর
পেয়েছি। এজন্য তারা আমাকে ‘প্রেসিডেন্ট সিলভার
মেডেল অ্যাওয়ার্ড’ দেয়ার জন্যে মনোনীত করেছে।
পরীক্ষায় ১ম হওয়ার ঘটনা আমার জীবনে এই
প্রথম। এখন আমি বিশ্বাস করি সিএমএ-র চূড়ান্ত
লেভেলেও প্রথম হতে পারবো।

মনছবি দেখতাম আমি সেরা স্টুডেন্ট এবং
এজন্য সবাই আমাকে স্নেহ করেন। কিন্তু আমি
জানতাম না কিভাবে তা হওয়া যায়। এমনকি
সিলভার মেডেল পাওয়া যায়, তা-ও জানতাম না।
শুধু আমি চূড়ান্ত লেভেলের মনছবি দেখতাম। স্টা



যে আমাকে প্রথম লেভেলেই কবুল করে নেবেন, তা
কখনোই ভাবি নি।

ইকোনমিক্সে প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় খারাপ
রেজাল্ট হওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। কোনো
উপায় দেখছিলাম না। তখনই মাটির ব্যাংকে ৫০০
টাকা রাখলাম। নিয়ত করলাম জীবনের জন্যে যেটা
ভালো সে সিদ্ধান্ত যেন নিতে পারি। এমন সময়ে এক
আত্মীয়ের বাসায় পরিচিত হলাম সিএমএ-তে পড়ুয়া
এক ভাইয়ের সাথে। তার কাছে সিএমএ-এর বিভিন্ন
বিষয় শুনে আগ্রহী হলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম, সিএমএ
কমপ্লিট করবো।

২০০৩-এর আগস্টে প্রথমবার ফাউন্ডেশন
লেভেলের পরীক্ষা দিলাম চারটা বিষয়েই। কিন্তু
একটা বিষয়ে শুধু ‘এ’ গ্রেড পেলাম। প্রথম বারের
মতো ইংরেজি মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে স্বভাবতই একটু
বেগ পেতে হলো। তখন থেকেই মনছবি দেখা শুরু
করলাম। ডিসেম্বরে আবার পরীক্ষায় আমি
ফাউন্ডেশন লেভেলে ৪টি বিষয়েই একসাথে পাশ
করে সারা দেশের মধ্যে প্রথম হওয়ার সম্মান অর্জন
করলাম।

আমি বিশ্বাস করি স্ট্রটার পরম অনুগ্রহ এবং
আপনার দোয়াই আমাকে এ সাফল্য দিয়েছে ও
আরও সফলতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দোয়া
করবেন যেন আপনার দিক-নির্দেশনা যথাযথভাবে
পালন করতে পারি।

—আপনার স্নেহধন্য

শফিউর রহমান সাইফ

২১ এপ্রিল, ২০০৪ চট্টগ্রাম

আত্মহত্যার প্রেসক্রিপশন

আপনি কি জানেন বিষণ্ণতা ঠেকাতে যে ওষুধগুলো
বাজারে পাওয়া যায় তা বিষণ্ণতা ঠেকাতে তো পারেই
না, উপরন্তু রোগীকে ঠেলে দিতে পারে আত্মহত্যার
দিকে? কারা আটার মাত্র ১২ বছর বয়সী এক ছোট্ট
মেয়ে। ডাক্তারের পরামর্শে বিষণ্ণতা নিরোধক একটি
ওষুধ খাওয়ার ৭ মাসের মাথায় একদিন মেয়েটি
গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলো। মায়ের জন্যে
রেখে গেলো একটা ছোট্ট চিরকুট, “মা, এ চিরকুট
যখন পাবে, তখন আমি আর বেঁচে নেই। তোমাকে
আমি খুব ভালবাসি।”

কারার মা মিসেস শ্যানন বেকার তার মেয়ের
মৃত্যুর জন্যে বিষণ্ণতা নিরোধক ওষুধকেই দায়ী
করছেন। তার মনে পড়লো, বিষণ্ণতার ওষুধটা
দেবার সময় তাকে শুধু জানানো হয়েছিলো যে, এ
ওষুধের সবচেয়ে খারাপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে
ইনফ্লুয়েঞ্জা আক্রমণ। অথচ ওষুধ খাওয়ার তিন
সপ্তাহের মধ্যেই কারার অবস্থা আরও খারাপ হলো।
স্কুলের রেজাল্ট খারাপ হতে লাগলো, সে হয়ে উঠলো
খিটখিটে মেজাজের, নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণহীন এক
অসামাজিক মানুষ।

এরিক হ্যারিস ১৮ বছর বয়সী এক তরুণ।
বিষণ্ণতায় আক্রান্ত এ তরুণটিও একদিন কলম্বিয়ার
একটি স্কুলে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ে ধ্বংসযজ্ঞ
চালিয়েছিলো, পরে জানা গিয়েছিলো সে তখন
নিয়মিত বিষণ্ণতা নিরোধক ওষুধ সেবন করতো।

আমেরিকায় প্রায় বিশ লক্ষ শিশু-কিশোর
ক্লিনিক্যাল ডিপ্রেসনের স্বীকার। অর্থাৎ বিষণ্ণতার
মাত্রা এত বেশি যে তা রোগে পরিণত হয়েছে। ফলে
সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে গেলে স্বাভাবিকভাবেই তারা
প্রেসক্রাইব করেন বিষণ্ণতা নিরোধক এক বা
একাধিক ওষুধ। কিন্তু সেই ওষুধ সেবন করে এই

তরুণ-তাজা প্রাণগুলো সুস্থ তো হচ্ছেই না, বরং
ধাবিত হচ্ছে আত্মহত্যার মতো ধ্বংসাত্মক প্রবণতার
দিকে। সম্প্রতি আমেরিকা এবং ব্রুটেনে এ নিয়েই
চলছে গবেষণা।

২০০২ সালে আমেরিকার ফুড এন্ড ড্রাগ
এডমিনিস্ট্রেশন তাদের একটি গবেষণার পর
‘প্যাস্সিল’ নামে বিষণ্ণতা নিরোধক একটি ওষুধ
প্রেসক্রাইব করার ব্যাপারে ডাক্তারদের সাবধান করে
দেন, কারণ তাদের সে গবেষণায় দেখা গিয়েছিলো—
এ ওষুধটি, বিশেষত তরুণ রোগীদের আত্মহত্যার
চিন্তাকে উসকে দেয়। তারা আরো জানায় যে, এ
ওষুধগুলো আসলে একজন রোগীর বিষণ্ণতা নিরোধে
প্লাসিবো প্রভাবের চেয়ে বেশি কার্যকর নয় অর্থাৎ
‘ওষুধ দেয়া হয়েছে, কাজেই বিষণ্ণতা ভালো হয়ে
যাবে’—এই বিশ্বাস বা আশাবাদটুকুই রোগীর মধ্যে
কাজ করে।

আরেকজন গবেষক আমেরিকার বোস্টনের ম্যাক
ক্লিন হাসপাতালের ড. মার্টিন টিশার-এর গবেষণায়
দেখা গেছে, বিষণ্ণতায় আক্রান্ত যে সমস্ত রোগী
‘প্রোজাক’ সেবন করেছেন তাদের মধ্যে আত্মহত্যার
চেষ্টা বেশি—তাদের চাইতে যারা প্লাসিবো বা অন্য
কোনো বিষণ্ণতা নিরোধক গ্রহণ করেছেন। এ
গবেষণার ফলাফলের পর ব্রুটেনে বিষণ্ণতা নিরোধক
বেশ কয়েকটি ওষুধ শিশু-কিশোরদের জন্যে
প্রেসক্রাইব করাকে নিষিদ্ধ করা হয়।

অবশ্য ওষুধ কোম্পানীগুলো এ ধরনের
অভিযোগকে অস্বীকার করছে এ যুক্তিতে যে, চূড়ান্ত
বিষণ্ণতাই আসলে একজন রোগীকে আত্মহত্যার
দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এখানে ওষুধের কোনো ভূমিকা
নেই। যদিও তাদের এ সংক্রান্ত গবেষণার বিস্তারিত
তারা প্রকাশ করে নি।

কারণটা অবশ্য খুবই পরিষ্কার, আর তা হলো,
কোনো ওষুধের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে মানুষকে
জানালে যে আর্থিক ক্ষতি হবে সেটা মেনে নিতে না
পারার ব্যবসায়িক হীন স্বার্থ।

অথচ এসব কিছু না জেনেই ডাক্তাররা হরহামেশা
প্রেসক্রাইব করছেন বিষণ্ণতা নিরোধক এসব ক্ষতিকর
ওষুধ। তাই ইংল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব
ম্যানচেস্টার-এর শিশু-কিশোর মনস্তত্ত্ব বিশারদ ড.
রিচার্ড হ্যারিংটন বলেন, একটি শিশুকে বা কিশোরকে
ওষুধ দেয়ার আগে ডাক্তারের উচিত অপ্রকাশিত
গবেষণার ফলাফলগুলোও পড়ে দেখা।

[টাইম অবলম্বনে]

ঝেড়ে ফেলুন দুঃখের স্মৃতি, বাড়ান স্মরণশক্তি

সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে অস্বস্তিকর স্মৃতি
স্মরণশক্তি হ্রাসের একটি কারণ। নর্থ ক্যারোলিনা
স্টেট ইউনিভার্সিটির দু’জন গবেষক কিটি ক্রেইন
এবং এড্রিয়েল বোলস্ ৩৫ জন স্বেচ্ছাসেবীকে তাদের
জীবনের একটি অত্যন্ত বিবর্তকর অভিজ্ঞতা লিখতে
বলেন। এরপর এক পরীক্ষায় দেখা যায় দৈনন্দিন
বাজারের হিসেব বা গাড়ির চাবি খুঁজে পাবার মতো
কাজগুলো তারা খুব তাড়াতাড়ি করতে পারছেন।
আর এ থেকেই মনে করা হয় অস্বস্তিকর স্মৃতিকে
কোনো প্রক্রিয়ায় ঝেড়ে ফেললেই দৈনন্দিন স্মৃতি
জোরদার হয়। অন্যদিকে এ ধরনের স্মৃতিকে
ধামাচাপা দেবার যে একটা সাধারণ চেষ্টা আমাদের
থাকে তাতে গবেষকরা দেখেছেন অসচেতনভাবেই
আমরা মস্তিষ্কের দৈনন্দিন স্মৃতিকে রুদ্ধ করে ফেলি।

তাই বিজ্ঞানীদের পরামর্শ হলো—যে তিক্ত
অভিজ্ঞতার সাথে গভীর আবেগ জড়িত আছে এরকম
স্মৃতিকে লিখে ফেলুন। তাতে পরবর্তী কিছুটা সময়
আপনার বিষণ্ণতা থাকলেও এতে সুফল পেতে শুরু
করবেন খুব শিগগিরই।

[হেলথ এন্ড নিউট্রিশন অবলম্বনে]

প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

সুখী পরিবার গঠনের উপায় আখতার জাহান

আমার ভীষণ অস্থির, চঞ্চল ছেলের পরিবর্তন দেখে আমি হতবাক। সে আগেই এ কোর্স করেছিলো। এরপর আমার স্বামী করলেন, তিনিও বেশ অস্থির, রাগী ছিলেন। এই ধারাবাহিকতায় কোর্সের শিক্ষাকে পারিবারিকভাবে ধারণ ও লালন করতে আমি এসেছি। এর মাধ্যমে আমার পরিবারকে সুখী ও সমৃদ্ধ রূপে গড়ে তুলতে চাই।

[আখতার জাহান, কবি নজরুল সরকার কলেজের সহযোগী অধ্যাপক, ১৭৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



অস্থিরতা কমেছে

নাজনীন আখতার

বি.বি.এ করার পর আমি কিছুদিন ধরে অস্থিরতায় ভুগছিলাম। কি করতে হবে, আমার গন্তব্য কোথায়, আমি জানি না। অবশেষে এক বন্ধুর পরামর্শে কোর্সে অংশ নিই। কোর্সের মাধ্যমে কোয়ান্টা ভঙ্গির শিক্ষা কাজে লাগিয়ে আমি ভালো ফল পাওয়া শুরু করলাম। এছাড়া আমি আমার অসুস্থ বাবাকে হিলিং করতে পারছি এবং তিনি সুস্থ বোধ করছেন। এখন আমি উপলব্ধি করছি আমার গন্তব্য কোথায় এবং কেন আমি পৃথিবীতে এসেছি। এছাড়া, আগে সিদ্ধান্ত নিতে বেশি সময় লাগতো, কিন্তু এখন বিশ্বাস জন্মেছে যে, সার্বিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবো।

[নাজনীন আখতার বি.বি.এ. গ্রাজুয়েট, ১৬০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



প্রো-অ্যাকটিভ হচ্ছি

ফিরোজা করিম নেলী

ইদানিং লক্ষ্য করছি, আমি খুব রি-অ্যাকটিভ হয়ে যাচ্ছি। আর সেটা সম্ভবত আমার চারপাশের পরিবেশের কারণেই। কেননা সবাই বলতো আমি যেহেতু মেয়ে তাই আমাকে দিয়ে ভালো কিছু করা সম্ভব নয়। কিন্তু এখন থেকে আমি প্রো-অ্যাকটিভিটির শিক্ষা নিয়ে যাচ্ছি। এখন আমি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছি। এছাড়া কোর্সের পরিবেশ এবং ডিসিপ্লিন দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি।

[ফিরোজা করিম নেলী, এল.জি.ই.ডি.-এর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার, ১৬৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



প্রাণ খুলে হাসতে পেরেছি এডভোকেট রোস্তমা বেগম চৌধুরী

অনেক বছর পর আমি প্রাণ খুলে হাসতে পেরেছি। আজ মনে হচ্ছে আমি অতীতে ফিরে গিয়েছি। আমার সাহসের বড় অভাব ছিলো। এখন মনে হচ্ছে আমার নতুন করে আত্মবিশ্বাস জন্মেছে। এছাড়া আমি রি-অ্যাকটিভ প্রকৃতির ছিলাম। কিন্তু কোর্স শেষে বাসায় যাবার পর আমার স্বামী বিভিন্ন ভাবে আমাকে রাগানোয় চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আমি রি-অ্যাক্টিভ না করে শান্ত ও স্বাভাবিকভাবে তার কথা শুনছিলাম। এতে তিনি বেশ অবাক হন এবং মেডিটেশনের সুফল বুঝতে পারেন।

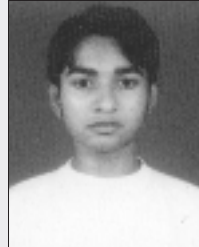
[রোস্তমা বেগম চৌধুরী, এ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর, জুডিশিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ১৬৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



আসল সত্তাকে উপলব্ধি করেছি শোয়েব আল মামুন

কোয়ান্টাম আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কোর্স। এখন উপলব্ধি করছি আমার আসল সত্তাকে। এখন থেকে আমি পেয়েছি আত্মবিশ্বাস ও প্রশান্তি। গুরুজী আমাকে সাফল্যের সিঁড়ি দেখিয়েছেন। সঠিক জীবনদৃষ্টি গ্রহণের মাধ্যমেই মানুষ তার জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে, তা এ কোর্সে এসে শিখলাম।

[শোয়েব আল মামুন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ২য় বর্ষের ছাত্র, ১৬৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



টেনশন থেকে মুক্তি পেয়েছি তানভীর আহমেদ সজীব

কোর্সটি আমার ভালো লেগেছে। এখানে আমি প্রশান্তির সন্ধান পেয়েছি। আগে অযথা টেনশন করতাম। কিন্তু এখন দেখছি টেনশন আসলে নিজেরই ক্ষতি করে। মনের শান্তি নষ্ট করে। এখন আমি টেনশনমুক্ত থাকতে পারছি। বিশ্বাসী হয়েছি। স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি এবং বিশ্বাস করছি আমার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্যে যা কিছু করা প্রয়োজন তা-ই করতে পারবো। বড় কিছু পাবার জন্যে ছোট কিছু ছাড়তে হয়—গুরুজীর এ কথাটি আমাকে ভীষণ নাড়া দিয়েছে।

[তানভীর আহমেদ সজীব, বুয়েটের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র, ১৬৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



সুস্থতাই পরম পাওয়া খুরশীদা বানু

আমার হঠাৎ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে গেল। ডাক্তাররা আশা ছেড়ে দিয়ে বললেন—আল্লাহর উপর ভরসা রাখেন। আমি কোমাতে চলে গিয়েছিলাম। এখানে প্রথম দিন আমি মাথায় রুমাল বেঁধে, শাল পরে কাঁপতে কাঁপতে এসেছি। আমি সোজা হয়ে হাঁটতে পারি না, নিচু হয়ে বসতে পারি না। এত শ্বাস কষ্ট যে, দম নিতে পারি না। সারারাত ঘুম হয় না।

আমার বিশ্বাস জন্মেছিলো—যত কষ্টই হোক এখন থেকে আমি সুস্থ হয়ে ফিরবো। কোর্সের ২য় দিন থেকেই মাথায় কাপড় দেয়া লাগে নি। শাল পরতে হয় নি। সোজা হয়ে সুস্থভাবে হেঁটেছি। নিচু হয়ে বসেছি। রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছি। আমি যে সুস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি এটাই আমার পরম পাওয়া।

[খুরশীদা বানু, গৃহিণী, ১৭৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



নতুন উপলব্ধি

মোজাম্মেল হোসাইন

স্ত্রীর অনুপ্রেরণায় আমি মেডিটেশন কোর্সে অংশ নিই। কেন না কোর্স করার পর থেকে উনি হাইপারটেনশন, আই.বি.এস-এর মতো রোগ থেকে মুক্ত। কোর্সে এসে আমি এক আলাদা প্রশান্তি অনুভব করছি। এতদিন আমি যা শুনেছি তা ছিলো বিটা লেভেলে। ধ্যানের স্তরে শোনার পর গুরুজীর প্রতিটি কথা আমাকে নতুন উপলব্ধি দিয়েছে। আমার বিশ্বাস, কেউ যদি এ কোর্স থেকে 'রেগে গেলেন তো হেরে গেলেন'— শুধু এ কথাটি সাথে নিয়ে যায় তবুও সে জীবনে সফল হতে পারবে।

[মোজাম্মেল হোসাইন, বেসিক ব্যাংক, আসাদগঞ্জ শাখায় ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত, ১৬৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



রাগকে নিয়ন্ত্রণ করছি

নূর-এ-খালেদ ওসমানী

আমার রাগটা খুব বেশি ছিলো। এ কারণেই জীবনের অনেক জায়গায় হেরে গিয়েছি। কোর্সে এসে আমার মধ্যে অনুশোচনা কাজ করছে। এছাড়া হতাশা এবং ব্যর্থতায় আমি সবসময় ভুগতাম। এই কোর্স আমাকে এক নতুন জীবনছবি দিয়েছে। এখন সহজেই রাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি এবং বিশ্বাস করছি জীবনে বড় কিছু করতে পারবো।

[নূর-এ-খালেদ ওসমানী, ব্যবসায়ী, ১৭০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



লেখক-সাংবাদিক দলের লামা ভ্রমণ

দু'পাশে বিশাল পাহাড়। সোজা উঠে গেছে। মাঝখানে বনাধারা। বনার পানি ভীষণ ঠাণ্ডা। উপরে সূর্য দেখা যায় না। বাঁশ, রাবারসহ নানা গাছে আচ্ছাদিত। আমরা বনার জলে হেঁটে চলেছি। গাইড ইশিয়ার করছেন, “পানিতে জৌক থাকতে পারে। আশেপাশের কোনো গর্তে লাঠি দিয়ে গুঁতো দেবেন না, অজগর আছে।”

অনেক দূর যাওয়ার পর বেশ ক'টি উঁচু পাহাড়ের সন্ধান পাই। গাইড রূপ কথার গল্পের মতো বললেন, ‘চিচিং ফাঁক’। দরজা অবশ্য খুললো না। আমরা উঁচু পাথরের উপর ফটোসেশনের জন্যে দাঁড়িয়ে যাই। ক্যামেরার ক্লিক ক্লিক শব্দে নীরবতা ভাঙে। আমরা যেন ঘোর কাটিয়ে উঠি। এতক্ষণ কোনো এক রূপকথার জগতে ছিলাম। সম্মুখে ফিরে পেয়ে ছুটে চলি কোয়ান্টাম মেডিটেশন রিসর্টে। আমাদের সাধনার মনের বাড়িতে। বান্দরবান জেলার লামা থানার কেয়াজুপাড়ায় সবুজ-সুশোভিত পাহাড় ঘেরা এই মনের বাড়ি।

দৈনিক ‘আমার দেশ’-এর সিনিয়র রিপোর্টার ইলিয়াস খান-এর লেখা ‘সূর্য-গিরি আর কৃষ্ণ পাহাড়ে ২৬ ঘণ্টা’ শিরোনামে সাপ্তাহিক সুগন্ধায় প্রকাশিত ভ্রমণ কাহিনী থেকে উদ্ধৃত হলো উপরের অংশটুকু। গত ২৮ মার্চ থেকে ৩০ মার্চ পর্যন্ত ঢাকার বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও টেলিভিশনের প্রায় ৩৫ জন সাংবাদিক, কবি, লেখকদের যে দল লামা মেডিটেশন রিসর্ট সফর করেন তাদের মধ্যে জনাব খানও ছিলেন। গভীর অরণ্যের নিবিড় প্রকৃতি সংলগ্ন এই রিসর্টের যাবতীয় আয়োজন দেখে দু’দিনের ভ্রমণ পর্যটনে সমবেত সাংবাদিকরা

অভিভূত। ঢাকায় ফিরে তারা ব্যক্ত করেছেন তাদের সেই উদ্ভাসিত অনুভূতি।

বাংলা একাডেমীর পরিচালক এবং বিশিষ্ট কবি মুহাম্মদ নূরুল হুদা তার অনেক ব্যস্ততার মধ্যেও সুযোগ করে নিয়েছিলেন এই ভ্রমণে যাওয়ার। তিনি বলেন, ‘আমার জীবনের সবচেয়ে গভীরতম উপলব্ধির একটি ঘটনা এই লামা যাত্রায়। আগে কল্পবাজার সী-বিচ ছিলো আমার মনের বাড়ি। এখন লামা। সেই নতুন বাড়িতে এখন আমি মানস ভ্রমণ করি। অশান্ত সামাজিক পরিস্থিতিতে আমার ভরসা ও ভারসাম্যের নিবাস লামা।’

দৈনিক ইত্তেফাকের সহকারি সম্পাদক জিয়াউল হক ‘পথচারী’ ছদ্মনামে তার লেখা জনপ্রিয় ‘পথে প্রান্তরে’ কলামে গত ২৬ এপ্রিল সংখ্যায় লিখেছেন, এই দুর্গম এলাকায় থাকা-খাওয়ার এমন সুন্দর ব্যবস্থা যে হতে পারে তা ওখানে না গেলে বিশ্বাস করা যেতো না। সেখানে আছে আধুনিক শৌচাগার, নলকূপ, গোসলখানা, বিদ্যুতের জন্যে জেনারেটর। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে শিশুকাননকে। অত্যন্ত দরিদ্র পাহাড়ি সমাজের শিশুদের বিনা খরচে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থায় লেখাপড়া এবং নানা সাংস্কৃতিক প্রশিক্ষণে গড়ে তোলা হচ্ছে এখানে। ভবিষ্যতে তা হয়তো আরও বড় শিক্ষাকেন্দ্রে রূপান্তরিত হবে। নিজস্ব সদস্যদের অর্থায়নে সংগঠিত এই কার্যক্রমগুলো নিঃসন্দেহে জন সেবার কল্যাণবৃত্ত থেকেই উৎসারিত।

এনটিভির বার্তা সম্পাদক ফিলিপস পুরস্কার প্রাপ্ত সাংবাদিক খায়রুল আনোয়ার বলেন, রিসর্ট এলাকার বিস্তৃতি, পরিকল্পিত বিন্যাস দেখে চমকিত হয়েছি। শিশুকানন স্কুলের বাচ্চাদের প্যারেড-ডিসপ্লে ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে অভিভূত হয়েছি। সেখানকার আতিথেয়তাও ছিলো চমৎকার। এই আনন্দময় বেড়ানোর স্মৃতি অনেকদিন মনে থাকবে।

মাসিক সরগম-এর সম্পাদক-প্রকাশক কাজী রওনাক হোসেন বলেন, এত দুর্গম এলাকায় চমৎকার সব আয়োজন আসলে চিন্তার বাইরে ছিলো। এটি দেখার জন্যে একটি মাত্র দিনকে আমার খুব কম মনে হয়েছে।

সপরিবারে এই সফরে অংশগ্রহণ করা ‘আমার দেশ’-এর সিনিয়র রিপোর্টার মাসুদ কামাল ও প্রথম আলোর চীফ রিপোর্টার প্রভাষ আমিনও প্রায় একই ভাষায় বললেন, এত বিচ্ছিন্ন জায়গায় এতটা আধুনিক সুযোগ-সুবিধা প্রত্যাশাই করি নি। বেড়ানোর এটি একটি আদর্শ জায়গা।

দৈনিক দিনকালের সিনিয়র রিপোর্টার মাহমুদা চৌধুরী বলেন, এখানে এত ভালো লেগেছে যে, মনে হয়েছে আরও কিছুদিন থাকি। রিসর্টের কর্মীদের আন্তরিক আতিথেয়তা দীর্ঘদিন মনে থাকবে। নিজের বাড়ির মতোই আপন মনে হয়েছে সবাইকে।

যায়যায়দিন পত্রিকার সহকারি সম্পাদক মোহাম্মদ মাহমুদজ্জামান এই সফরের পর পত্রিকায় শিশুকানন প্রসঙ্গে লেখেন, যে এলাকায় কারো ম্যালেরিয়া রোগ হলে ঐ বাড়িতে অপদেবতা ভর করার অভিযোগে বৈদ্যদের পরামর্শে পুরো বাড়িই পুড়িয়ে দেয়া হয়, এমন একটি সমাজের ছেলেরা যখন শিশুকাননের পক্ষ থেকে পুরো বান্দরবান জেলার মধ্যে মার্চপাস্টসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরস্কার জিতে আসে, তখন বিস্মিত হতে হয় অনেককেই। বঞ্চিতরা সুযোগ পেলে যে কতটা দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে, তার প্রমাণ এই স্কুলের শিশুরা।

নিউজ টুডে ফিচার রিপোর্টার আবু নোমান মাহমুদুর রহমান নিউজ টুডে সাপ্তাহিক ম্যাগাজিন এসকাপেড-এর এক ফিচার রিপোর্টে লেখেন, শিশুকাননের চমকপ্রদ



জাবলে শামস থেকে ফেরার পথে



শিশুকানন স্কুলে কাজী রওনাক হোসেন এবং কবি মুহাম্মদ নূরুল হুদা

দিকটি হলো এখানকার শিশুরা দৈনন্দিন লেখাপড়ার পাশাপাশি প্রশান্ত, আত্মবিশ্বাসী, প্রো-অ্যাকটিভ ও দৃঢ় চরিত্রের মানুষ হয়ে বেড়ে উঠছে যা নিয়মিত মেডিটেশনেরই ফল।

শামীম আরা শিউলী বাংলাদেশ টেলিভিশনের বার্তা প্রযোজক। তিনিও বলেন, চমৎকার ব্যবস্থাপনার শিশুকানন স্কুলটি দেখে আমি অভিভূত। পুরো মেডিটেশন রিসর্টটি অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা হয়েছে বলে মনে হলো। লামার উপর শামীম আরা শিউলীর তৈরি একটি প্রতিবেদন গত ৯ এপ্রিল বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হয়।

সাংবাদিকদের এই ভ্রমণ পর্যটনে আরো যারা সহযাত্রী ছিলেন তারা হলেন, ইত্তেফাকের সহকারি সম্পাদক ফাইজুস সালেহীন, আমার দেশ-এর যুগ্ম বার্তা সম্পাদক হুমায়ুন সাদেক চৌধুরী, সিনিয়র রিপোর্টার শেখ মামুনুর রশীদ, বাসসের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার আনিসুর রহমান, নিউ এজ-এর সিনিয়র রিপোর্টার আবুল কালাম আজাদ ও ভোরের কাগজ-এর স্টাফ রিপোর্টার শীলা আফরোজা, যায়যায়দিনের সহকারি সম্পাদক সজীব ওনাসীস, অনন্যার রিফাত আরা শাহানা, কালের চাকার গোলাম মঈনুদ্দিন কামরুল, শাহিদা আক্তার মুন্না, রহস্য পত্রিকার শেখ মহিউদ্দিন, অর্থ কাগজের প্রণব মজুমদার প্রমুখ।

অতিথি সাংবাদিকরা মেডিটেশন রিসর্ট, শিশুকানন স্কুল, বিভিন্ন পাহাড়, মেডিটেশন মঞ্চ, বার্না ও নিবিড় প্রকৃতি দেখে অভিভূত। তাদের অনেকেই আবারও যাওয়ার প্রবল আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

লামা ভ্রমণকারী সাংবাদিকদের অনুভূতির এই বিবরণের উপসংহার টানা যায় ৯ এপ্রিল দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত এর সহকারি সম্পাদক আমিনুর রহমান সরকারের একটি লেখার কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে। ‘লামা মেডিটেশন রিসর্ট এককথায়— ভারী সুন্দর। যাত্রীদল যখন যা প্রয়োজন মনে করেছে হাতের কাছে পেয়েছে। মনে হচ্ছিলো— ‘সব পেয়েছি’র দেশে এসে গেছি সবাই। জেনারেটরের সাহায্যে বিজলী বাতি জ্বলছে। পানির ট্যাংকি নেই, কিন্তু ট্যাংক খুললেই পানি আসছে। পাহাড়ের নিচ থেকে পানির ফোয়ারা উঠছে আপনা-আপনি। ধ্যানের পাশাপাশি শিক্ষা চলছে, চিকিৎসা চলছে, বনায়ন চলছে। ছোট জায়গায় বিশাল আয়োজন, সাধারণ জঙ্গলের ভেতরে অসাধারণ কর্মযজ্ঞ।’

প্রতিবেদক : শিমুল মাহমুদ



একটি কটেকের সামনে সমবেত সবাই



জাবলে শামসের মঞ্চ মেডিটেশনে মগ্ন (সামনের সারির ডান থেকে) সজীব নিউজ টুডে আর নোমান মাহমুদুর রহমান, যায়যায়দিনের মোহাম্মদ মাহমুদজ্জামান (পেছনের সারির ডান থেকে) প্রথম আলোর প্রভাষ আমিন, যায়যায়দিনের সজীব ওনাসীস, দিনকালের মাহমুদা চৌধুরী এবং আমিনুর রহমান সরকার এবং বাসসের আনিসুর রহমান।

প্রশ্ন : স্বামী আমাকে ও আমার ছেলেকে শত্রুর মতো দেখেন। উনি প্রচুর উপার্জন করেন ও বিদেশে ঘোরেন। কিন্তু বিদেশে যাওয়ার সময় টাকা ও চেকবই ভতিজাকে দিয়ে যান। অন্যদের জন্যে টাকা পয়সা বেহিসেবে খরচ করলেও আমাদের জন্যে ন্যূনতম হাত-খরচ দিতেও তার অনীহা। পরকাল, সমাজ ও সংসারের ভয়ে ডিভোর্স দিই নি।

উত্তর : আসলে সমাজ, সংসার বা পরকাল— এগুলোর অজুহাত দেয়া অর্থহীন। স্বামীকে ডিভোর্স দেয়ার ক্ষেত্রে আপনার মূল বাধা হলো অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের অভাব। কারণ স্বামী যদি স্ত্রীকে মর্যাদা না দেয়, তাকে ক্রমাগত দাবিয়ে রাখে, তাহলে একজন স্ত্রীর উচিত সেই অসম্মানের জীবন থেকে নির্দিধায় বেরিয়ে আসা। কারণ আত্মসম্মানবোধকে জলাঞ্জলি দিয়ে কখনো মানুষের মতো জীবন যাপন করা যায় না। কিন্তু আপনাকে তা-ই করতে হচ্ছে, কারণ এছাড়া আপনার আর কোনো উপায় নেই। নিজস্ব অর্থনৈতিক ভিত্তি না থাকার কারণেই স্বামীকে ডিভোর্স না দেয়ার জন্যে আপনাকে সমাজ, সংসার বা পরকালের ঠুনকো অজুহাত দেখাতে হচ্ছে। আর এখানেই লেখাপড়া শিখে যোগ্য হওয়ার, আত্মপরিচয় সৃষ্টির গুরুত্ব।

প্রশ্ন : আমার স্বামীর সাথে সুখকর সম্পর্ক কিছু খুঁজে পেলাম না। বিয়ে হয়েছে ৩২ বছর। প্রথম বছরই মার খেয়েছি। পেয়েছি শাস্তি, দেবর, ননদের যাতনা। ওরাই বিচার দেয়, আমাকে মার খাওয়ায়। আমার ছেলেরা বোবা দৃষ্টিতে আমাকে মারতে দেখে। আর ভাবে, পৃথিবীটা কী নির্মম। যদি ওরা বাধা দিতে আসে, তবে ওদেরও মারে।

উত্তর : ৩২ বছর পরে তো এ কথাটা সত্যি হওয়া উচিত নয়। আপনার ছেলে-মেয়ের বয়স এখন নিশ্চয়ই ২৫-২৭ বছর। এ বয়সী কোনো ছেলে বা মেয়ে কেন বোবা দৃষ্টিতে তার মাকে মার খেতে দেখবে? আপনি যদি তাদেরকে সেভাবে লালন করতে পারতেন, আপনার প্রতি সমবাহী করতে পারতেন, তাহলে আপনি মার খাওয়ার সময় আপনার আর তার বাবার মাঝখানে এসে বলতে পারতো, বাবা, মাকে মারার আগে আমাকে মারো। অর্থাৎ আপনি আপনার অধিকার বা মর্যাদা সম্পর্কে নিজেই সোচ্চার হতে পারেন নি এবং এর মূল কারণ হলো আপনার আত্মপরিচয়হীনতা, নিজস্ব অর্থনৈতিক ভিত্তি না থাকা।

প্রশ্ন : আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার সমস্যা হলো বোঝাপড়ার অভাব। সে আমাকে বুঝতে পারে না বা বুঝতে চায় না। আমি যে কাজগুলো অপছন্দ করি, বেছে বেছে সে সেগুলোই করে। এ নিয়ে কিছু বলতে গেলেও বগড়া বেঁধে যায়। ফলে আমি খুব মানসিক দ্বন্দ্ব আছি।

উত্তর : অন্যরা আমাকে বুঝুক— এটাই আমরা সবসময় চাই। অন্যরা আমাকে বোঝার আগে আমিই তাদের বুঝি— এই দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ মমতা, সমমর্মিতার দৃষ্টিভঙ্গিকে ধারণ করতে পারি না। যেমন, আপনার স্ত্রীর প্রতি যদি সমমর্মী হতে পারতেন, যদি বুঝতে চাইতেন কেন তিনি সবসময় আপনার বিরোধিতা করেন, তাহলে এই দূরত্ব থাকতো না। তার প্রতি আপনার নিঃশর্ত ভালবাসা ও দেয়ার মনোভাব থাকলে কখনোই এই দ্বন্দ্ব চলতে পারতো না, কারণ নিঃস্বার্থ ভালবাসার শক্তিই এমন যে, তা অপরপক্ষের মধ্যে ভালো হওয়ার শক্তিকে জাগ্রত করে। আর এটা তখনই সম্ভব যখন মানুষটিকে আপনি তার আচরণ থেকে আলাদা করতে পারবেন। তাই আপনার স্ত্রীকে মমতা-ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখুন, বুঝতে চেষ্টা করুন। দেখবেন তা তাকে স্পর্শ করবেই। তখন এমন প্রতিদান পাবেন যা আপনি কল্পনাও করেন নি। কারণ

পরিবার ও সুসম্পর্ক বিষয়ক প্রশ্ন

উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

অন্যরা আমাকে বুঝুক— এটাই
আমরা সবসময় চাই। অন্যরা
আমাকে বোঝার আগে আমিই
তাদের বুঝি— এই দৃষ্টিভঙ্গি
ধারণ করতে পারি না।

যখন দুই তরফ থেকেই মমতা-প্রেম নিঃশর্ত হয়, তখনকার যে আনন্দ তা কোনো চুক্তিনামা দিয়ে অর্জন করা সম্ভব নয়, ধমক, চাবুক বা তলোয়ার দিয়ে হাসিল করা সম্ভব নয়।

প্রশ্ন : আমার ৫ বছরের ছেলটি খুবই দুরন্ত। সবকিছু নিয়েই সে জেদ করে। বলা যায় সারাক্ষণ তাকে নিয়ে আমি তটস্থ থাকি। কখন কি চেয়ে বসে; না দিতে পারলে ক্ষেপে যাবে, অন্যের সামনে হেনস্থা করবে ইত্যাদি।

উত্তর : বাচ্চারা অনেক সময় চাওয়ার জন্যেই চায়। সে-ও জানে সব চাওয়া পাওয়ার নয়। কিন্তু আপনি যদি তার সব চাওয়াই পূরণ করে দেন, তখনই সে আহ্লাদ পায় এবং বঞ্চে যায়। কারণ খুব সহজে পাওয়া যায় বলে সে ঐ জেদ করতেই অভ্যস্ত হয়ে যায়। আর শিশুবয়সেই এই আচরণ বা বদভ্যাসগুলোকে শোধরানোর সুযোগ। কাজেই সে যত বিদ্রোহী হয়ে উঠুক না কেন সন্তানের মঙ্গলার্থে দৃঢ় হতে ভয় পাবেন না। আসলে আপনার এই দৃঢ়তা প্রকারান্তরে তার মধ্যে নিরাপত্তাবোধেরই সৃষ্টি করবে।

তবে অন্যদের সামনে বকবেন না বা ভুল ধরিয়ে দেবেন না। আর তার যোগ্যতা নিয়ে কোনো নেতিবাচক কথা তাকে বলবেন না। কখনো বলবেন না যে, তার দ্বারা কিছু হবে না। এতে করে তার আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যাবে এবং সে ভুল বা বোকামী করতে শুরু করবে। যে বোকামীর মাশুল আসলে আপনাকেই দিতে হবে।

প্রশ্ন : বাচ্চাকে সময় দিয়ে নিজের পড়াশোনা ও আত্মিক উন্নয়নের জন্যে সময় দিতে পারছি না। এর সমাধান কি?

উত্তর : এটা আপনার আগেই ভাবা উচিত ছিলো। একটি বিষয় মনে রাখবেন, বাচ্চা যেহেতু আপনার আছে, তাই তাকে সময় দেয়া আপনার আত্মিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত। এখানে যদি গাফিলতি করেন আপনার আত্মিক উন্নয়ন হবে না।

তার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেবার পর আত্মিক উন্নয়নে যতটা সময় দেয়া যায় দেবেন। আর যদি আত্মিক উন্নয়নই আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে বাচ্চা নেবেন না। কিন্তু বাচ্চা আসবে, অথচ তাকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার জন্যে দায়িত্ব পালন করবেন না— তখন আপনি একজন অপরাধী

হিসেবে গণ্য হবেন।

প্রশ্ন : ভদ্রবেশী মিথ্যুক, প্রতারকদের সম্পর্কে কিছু বলুন যারা মনে করে যত বেশি মেয়ের সাথে মেলামেশা করা যাবে ততই স্ট্যাটাস বাড়বে। এ ব্যাপারে আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকায় একসময় অনেক রাগ-ক্ষোভ ছিলো। অবশ্য কোর্স করে তা থেকে মুক্ত হয়েছি।

উত্তর : প্রতারকরা সবসময় ভদ্রবেশী এবং মিষ্টভাষীই হয়। তারা অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু প্রতারিত হওয়াটাও খুব সম্মানের নয়। কারণ এটা প্রমাণ করে যে তুমি মিথ্যুক ও ঠকবাজের মিথ্যা, মনভুলানো কথাকে কোনো বিচার-বিবেচনা না করেই বিশ্বাস করেছো, প্রভাবিত হয়েছো। যা বোকাদের কাজ। যদি যুক্তি-বুদ্ধির ন্যূনতম প্রয়োগ করতে, তাহলেই মনে প্রশ্ন জাগতো, হঠাৎ করে অচেনা-অজানা একজন লোক কেন এত আগ্রহী হয়ে উঠলো, কি তার মতলব। তখনই সত্যটা ধরা পড়তো। কাজেই প্রতারকরা শাস্তিযোগ্য, কিন্তু প্রতারিতও তার বোকামীকে অস্বীকার করতে পারবে না।

প্রশ্ন : আমার বাবা-মা দু'জনই চাকরিজীবী। আমার বাবা মাকে কখনো হাত-খরচ দেন না। মায়ের মন এতে খারাপ থাকে। বাবার এ কাজটি করা কি ঠিক?

উত্তর : অবশ্যই ঠিক নয়। কিন্তু তোমার মা-ও যেহেতু চাকরি করছেন, তিনি কি তোমার বাবাকে হাত-খরচ দেন? তার স্বামী যে তাকে হাত-খরচ দেন না, এটা তাকে চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয়ার জন্যেই তার এটা করা উচিত। প্রতি মাসে কিছু টাকা স্বামীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে তিনি বলতে পারেন, বুঝতে পারছি তোমার খুব টানাটানি যাচ্ছে। এই নাও তোমার হাত-খরচের জন্যে ১০০ টাকা দিলাম।

আসলে স্ত্রীকে না চাইতেই পর্যাপ্ত হাত-খরচ দেয়া এবং তা কীভাবে খরচ হলো জানতে না চাওয়া একজন স্বামীর ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদাকেই তুলে ধরে।

প্রশ্ন : আমরা স্বামী-স্ত্রী দু'জনই চাকরি করি। আমাদের চার বছর বয়সী একটি মেয়ে রয়েছে। সবকিছুর প্রতি তার সীমাহীন কৌতূহল। আমাদেরকে সামনে পেলেই সে একের পর এক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে থাকে ক্রান্তিহীনভাবে। মাঝে মাঝে বিরক্ত লাগে। ধমক দিয়ে থামিয়ে দিই। এটা কি ঠিক?

উত্তর : এ কাজটি কখনো করবেন না। কারণ শিশু মনের স্বাভাবিক কৌতূহল থেকে সে যে প্রশ্নগুলো করছে এর উত্তর আপনার কাছ থেকে না পেলে সে অন্য কারও কাছে জানতে চাইবে। এবং বেশির ভাগ সময়ই সে ভুল জবাব পেয়ে ঐ ভুলটাকেই বিশ্বাস করবে। আর তাছাড়া জীবন, জগত, ধর্ম, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ইত্যাদির শাস্ত্র, সুন্দর কথাগুলো সম্পর্কে ধারণা দেয়ার এরকম চমৎকার সুযোগ আপনি আর পাবেন না, যা পেতে পারেন একটি শিশুর কৌতূহল মেটাবার সুযোগে।

আর বাচ্চাকে সবসময় ভালো আলোচনায় শরীক করবেন। আপনি কর্মজীবী হোন আর যত ব্যস্ত থাকুন, সন্তানকে সময় দেয়ার গুরুত্ব আপনাকে বুঝতে হবে। কারণ একটা পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, আমেরিকান শিশুরা যেখানে গড়ে প্রতিদিন ৭ ঘণ্টা টিভি দেখে সেখানে বাবার সাথে কথা বলে মাত্র ৫ মিনিট। আর টেলিভিশনের এসব অশ্লীল, উত্তেজক বা মারামারির দৃশ্য ক্রমাগত দেখতে দেখতে এই বাচ্চারাও হয়ে উঠছে বিকৃত রুচির অসুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন। আমাদের দেশের আধুনিক কর্মব্যস্ত মা-বাবাদের সন্তানরাও এখন এই প্রবণতার দিকেই ঝুঁকছে। এখনই সচেতন না হলে আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের পরিণতিও এর চেয়ে ভালো কিছু হবে না।

ফাউন্ডেশন সংবাদ

রাজশাহী সেন্টার

বিশেষ দায়িত্বশীল বৈঠক

গত ৬ জুন, ২০০৪ রবিবার রাজশাহী সেন্টারে বিশেষ দায়িত্বশীল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সেন্টারের পরিচালক জনাব কায়সার পারভেজ মেহেদী স্ট্রটার করুণা ও রহমত প্রাপ্তির নেপথ্যে মাটির ব্যাংক বিতরণের ভূমিকা উপস্থাপন করেন। এ বৈঠকে সেন্টারের ৬৮ জন দায়িত্বশীল অংশগ্রহণ করেন।

দাফন কার্যক্রম শুরু

স্বচ্ছ দাফন কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়েছে গত ২৭ এপ্রিল, একজন অজ্ঞাত পরিচয় পথচারীর লাশ দাফনের মধ্য দিয়ে। তারই ধারাবাহিকতায় গত ১৩ মে একজন দরিদ্র মহিলার লাশ দাফন করা হয়।

ইংরেজী ভাষা শিক্ষা কোর্স

দায়িত্বশীলদের (অফিস ডিউটি) ইংরেজী ভাষায় দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে গত ৫ জুন, ২০০৪ হতে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা কোর্স শুরু হয়েছে। কোর্সটির উদ্বোধন করেন সহযোগী অধ্যাপিকা রোকেয়া বেগম।

শিশুসদনে দুই নতুন অতিথি

গত ২৩ মে শিশুসদনে এসেছে দুই নতুন অতিথি। যমজ এই দুই কন্যা শিশুসহ শিশুসদনের শিশুর সংখ্যা এখন তিন।

এসোসিয়েট কার্যক্রম

প্রতি সোমবার বিকেল ৫:৩০টায় এসোসিয়েটদের জন্যে একটি বিশেষ প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ অনুষ্ঠানে মেডিটেশন বিষয় ভিত্তিক আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

সিলেট সেন্টার

১৮১ ব্যাচের নবীন বরণ

গত ৪ জুন ২০০৪ সিলেটে মিরের ময়দানস্থ সেন্টারের নিজস্ব হলে ১৮১ ব্যাচের নবীন গ্রাজুয়েট বরণ অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এতে ৭৮ জন নবীন গ্রাজুয়েটকে বরণ করে নেয়া হয়।

সু নামগঞ্জ সেলের নতুন মেডিটেশন কক্ষ উদ্বোধন

গত ৪ জুন শুক্রবার সু নামগঞ্জ সেলের নতুন অফিস ও মেডিটেশন কক্ষ উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধন করেন সু নামগঞ্জের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর আব্দু মিয়া।

নতুন ঠিকানা : সু নামগঞ্জ সেল

২৪, মোহনা (আলফাত ভবনের বিপরীতে)

পুরাতন বাস স্টেশন, সু নামগঞ্জ-৩১০০।

ফোন : ০৮৭১-৫৫৩৯২, ০১৭২-২৭৩৬২৬



যশোর সেলে এক মত বিনিময় সভায় গুরুজীর সঙ্গে সেলের পরিচালক ও অন্যান্যরা

খুলনা সেল

গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ

গত ২৮ মে, শুক্রবার খুলনা সেলের উদ্যোগে হোটেল রয়েল ইন্টারন্যাশনালে অনুষ্ঠিত হয় এক গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ।

‘পারিবারিক সুখের জন্যে করণীয়’ বিষয়ে গুরুজীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত এ ওয়ার্কশপে অংশ নেন ৫৫ জন গ্রাজুয়েট।

১৮২ ব্যাচের পরিচিতি সভা ও কোর্স

গত ২৯ মে, শনিবার খুলনা সেলের উদ্যোগে খুলনার হোটেল রয়েল ইন্টারন্যাশনালে অনুষ্ঠিত হয় ১৮২ ব্যাচের পরিচিতি সভা, যাতে অংশ নেন ১০৬ জন। এ ব্যাচের কোর্স অনুষ্ঠিত হয় ৪, ৫, ৬ ও ৭ জুন। এটি এক অনন্য ব্যাচ। এতে মহিলা শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ ছিলো পুরুষ শিক্ষার্থীদের দ্বিগুণেরও বেশি।

যশোর সেল

গুরুজীর যশোর সেল পরিদর্শন

গত ৩০ মে, ২০০৪ সকাল ১০টায় গুরুজী যশোর সেল পরিদর্শন করেন। সেলে গুরুজীর প্রথম আগমন উপলক্ষে এক উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হয়। এ সময়ে তিনি স্থানীয় গ্রাজুয়েটদের সাথে কুশল বিনিময় ও দিক-নির্দেশনামূলক আলোচনা শেষে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ প্রদান করেন।

১৮৩ ব্যাচের পরিচিতি সভা ও কোর্স

গত ৩০ মে, ২০০৪ যশোর জেলা স্কুল অডিটোরিয়ামে কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশন কোর্সের ১৮৩ ব্যাচের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জীবন যাপনের বিজ্ঞান কোয়ান্টাম মেথডের পরিচিতি তুলে ধরেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। দেড় ঘণ্টাব্যাপী এ সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

পরবর্তীতে যশোরে ১৮৩ ব্যাচের কোর্স অনুষ্ঠিত হয় ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ জুন। হাসান ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের অনুষ্ঠিত এ কোর্সে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

হালিশহর বড়পোল সেলের ওয়ার্কশপ

গত ২১ মে, ২০০৪ শুক্রবার হালিশহর বড়পোল সেলের আয়োজনে ‘অগ্রসর গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ’ অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী এ ওয়ার্কশপে ৪৩ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

ওয়ার্কশপে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করেন প্রিন্সিপাল আলমগীর চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার কাজী আরিফুল ইসলাম, জনাব রায়হান উদ্দীন খান, ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ুন কবির, জনাব মাহমুদুর রহমান ও জনাব মুজিবুর রহমান।

উত্তরা শাখার ওয়ার্কশপ

গত ১১ জুন সারাদিনব্যাপী উত্তরা শাখায় অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক ওয়ার্কশপ। এতে ফাউন্ডেশনের ২০০৩-২০০৪ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক এবং মাটির ব্যাংক ও অন্যান্য কার্যক্রম নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন কেন্দ্রীয় আলোচক রাবিয়া নাজরীনসহ শাখার পরিচালক ও দায়িত্বশীলবৃন্দ।

নারায়ণগঞ্জ সেলের উদ্যোগে ব্লাড ক্যাম্প

গত ২৯ মে, ২০০৪ শনিবার নারায়ণগঞ্জের চাষাডাঙ্গ রাইফেল ক্লাবে নারায়ণগঞ্জ সেলের উদ্যোগে কোয়ান্টাম স্বচ্ছ রক্তদান ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

ক্যাম্প উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট সমাজসেবক ও সাবেক পৌর ভাইস চেয়ারম্যান জনাব আসগর হোসেন ডুইয়া। বিশেষ অতিথি ছিলেন সুধীজন পাঠাগারের সভাপতি বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সমাজসেবক জনাব কাশেম জামাল। দিনব্যাপী এ ক্যাম্পে ৬৫ ব্যাগ রক্ত সংগৃহীত হয়।



নারায়ণগঞ্জে ব্লাড ক্যাম্পে রক্ত দিচ্ছেন ফটো সাংবাদিক জিয়াউল হক শান্ত

আবশ্যিক

দেশের যে কোনো এলাকায় কাজ করতে আগ্রহী প্রো-অর্গানাইজার এবং লামা শিশুকাননের জন্যে শিক্ষক ও এমবিবিএস ডাক্তার আবশ্যিক। আগ্রহীরা নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন : কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ১১৯/পি শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭।

মেধার বিকাশে, সাফল্য অর্জনে : মেধায়ন ও সাফল্যায়ন

কোয়ান্টায়ন পরিবারের নতুন দুই অতিথি মেধায়ন ও সাফল্যায়ন। মেধায়নে মেধার বিকাশ হয়। এখানে পড়া আয়ত্ত হয় তাড়াতাড়ি। পরীক্ষার অন্তত একমাস আগে মেধায়ন করা উচিত প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর এবং পরীক্ষা শেষে সাফল্যায়ন করা উচিত।

পরীক্ষার পরেও কিছু বিষয়ের ওপর নির্ভর করতে হয়— নিরীক্ষকের মেজাজ যেন ভালো থাকে, রেজাল্ট শীটে যেন সমস্যা না হয় ইত্যাদি। এভাবেই গুরুজী মেধার বিকাশ ও সাফল্য অর্জনের জন্যে মেধায়ন ও সাফল্যায়নের গুরুত্ব তুলে ধরেন “সার্বিক সাফল্য লাভে কোয়ান্টায়নের প্রক্রিয়া” শীর্ষক ওয়ার্কশপে।

মেধার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ সাধনে মেধায়ন এবং সাফল্যকে নিজের জন্যে সহজলভ্য করে তুলতে সাফল্যায়ন। মেধায়ন ও সাফল্যায়নে শিক্ষার্থীদের জন্যে বিশেষভাবে তৈরি রুটিন অনুসরণ করা হয়।

শ্রুতির কাছে জ্ঞান বৃদ্ধির প্রার্থনা এবং প্রাপ্ত জ্ঞান দ্বারা মানুষের কল্যাণ অবলোকনের মাধ্যমে শুরু হয় মেধায়ন। তারপর সম্পূর্ণ শান্ত ও নীরব পরিবেশে আলফা লেভেলে মৌনতায় একটি একটি করে বিষয়ের পড়া অবলোকনের মাধ্যমে পড়া বিশেষভাবে আত্মস্থ করা হয়।

শুরুতেই জ্ঞানের জন্যে প্রার্থনা হয় সাফল্যায়নেও। তারপর সাফল্যের জন্যে, অনন্য মানুষ হওয়ার জন্যে মনছবি অবলোকন, নিজের কাজ বিশ্লেষণ, ভুল শনাক্তকরণ ও পরীক্ষা সফল হওয়ার জন্যে দোয়ার মাধ্যমে অতিবাহিত হয় সাফল্যায়ন।



মেধায়ন ও সাফল্যায়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করে শিক্ষার্থীরা এতে অংশ নিচ্ছেন নিয়মিতভাবে। দুইবার মেধায়নে অংশ নেয়া বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র কাজী শামীম তার অনুভূতি ব্যক্ত করে বলেন, “বাসায় পড়ালেখা করলে যে

সমস্যা ও ঘাটতি থাকে সেটা বুঝেছি প্রথমবার মেধায়ন করেই। এখানে যে ফিল্ডটা পাওয়া যাচ্ছে সেটা বাসায় পাওয়া যায় না। অবলোকনের মাধ্যমে একটি বিষয়কে যেভাবে আত্মস্থ করা যায় সেটা মুখস্থ করে সম্ভব নয়। ফিজিক্সে একটু ভীতি ছিলো। মেধায়ন করার পর সেই ভীতি কেটে গিয়ে দেখা দিয়েছে এক ধরনের আত্মহা। তা ছাড়া মেধায়নের ফলটা পরীক্ষা দিতে এসে আরও ভালো বোঝা যাচ্ছে। কোনো রকম নার্ভাসনেস ছাড়াই চমৎকার পরীক্ষা দিতে পারছি।” ১৩৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট কাজী শামীম এবার এইচ.এস.সি পরীক্ষা দিয়েছেন।

“আমি বিসিএস প্রিলিমিনারী পরীক্ষার আগে মেধায়ন ও পরে সাফল্যায়ন করেছি। আমি দু’বারেই পাশ করেছি” দুইবার মেধায়ন ও একবার সাফল্যায়নে অংশ নেয়া ছাত্রী তাহিনিয়া রহমান চৌধুরী বলেন, “মেধায়ন ও সাফল্যায়নের ব্যাপারে আমার অনুভূতি হলো— এতে আত্মবিশ্বাস বাড়ে, ঠাণ্ডা মাথায়া পরীক্ষা দেয়া যায় এবং অনেক অল্প সময়ে প্রস্তুতি নেয়া সম্ভব হয়। প্রার্থনার অংশগুলো খুব ভালো লেগেছে। এই প্রার্থনাই আত্মবিশ্বাসকে

জাগিয়ে তোলে ও সাফল্যের ব্যাপারে করে তোলে আত্মপ্রত্যয়ী। মেধায়নে চারটি দিন অনেক কাজে আসে। মেধায়ন না করলে কী পড়তে হবে, কিভাবে পড়তে হবে, এসব হাতড়ে মরতাম। এখানে সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা নিজে থেকেই পাওয়া যায়।” ১৩৫ ব্যাচের এ গ্রাজুয়েট আরও বলেন, “পরীক্ষায় ভালো করার জন্যে মেধায়ন যেমন জরুরী, সাফল্যায়নও জরুরী। সাফল্যায়নে নিজের সাফল্যের মনছবির পাশাপাশি সৃষ্টির কল্যাণে কাজ করার ও জীবনে সার্বিক সাফল্যের মনছবি ও আন্তরিক প্রার্থনা সাফল্যের পথকে সহজ করে দেয়।”



মানবিক বিভাগ থেকে অংশ নেয়া এইচ.এস.সি পরীক্ষার্থী দিলরুবা খানম তাপসী বলেন, “মেধায়ন করার পর পড়ার ক্ষমতা বেড়েছে। অনেকক্ষণ বসে পড়তে পারছি। মনে রাখার ক্ষমতাও বেড়েছে অবিশ্বাস্য ভাবে।”

দিলরুবা খানম তাপসী ১৬৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট। বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী শাহনাজ লতিফ বলেন ভিন্নভাবে, “পড়া দ্রুত হয়। মনোযোগ থাকে বেশি। তবে এখানে রিভাইজ হয় সবচেয়ে ভালো। ভিজুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে পূর্বের পড়াটাকে অনেক সহজে আত্মস্থ করা যায়।

প্রার্থনার অংশটুকু অত্যন্ত ভালো লেগেছে। প্রার্থনার পর মনে হচ্ছে আমি এখন পারবো।” তিনি ১৬০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।



মেধায়নে অংশ নেয়া ফাতেমা-তুজ-জোহরা বলেন, “সময় আরো বেশি হলে ভালো হতো। কারণ এখানের সময়টুকু পুরোটাই পড়ার কাজে ব্যয় হয়। পড়া হচ্ছে দ্রুত। আত্মস্থ হচ্ছে সহজে। বাসায় হলে সময় নষ্ট হয় অনেক বেশি। তাছাড়া মেধায়ন করার পর আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়েছে।” তিনি ১৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট।

মেধায়ন ও সাফল্যায়নের ফলে যে সাফল্য দেখা যাচ্ছে, তার ফলে শিক্ষার্থীরা অত্যন্ত আত্মহের সাথে এতে অংশগ্রহণ করে বেছে নিচ্ছে সাফল্যের পথে সহজ পথ।

প্রতিবেদক : শাহেদ হাসনাইন রাবিত

বিশেষ হিলিং-এ সাফল্য ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ূন কবীর

আমার ভাগ্নি সুরাইয়া বিলকিছ। সে কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট, ঢাকার মিরপুরে থাকে। ১৯৯১ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় স্বামী মারা যান ২টি শিশু সন্তান রেখে। অর্থকষ্ট, নিরাপত্তাহীনতার সাথে



যোগ হয় স্বামীর পেনশন তোলা নিয়ে জটিলতা, বাড়ি থেকে উচ্ছেদের জন্যে সন্ত্রাসীদের হুমকি ও মামলা সংক্রান্ত ঝামেলা। দীর্ঘ দিন ধরে সে একাই এসব মোকাবিলা করে আসছিলো।

ছোট একটি টিনশেড ঘরে তার বসবাস। আশপাশের এরকম বাড়ির প্রায় সবাই নির্ধারিত টাকা পরিশোধ করে নিজ নামে সরকার থেকে রেজিস্ট্রি করিয়ে নিয়েছে। কিন্তু সুরাইয়া বিলকিছ চেষ্টা ও তদবীর-এর অভাবে তার নামে বরাদ্দ পাচ্ছে না। চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা নিয়ে দিনাতিপাত করছিলো সে।

এছাড়া দীর্ঘদিন যাবত সে হাটের সমস্যায় ভুগছিলো। অপারেশন না করলে তার জীবনের স্থায়িত্ব ৩/৪ মাস। অপারেশনের জন্যে প্রয়োজন আড়াই লক্ষ টাকা। কিন্তু এ পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের সাধ্য তার নেই। এমনি এক অবস্থায় সমস্যাগুলোর ব্যাপারে শ্রুতির রহমত কামনা করে চট্টগ্রাম সেন্টারে হিলিং সেশনে তার নাম দেয়া হলো এবং সে হিলিং এখনো চলছে। হিলিং শুরু হওয়ার তিন মাসের মধ্যে ১ম সমস্যার সমাধান হলো অর্থাৎ বাড়িটি তার নামে বরাদ্দ ও রেজিস্ট্রি হলো।

২য় সমস্যার সমাধান হলো এভাবে— বিভিন্ন ডাক্তারের সাথে পরামর্শক্রমে অপারেশনের ব্যয় আড়াই থেকে দেড় লাখে নেমে এলো। অপ্রত্যাশিতভাবে তার ক’জন আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্ক্ষী চিকিৎসার ব্যয় বহন করতে এগিয়ে এলো। ২৯ মার্চ ২০০৪ ওপেন হার্ট সার্জারি হলো এবং আত্মাহুর রহমতে ৭ এপ্রিল ২০০৪-এ সুস্থ হয়ে ঘরে ফিরে আমাকে ফোন করলো— মামা, আমি সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরেছি।

আনন্দে এবং পরম করুণাময়ের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার চোখ ভিজে উঠলো।

[চট্টগ্রামের অবসরপ্রাপ্ত প্রকৌশলী, ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ূন কবীর ৪৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

দেড় মাসে ৫ কেজি ওজন কমলো ডা. নীলিমা

আমার মাত্রাতিরিক্ত ওজন নিয়ে বেশ চিন্তিত ছিলাম। ওজন কমানোর এক্সারসাইজের জন্যে বেশ কিছু যন্ত্রপাতিও কিনে ফেললাম। কিন্তু কিছুতেই কাজ হচ্ছিলো না। অবশেষে কোয়ান্টাম ব্যায়ামে ভর্তি হলো। ইস্ট্রাস্ট্র-এর আন্তরিক চেষ্টায় ব্যায়ামগুলো ভালোই আয়ত্ত্ব করলাম। নিয়মিত আধা ঘণ্টা ব্যায়াম করতে লাগলাম। দেড় মাসে ৫ কেজি ওজন কমে গেল। আমি অবাক। নিয়মিত ব্যায়ামের ফলে বিভিন্ন জয়েন্টে পেইন, হাঁটা-চলার কষ্টও দূর হয়ে গিয়েছে।

[ডা. নীলিমা পায়োনিয়ার ব্যাচের প্রো-মাস্টার]

বিপন্ন মানবতার পাশে দাঁড়ান

ফাউন্ডেশনের রিলিফ ফান্ডে কমপক্ষে আপনার একদিনের আয় দান করুন



সারাদেশ আজ এক ভয়াবহ দুর্ঘোণের সম্মুখীন। দেশের দুই তৃতীয়াংশ জনপদ এখন বন্যাকবলিত।

কয়েক কোটি মানুষ হয়ে পড়েছে গৃহহারা, সম্বলহীন। এই আত মানবতার সেবায় মায়ের মমতা নিয়ে এগিয়ে আসুন। বিশেষ ত্রাণকাজ পরিচালনার জন্যে ফাউন্ডেশনের রিলিফ ফান্ডে মুক্ত হস্তে দান করুন। শুকনো খাবার, ওষুধ, বস্ত্র ও অর্থ শাখা/সেল, সেন্টার বা কেন্দ্রীয় অফিসে জমা দিন।

ফাউন্ডেশনের সকল কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার ও এসোসিয়েটদের উদ্দেশ্যে এ আহ্বান জানিয়েছেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। তিনি সবাইকে নিজ নিজ সাধ্যমতো এবং সম্ভব হলে প্রত্যেকের কমপক্ষে এক দিনের আয় বা ব্যয়ের অর্থ এই রিলিফ ফান্ডে দান করার জন্যে সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

ত্রাণ কাজ পরিচালনার জন্যে ফাউন্ডেশনে গঠিত হয়েছে বিশেষ রিলিফ টিম। জনাব সি.এম কামরুন্নাহ মুনীরকে আহ্বায়ক ও জনাব মোহাম্মদ নাসিমুদ্দীনকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে গঠিত এ টীমে সদস্য হিসেবে আরও রয়েছেন সকল শাখার পরিচালকবৃন্দ।

ইতোমধ্যেই সারা দেশে ৬ শতাধিক প্রো-কোয়ান্টামের ও স্বেচ্ছাকর্মী স্যালাইন তৈরি, রিলিফ সংগ্রহ, বিতরণ ও ত্রাণ কাজে অংশ নিচ্ছেন। প্রতিদিন গড়ে ৫ হাজার ব্যাগ খাবার স্যালাইন তৈরি করছেন। সিলেট, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিতরণ করা হচ্ছে চিড়া, মুড়ি, শুকনো খাবার, খাবার স্যালাইন, পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও বস্ত্র।

১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের সকল সদস্য যে আন্তরিকতা ও নিঃস্বার্থ সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করেছিলেন এবারের দুর্ঘোণেও তারা সে সেবা ও আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে আসবেন বলে গুরুজী আশা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় স্যালাইন প্রকল্পে অত্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে ৪৩ শিফট কাজ করে প্রায় এক লক্ষ স্যালাইন প্রস্তুতিতে দেড় শতাধিক প্রো-কোয়ান্টামের অংশগ্রহণ করেন। ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরণে অংশ নেন দুই শতাধিক সদস্য। ফাউন্ডেশন উচ্চ শক্তিসম্পন্ন তিন লক্ষ পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বিতরণ করে, যার পানি শোধন ক্ষমতা ছিলো বাজারে প্রচলিত ২০ লক্ষ ট্যাবলেটের সমান। এছাড়াও দুর্গতদের মধ্যে বিপুল পরিমাণ চাল-ডাল, কাপড়, ওষুধ বিতরণ ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়।

কোয়ান্টাম পরিবারের প্রিয় সদস্য / সহযোগী, মহাপ্রবনে বিপন্ন মানবতার পাশে দাঁড়াতে—

- ☐ প্রতিদিন মেডিটেশনে দুর্গত মানুষের দুর্দশা মোচনের জন্যে বিশেষ প্রার্থনা করুন।
- ☐ অপ্রয়োজনীয় খরচ ও আনন্দ উৎসব বর্জন করে কোয়ান্টাম রিলিফ ফান্ডে অর্থ জমা দিন।
- ☐ নিজের মাসের খরচ থেকে বাঁচিয়ে সে অর্থ রিলিফ ফান্ডে জমা দিন।
- ☐ নিজের বা পরিবারের

কাপড়-চোপড় জমা দিন।

- ☐ আত্মীয় ও বন্ধুদের কাছ থেকে চাল, ডাল, কাপড়-চোপড়, ওষুধ, শুকনো খাবারসহ যে কোনো ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করে ফান্ডে জমা দিন।
- ☐ ফাউন্ডেশনের খাবার স্যালাইন তৈরি প্রকল্পে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে সহযোগিতা করুন।
- ☐ ত্রাণ সামগ্রী যথাযথভাবে বিতরণে স্বেচ্ছাশ্রম দিয়ে সহযোগিতা করুন।
- ☐ আপনার যে কোনো সাহায্য ও সহযোগিতা ফাউন্ডেশন সাদরে গ্রহণ করবে।

স্যালাইন তৈরি শুরু

সারাদেশে ভয়াবহ বন্যার প্রেক্ষিতে ডায়রিয়া ও পেটের পীড়ায় আক্রান্তদের মাঝে বিতরণের জন্যে খাবার স্যালাইন তৈরির কাজ শুরু হয়েছে ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় অফিসে। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে, আইসিডিডিআরবি নির্ধারিত মানের এ খাবার স্যালাইন তৈরি প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান। সকাল ও দুপুরে দুই শিফটে এ স্যালাইন তৈরির কাজে অংশ-গ্রহণের জন্যে ইতোমধ্যেই ৭৬ জন প্রো-কোয়ান্টামের নাম তালিকাভুক্ত করেছেন।



ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় অফিসে খাবার স্যালাইন তৈরির কাজ চলছে। প্রো-কোয়ান্টামেরদের কাজ তদারক করছেন মা-জী ও মিসেস সুরাইয়া রহমান

রিজুভিনেশন কোর্স

আগামী ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর, ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে রিজুভিনেশন কোর্স। দু'দিনের এই কম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন কোর্স-এর আসন সংখ্যা সীমিত। প্রবেশপত্র দ্রুত সংগ্রহ করে নেয়ার জন্যে সকল কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটকে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের কর্মসূচি

ঢাকায় পরিচিতি সভা :

১৮৮ ব্যাচ : ৪ আগস্ট (বুধবার)
১৯০ ব্যাচ : ১ সেপ্টেম্বর (বুধবার)

ঢাকায় কোর্স :

১৮৮ ব্যাচ : ১৩, ১৪, ১৫ ও ১৬ আগস্ট
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)
১৯০ ব্যাচ : ১০, ১১, ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

কোয়ান্টাম বুলেটিন

আগস্ট ২০০৪



সিলেটে ত্রাণ কার্যক্রম

ফাউন্ডেশনের সিলেট সেন্টারের উদ্যোগে বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ পর্যন্ত শহরের বন্যা উপদ্রুত উপশহর এলাকায়, পূর্ব সিলেটের হরিপুর, জৈন্তা এবং পশ্চিম সিলেটের ছাতক ও সুনামগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় প্রায় ১০ হাজার প্যাকেট চিড়া-মুড়ি, চাল-ডাল ও শুকনো খাবার, কয়েকশত বিশুদ্ধ খাবার পানির ক্যান এবং ফিটকির ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়।

সেন্টারের পরিচালক জনাব মো. সীতাব আলী, হেলাল উদ্দীন, শাহরিয়ার আহমেদ, আজিজুর রহমানসহ বহু সংখ্যক প্রো-কোয়ান্টামের এই ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক, গবেষক ও অধ্যাপক ড. মাহমুদ উল আমীন গত ২৮ জুন সোমবার সিদ্ধেশ্বরীস্থ নিজস্ব বাসভবনে বার্ষিক্যজনিত কারণে ইন্তেকাল করেন (ইলালিল্লাহে.....রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭২ বছর। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ড. আমীন তাঁর দীর্ঘ কর্মময় জীবনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি স্টেট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের সাবেক উপাচার্য এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ছিলেন বাংলাদেশ একাডেমী অব সায়েন্সের ফেলো ও সচিব। ১৯৯৩ সালে কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশন কোর্সের ৭ম ব্যাচে তিনি অংশগ্রহণ করেন। গত জানুয়ারি মাসে কোয়ান্টাম বুলেটিনের সাথে দেওয়া এক একান্ত সাক্ষাতকারে তিনি বলেছিলেন তাঁর নিজের সম্পর্কে, দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ জীবনের নানা উপলব্ধি সম্পর্কে।

মরহুম ড. মাহমুদ উল আমীন ছিলেন একজন নিভৃতচারী গবেষক ও শিক্ষাবিদ

ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে প্রি-টেষ্ট পরীক্ষায় অংকে তিনি ফেল করেছিলেন বলে তার শিক্ষক লিখেছিলেন, এ ছেলের মাথা খাওয়া হচ্ছে। সেই তিনিই ম্যাট্রিকে অংকে লেটার মার্কস পেয়ে প্রথম বিভাগ অর্জন করেন। কলেজে পড়তে গিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন ঢাকা কলেজের আর্টস বিভাগে আর তার বাবা চেয়েছিলেন ছেলে কমার্স পড়ুক। কিন্তু সেই ছেলেই বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলো এবং কালক্রমে পরিচিত হলো দেশ-বিদেশ খ্যাত একজন প্রাণিবিজ্ঞানী হিসেবে। সেই ছেলেটিই হলেন অধ্যাপক, লেখক ও গবেষক— ড. মাহমুদ উল আমীন।

ছাত্র জীবনেই তিনি দেশজোড়া পরিচিতি পেয়েছিলেন একজন কৃতি স্কাউট হিসেবে। বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন কৃতিত্বের সাথে। কলেজের পাট শেষ করে ১৯৫৪ সালে তিনি ভর্তি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিদ্যা বিভাগের অধীনে চালু হওয়া প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রথম ব্যাচের ছাত্র হিসেবে। কৃতিত্বের সাথে অনার্স, মাস্টার্স শেষ করলেও এক অবাঙালী শিক্ষকের বৈষম্যের কারণে প্রভাষক পদে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পেলেন না।

এরপর দেশে পিএইচডি-তে ভর্তি হতে গিয়েও একই বাধার মুখোমুখি হন। তাই যোগ দেন ঢাকার বাইরের একটি কলেজে। তবে কিছুদিন পরই সেটা ছেড়ে কাজ নেন একটি বিদেশি প্রকল্পে যেখানে হাতে-কলমে কাজ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রকল্পটি যখন বন্ধ হওয়ার মুখে তখন তেমন আশাবাদী না হয়েও তিনি একদিন সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে ম্যালেরিয়া নির্মূল প্রকল্পে পতঙ্গ বিশেষজ্ঞের একটি পদের জন্যে আবেদন করেন এবং অবাক হয়ে আবিষ্কার করেন যে আকর্ষণীয় বেতন এবং কাজ করার সুযোগ দুটোই আছে এরকম চমৎকার এই চাকরিটি তিনি পেয়েছেন। দেশী সহকর্মীদের বিরাগভাজন হলেও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় পরিচালিত এই প্রকল্পে কাজ করে তিনি বিদেশিদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

আড়াই বছর পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার বিভাগে আবারও শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞাপন হয়। ইতোমধ্যে তার বেশ কয়েকটি গবেষণা পত্র প্রকাশিত হয়েছে বিদেশি জার্নালে। এবার আর তার নিয়োগে কোনো বাধা হলো না। ১৯৬২ সালে তিনি যোগ দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের তরুণ প্রভাষক হিসেবে এবং তারপর থেকে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই শিক্ষকতাই ড. আমীনের পরিচয়ের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে ছিলো।

ড. আমীন কমনওয়েলথ স্কলারশীপ নিয়ে পিএইচডি করতে যান ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটিতে। সেখানে তার কাজ যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করে। তার সুপারভাইজার ড. হাওয়ার্ড ই হিন্টন ছিলেন লন্ডনের রয়্যাল এনটমলজিক্যাল সোসাইটির ফেলো। ড. আমীনের একটি কাজের রিপোর্টকে এই সোসাইটির জার্নালের সম্পাদকীয়তে রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

ড. আমীনের রিসার্চ পেপারের সংখ্যা ৭০-এর বেশি, সেমিনার পেপার ৫০-এর বেশি। তার গবেষণা পত্রগুলো প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বের বিখ্যাত বিজ্ঞান জার্নালগুলোতে যার মধ্যে রয়েছে নেচার, জার্নাল অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি, জার্নাল অব রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি ইত্যাদি।

গবেষণাধর্মী লেখার জন্যে তিনি দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছেন। গবেষণার বিষয় হিসেবে তিনি যে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করেছেন তার মধ্যে রয়েছে পতঙ্গের রূপান্তর ও বিকাশ, মশার জীবন পরিবেশ, ড্রাগন মাছি, কীটনাশকের বিষাক্ততা, জীববৈচিত্র্য এবং বাস্তুসংস্থান। এর মধ্যে জীব বৈচিত্র্য বিষয়ে তিনি ছিলেন দেশের শীর্ষস্থানীয় একজন বিশেষজ্ঞ। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি জুওলজিক্যাল সোসাইটি অব বাংলাদেশ-এর প্রেসিডেন্ট এবং জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটির সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

২০০১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণের পর তিনি একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অবশ্য বছর খানেক দায়িত্ব পালনের পর অসুস্থতাজনিত কারণে সে পদে ইস্তফাও দেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে তার অভিমত ছিলো— দেশে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব পূরণ করার জন্যে বেসরকারি উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অবশ্যই ইতিবাচক দিক আছে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে উপযুক্ত হওয়ার



জন্মে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, গবেষণাগার, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং সর্বোপরি অবকাঠামোগত যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থাকা উচিত, অধিকাংশ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে তা নেই। বরং বিশাল ব্যয় সাপেক্ষে সীমিত কয়েকটি জনপ্রিয় বিষয়ে পাঠদানের ব্যবস্থা করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো সমাজ সেবামূলক সংগঠনকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চেষ্টাও হচ্ছে কোনো কোনো জায়গায়। ফলে লেখাপড়ার মান হ্রাস পাচ্ছে আশংকাজনক হারে, যার শিকার হচ্ছে এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা— চাকরির বাজারে অবমূল্যায়িত হয়ে। ফলে এর প্রতিরোধের জন্যে গড়ে তুলতে হবে সামাজিক সচেতনতা।

অসুস্থতার কারণে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়টির ভিসির পদ ছেড়ে দেয়ার পর তিনি আবারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন অনারারী অধ্যাপক হিসেবে। এছাড়াও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট মেম্বর এবং সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়েরই শিক্ষক নিয়োগ কমিটির সদস্য ছিলেন।

গুরুজীর সঙ্গে দীর্ঘ ২০ বছর পরিচয়ের সূত্রে ড. আমীন কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশন কোর্স করেন ৭ম ব্যাচে ১৯৯৩ সালে। মেডিটেশনের ফলে শারীর বৃত্তি প্রক্রিয়ার উপর যে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে একজন প্রাণিবিজ্ঞানী হিসেবে তিনি তা আত্মহ নিয়ে লক্ষ্য করেছেন। মানসিক শক্তি বাড়তেও মেডিটেশনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলে তিনি মনে করতেন। নিয়মিত মেডিটেশন না করতে পারলেও তার আত্মবিশ্বাস এবং শুকরিয়া প্রকাশের মানসিকতাই প্রমাণ করে কোয়ান্টামের ইতিবাচকতার সাথে তার চিন্তা-চেতনার কোনো পার্থক্য ছিলো না। এমনকি তাঁর ভাষায়— চরম শারীরিক জটিলতার মুখেও এই সাহসের কারণে তিনি বেঁচে এসেছিলেন। নিরাময়ের দিনগুলোতে— তাঁর ভাষায়— তিনি নিরবচ্ছিন্ন ধ্যানাবস্থায়ই যেন কাটিয়েছেন।

ড. আমীন ছিলেন একজন দেশ-প্রেমিক। বিদেশে অনেক অর্থ, খ্যাতির হাতছানি পেয়েও তিনি দেশ ছেড়ে যেতে চান নি। তিনি মনে করেছেন তার গবেষণার সুফল দেয়ার মাধ্যমে এই দেশের সেবা করার দায়িত্ব তাঁর। তাই শত হতাশার বাণীর মুখেও তিনি দেশ ছেড়ে যান নি।

এখনকার তরুণ প্রজন্মের মধ্যে দেশের প্রতি এই আন্তরিকতার অভাব লক্ষ্য করে তিনি দুঃখিত হন। কাজকে ভালো না বেসে অর্থের পেছনে ছুটে বেড়ানোর মধ্যে তিনি খারাপ পরিণতিই দেখতে পান।

জীবনের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে ড. মাহমুদ উল আমীনের উপলব্ধি ছিলো, স্রষ্টার কাছে হাজার শুকরিয়া আদায় করি, কারণ সোজা হিসেবে আমার তো এত কিছু পাওয়ার কথা ছিলো না। মুদি দোকানের খাতা লেখক বা কেরানী হওয়াই ছিলো আমার জন্যে স্বাভাবিক। কিন্তু তা না হয়ে এত সম্মান, এত খ্যাতির সৌভাগ্য তিনি আমায় দিয়েছেন। আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো ভাষা নেই। স্রষ্টার কাছে এখন একটাই প্রার্থনা যে, মৃত্যুর আগ পর্যন্ত আমি যেন আরও কিছু ভালো কাজ করে যেতে পারি।

মৃত্যুর আগ পর্যন্ত শিক্ষকতা ও জ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত থাকাই প্রমাণ করে ড. আমীনের এ প্রার্থনার সার্থকতা। পরম করুণাময় তাঁর আত্মাকে শান্তিতে রাখুন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : রাবিয়া নাজরীন



শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আসসালামু আলাইকুম।
আশা করি আল্লাহর
রহমতে বেশ ভালো
আছেন। আমরাও আল্লাহর
রহমতে বেশ ভালো
আছি। গুরুজী, আমি
যশোরের দাউদ পাবলিক
স্কুলের ৫ম শ্রেণীর ছাত্রী,
১৮৩ ব্যাচে কোর্স করেছি।



কোর্সের তৃতীয় দিন আপনি কোয়ান্টা ভঙ্গি করে
পড়াশোনা করতে বলেছিলেন, আমি সে দিন রাত
৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা কোয়ান্টা ভঙ্গি করে
পড়াশোনা করেছি। আগে আমি একটা বা দু'টো প্রশ্ন
মুখস্থ করতে গেলে রাত ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত
পড়লেও মুখস্থ হতো না। কিন্তু সে দিন আমি ঠিক
৯টা থেকে ১০টা পর্যন্ত কোয়ান্টা ভঙ্গি করে ৫টা প্রশ্ন
মুখস্থ করেছি। আর চতুর্থ দিন কোয়ান্টাম গেম
আমার যে কী ভালো লেগেছে তা বলে বা লিখে
প্রকাশ করতে পারবো না। আমি কল্পনা করতে পারি

গুরুজীকে লেখা চিঠি

নি যে একটা অজানা-অচেনা মানুষের অনেক কিছু
বলতে পারছি।

আমার জন্যে দোয়া করবেন, যাতে আমি বড়
হয়ে একজন ভালো ডাক্তার হতে পারি।

ইতি

আপনার স্নেহের

নাবিলা তাবাসসুম তুবা



শ্রদ্ধেয় গুরুজী,

আমার সালাম নিবেন। আশা করি পরম করুণাময়ের
কৃপায় বেশ ভালো আছেন। আমিও আপনার দোয়ায়
বেশ ভালো আছি।

আমি নিয়মিত পড়াশোনা করছি। প্রথম সাময়িক

পরীক্ষায় ১ম স্থান
অধিকার করেছি। দোয়া
করবেন আগামী
পরীক্ষাগুলোতে যেন
আরও ভালো ফল করতে
পারি। জীবনে অনেক বড়
হতে পারি। জীবনকে
যেন আরও সুন্দর করে
গড়ে তুলতে পারি।



নিয়মিত মেডিটেশন করে আমি এখন নিজেকে
উপলব্ধি করতে পারছি। নিজেকে আরও ভালোভাবে
উপলব্ধি করার জন্যে আমি মেডিটেশন কোর্স
করতে চাই।

আপনি আমাদের এখানে আরো বেশি বেশি
বেড়াতে আসবেন। মা-জীকে আমার সালাম
জানাবেন। আমাদের সকলের জন্যে দোয়া করবেন।

ইতি

আপনার স্নেহের

সুমথং মুরং

সপ্তম শ্রেণী,

কোয়ান্টাম শিশুকানন, লামা

কোমল পানীয় শীতল, নীরব আর ভয়ংকর!

মাথার ওপর কাঠফাটা রোদ্দুর। তুষণায় গলা শুকিয়ে
কাঠ। সামনে এক গ্লাস বরফ শীতল, যাকে বলে
‘চিলড্’ কোমল পানীয়। গ্রহণ করবেন নিশ্চয়ই? যদি
আরেকটু সচেতন হতেন, যে সব খাবার আপনি
গ্রহণ করছেন, সেগুলোর ব্যাপারে যদি একটু খোঁজ
খবর রাখতেন, তাহলে অবশ্যই আপনি এই প্রচণ্ড
গরমে ‘শীতল কোমল পানীয়’ পান না করে শীতল
পানি-ই চাইতেন। অবশ্য এ ব্যাপারে আপনার না
জানার জন্যে আপনার দোষ সামান্যই। কারণ
পণ্যদ্রব্যের যুগে আমরা এখন খাদ্যদ্রব্যের
পাশাপাশি বিজ্ঞাপনও খাই। যখন শুনি— “এই মন
চায় যে More” অথবা “দিল ঠাণ্ডা তো দুনিয়া ঠাণ্ডা”
বা “ফ্রিডম অব চয়েস”— তখন কিন্তু আমাদের
“More” কোমল পানীয় দিয়ে “দিল ঠাণ্ডা”
করাটাকেই “ফ্রিডম” বলে মনে হয়। কিন্তু এই
“ফ্রিডম” দিয়ে “দিল ঠাণ্ডা” করতে গিয়ে নিজেদের
কী অবস্থা আমরা করছি তা আপনাকে কেউ
বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়ে দিচ্ছে না। এটা আপনাকে
নিজে নিজেই জানতে হবে। আর জানার সবচেয়ে
ভালো উপায় হলো কোমল পানীয়ের সবচেয়ে বড়
ভোক্তা দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকানো।
আসুন একটু চোখ মেলে তাকাই।

সিংহভাগ আমেরিকান (তিনি যে বয়সেরই
হোন) দিনের প্রধান পানীয় হিসেবে কোমল পানীয়
গ্রহণ করে থাকে। প্রত্যেক আমেরিকান গড়ে দিনে
প্রায় পৌনে এক লিটার কোমল পানীয় পান করে।
ফলে এক নম্বর সমস্যা যেটা দাঁড়িয়েছে, তা হলো
আমেরিকানরা মোটা হয়ে যাচ্ছে! বর্তমানে (বিশ্ব
স্বাস্থ্য সংস্থার সমীক্ষা অনুযায়ী) প্রায় এক তৃতীয়াংশ
মার্কিনী স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি মোটা।
তাদের এই স্থূলতা যদি শুধু স্থূলতার মধ্যে সীমাবদ্ধ
থাকতো তা-ও হতো। তা না থেকে মোটা হবার

প্রবণতা এবং স্থূলতা মহামারী আকারে এক
বিশেষ ধরনের ডায়াবেটিস ছড়াচ্ছে এবং কার্ডিও
ভাসকুলার রোগ অর্থাৎ হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের
পরিমাণ বাড়ছে। এই স্থূলতা কিন্তু এখন বহু
মার্কিনীর সামাজিক ও মানসিক সমস্যার কারণ
হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুধের বদলে যেসব মানুষ কোমল পানীয় পান
করেন তাদের শরীরে ক্যালসিয়াম ঘাটতি দেখা
দেয়। ক্যালসিয়াম স্বল্পতা “অস্টিওপোরোসিস”
নামক হাড়ের ক্ষয়জনিত এক রোগের জন্ম দেয়।
এই রোগে হাড়ের ঘনত্ব কমে যায় এবং গঠন দুর্বল
হয়ে যায়। ফলে হাড় সহজে ভেঙে যায় এবং
সবচেয়ে আশংকার কথা হলো, তারপর ভাঙা হাড়
আর সহজে সেয়ে ওঠে না। বর্তমানে ১০ লক্ষ
মার্কিনীর এই রোগ রয়েছে এবং আরো ১৮ লক্ষ
মার্কিনী এই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

পানীয়গুলো সুস্বাদু এবং অত্যন্ত মজাদার
হলেও স্বাস্থ্যসম্মত নয় মোটেই। আপনি যদি
আপনার কিডনী এবং দাঁতকে আজীবন সুস্থ অবস্থায়
দেখতে চান, তাহলে নিচের কথাগুলো খুব
মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।

গবেষণায় বিজ্ঞানীরা দেখেছেন— যারা কোমল
পানীয় পান করেন না বা অত্যন্ত পরিমিত পরিমাণে
করেন, তাদের তুলনায় যারা প্রচুর পরিমাণে কোমল
পানীয় পান করেন তাদের কিডনীতে পাথর জমার
হার প্রায় তিন গুণ! আর কোমল পানীয়তে যে
রিফাইন্ড সুগার বা পরিশোধিত চিনি ব্যবহার করা
হয় তা আপনার দাঁতের ক্ষয়রোগ সৃষ্টির এক নম্বর
কারণ হতে পারে।

আপনি হয়তো এটা জানেন যে, কোমল পানীয়ে
যেসব জিনিস যোগ করা হয় তাদের মধ্যে ক্যাফেইন
এক নম্বর। কিন্তু আপনি কি জানেন ক্যাফেইনের
আসক্তির ক্ষমতা কতটুকু? যে কোনো মাদক দ্রব্যের
থেকে কম হলেও খুব কম নয়। ক্যাফেইনের
আসক্তির ক্ষমতাই সম্ভবত সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে
জনপ্রিয় কারণ এটা ব্র্যান্ডের কোমল পানীয়ের ছয়টাতেই
থাকার সারণ। সারা পৃথিবীতে ক্যাফেইনযুক্ত
কোমল পানীয়ের মোট উৎপাদনের মাত্র ৫%
ক্যাফেইনমুক্ত পানীয়ের উৎপাদন।

ক্যাফেইন মানুষের মধ্যে ক্রোধ প্রবণতা,

নার্ভাসনেস, নিদ্রাহীনতা এবং হৃদস্পন্দন দ্রুততর
করে। যেসব শিশু সাধারণত ক্যাফেইন গ্রহণে
অভ্যস্ত নয় তাদের মধ্যে চাঞ্চল্য বাড়ায়, মাথা ব্যথা
ও ঘুমের সমস্যা তৈরি করে।

আবার দেখবেন, যিনি একটি নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের
পানীয় খেতে পছন্দ করেন, তিনি সাধারণত অন্য
কোনো ব্র্যান্ডের পানীয় খেতে পছন্দ করেন না। এর
পেছনের কারণও ক্যাফেইন। ক্যাফেইনের আসক্তি
মানুষকে নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের পানীয়তেই সীমাবদ্ধ রাখে।

আরেকটা বিষয় আপনাকে জানিয়ে দিই পাঠক,
কোমল পানীয়তে যে স্যাকারিন ব্যবহার করা হয়,
তাতে ইউরিনারী স্ট্রাসার ক্যান্সার অর্থাৎ মূত্রাশয়ের
ক্যান্সার সৃষ্টি করে। সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে
একটি বিল পাশ হয়েছে যাতে যেসব খাদ্য দ্রব্যে
স্যাকারিন রয়েছে তার প্যাকেটের গায়ে একটি
সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি থাকা বাধ্যতামূলক করা
হয়েছে। ঠিক যেমন সিগারেটের প্যাকেটে লেখা
থাকে সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ।

আমরা অনেকেই রিচফুড খাওয়ার পর কোমল
পানীয় খেতে চাই এ ধারণায় যে, এতে খাবার দ্রুত
হজম হবে। অথচ এটা যে কত ভুল ধারণা তা একটু
বললেই পরিষ্কার হবে। আমাদের দেহ সাধারণত
৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় খাবার হজম করে
থাকে। কিন্তু এ জাতীয় কোমল পানীয় যখন
পরিবেশন করা হয়, তখন এর তাপমাত্রা থাকে ৩/৪
ডিগ্রি সেলসিয়াস। কাজেই খাবার গ্রহণের পর যখন
ঠাণ্ডা কোমল পানীয় পান করা হয়, তখন হজমে তো
সাহায্য করেই না, উল্টো তাতে পচন ধরায়। ফলে
দেহে তৈরি হয় নানা রোগ-ব্যাধি।

ঠাণ্ডা পানীয়ে একটি উপাদান ব্যবহার করা হয়
যার নাম ইথিলিন গ্লাইকোল। এটি আসলে একটি
বিষ। সম্প্রতি ভারতে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘কে
বেশি কোক পান করতে পারে’ এরকম একটি
প্রতিযোগিতায় এক প্রতিযোগী ৮ বোতল কোক
পান করেন এবং সাথে সাথেই মৃত্যুর কোলে
ঢলে পড়েন।

পাঠক, এত কিছুর পরও কি আপনি জেনেগুনেন
পান করবেন কোমল পানীয় নামের এই বিষ?

গ্রন্থনা : জহুর আল সাদাঙ্গিন সাবিত

[তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট]

প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

হারিয়ে যাওয়া স্বজনদের অনুভব করার প্রশান্তি হোসনে আরা মাহমুদ লিলি

একজন সফল শিক্ষক হলেও ব্যক্তি জীবনে আমি ছিলাম খুবই দুঃখী। অল্প বয়সে একের পর এক প্রিয়জনকে হারিয়ে নেতিবাচক ও হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম, যার প্রভাব সন্তানদের ওপরও পড়ছিলো।



একজন এসোসিয়েট হিসেবে খুলনা সেলে নিয়মিত মেডিটেশনে অংশ নিয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে শুরু করলাম। আর তার দু'মাস পর খুলনায় অনুষ্ঠিত কোর্সে অংশগ্রহণ করলাম দুই সন্তানকে নিয়ে। যে প্রচণ্ড ব্যাকপেইনের কারণে একটানা বসে থাকাটা ছিলো আমার জন্যে খুবই কষ্টকর, কোর্সের ৪ দিনে ৪০ ঘণ্টা ধরে বসে থেকেও সেই ব্যথাই বারো আনা ভালো হয়ে গেছে।

কোর্সের ৪র্থ দিন পারিবারিক মেডিটেশনে ১৫ বছর আগে মারা যাওয়া আমার স্বামী, বাবা, বড়বোনকে যখন অনুভব করার সুযোগ পেলাম, দেখতে পেলাম আমার মাকে, ৬ মাস আগে যাকে হারিয়ে আমি একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম, তখন এক আশ্চর্য প্রশান্তি, তৃপ্তি এসে মুছে দিয়ে গেল আমার সমস্ত অস্থিরতা আর হতাশা। ফিরে পেলাম আত্মবিশ্বাস, জীবনকে বদলে দেয়ার চাবিকাঠি।

[হোসনে আরা মাহমুদ লিলি খুলনা সবুরননেছা মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষিকা, ১৮২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

নামাজে একাগ্রতার উপায়

মো. কামাল উদ্দিন

নামাজে দাঁড়ালেই রাজ্যের সমস্ত চিন্তা এসে ভিড় করে। এ সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় কি? কিভাবে একাগ্রতা আনবো নামাজে? এর পেছনে আমি অনেক ছুটেছি। অনেক পীরের কাছে ধরনা দিয়েছি। বিভিন্ন বইতে



স্রষ্টার সান্নিধ্যের জন্যে ধ্যান বা মোরাকাবার কথা পেয়েছি। কিন্তু এর উপায়টা কোথাও পাই নি। যা পেলাম এই কোর্সে এসে। নামাজে এখন সত্যিই আমার একাগ্রতা বজায় থাকবে বলে বিশ্বাস করছি।

আমি বেশ আমুদে-উৎফুল্ল মানুষ। কিন্তু গত ক'বছরে অফিসিয়াল ব্যাপারে আমি প্রচণ্ড ডিপ্রেসনে ভুগছিলাম। টেনশনমুক্ত নতুন জীবনের পথে পা দিয়ে উৎফুল্লতা যেন আবার ফিরে এসেছে। ৩য় দিন সকালে লক্ষ্য করলাম আমি গুনগুনিয়ে গান গাইছি। আমার স্ত্রীও অত্যন্ত অবাক ও আনন্দিত হয়েছেন। এটা আমার অনেক বড় অর্জন।

[মো. কামাল উদ্দিন, ডেন্টা লাইফ ইনস্যুরেন্সে কর্মরত, ১৭৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কোয়ান্টাম ব্যায়াম করে উপকার পেলাম অনেক

মুরশীদা খানম

কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করার প্রায় ৭ মাস আগে থেকেই আমি ফাউন্ডেশনে কোয়ান্টাম ব্যায়ামের কোর্সটি করছি। এর আগে আমি সাঁতার, অ্যারোবিকস-সবই করেছি। কিন্তু কিছুতেই যেন আমার শারীরিক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান হচ্ছিলো না। এছাড়া ওজনও ছিলো অনেক বেশি। ২০০৩ সালের নভেম্বর মাস থেকে আমি সিরিয়াসলি কোয়ান্টাম ব্যায়াম শুরু করলাম। এরপর থেকেই শারীরিক সমস্যাগুলো এক এক করে দূর হতে লাগলো। ওজনও কমে গেল অনেক। এখন আমি ব্যায়ামের বার্ষিক কার্ড করে নিয়েছি যাতে প্রশিক্ষকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে নিয়মিত কোয়ান্টাম ব্যায়াম চর্চা করতে পারি।

[মুরশীদা খানম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের সহকারি অধ্যাপিকা, ১৭৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



নিজেকে জেনেছি

মো. জামাল উদ্দীন আহমদ

কোর্সে এসে আমি অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী, ইতিবাচক এবং কর্মঠ হয়ে উঠেছি। ইতিবাচক চিন্তার যে এত প্রভাব রয়েছে তা আমি এখানে এই প্রথম উপলব্ধি করলাম। কোর্সে এসে নিজেকে আবিষ্কার করতে পেরেছি। আমার বিশ্বাস, আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে যাদের সাথে আমার সম্পর্ক খারাপ ছিলো এখন থেকে তাদের সাথে চমৎকার সম্পর্ক তৈরি করতে পারবো।

[মো. জামাল উদ্দীন আহমদ, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ১৬৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সাফল্য

শর্মিলা মজুমদার

লেখাপড়ায় আমার মনোযোগ খুব ভালো ছিলো না। সাধারণ মানের ছাত্রী আমি। হঠাৎ করে কোয়ান্টাম কোর্স করে ফেললাম। শিখলাম-কেমন করে পড়াশোনায় মনোযোগ বাড়তে হয়, নির্ধারিত বিষয়ের



পড়াগুলো মনে রাখতে হয়, পরীক্ষায় সঠিক উত্তরটি আকর্ষণীয়ভাবে লিখতে হয়। আসলে পড়াশোনার

বেন্ট না পরে, কারও সাহায্য ছাড়াই চলতে পারছি

ডা. দিলীপ দেবনাথ

আমার বয়স ৬২ বছর। ১৯৮২ সাল থেকে আমি কোমর এবং পায়ের ব্যথায় ভুগছিলাম। মেরুদণ্ডে অপারেশন হয়েছে দু'বার। তারপর ১৯৯০ সালে ব্রেন হ্যামারেজ হয়ে ডান পা প্যারালাইজড হয়ে গেল।



ফিজিওথেরাপি এবং ব্যথার ওষুধের পাশাপাশি কিছুটা চলৎশক্তি পাওয়ার জন্যে ডাক্তার কোমরে পরার একটি বিশেষ বেন্ট এবং পায়ের জন্যে একটি ইনসার্ট দিলেন। বাইরে বেরতে গেলেই বেন্ট পরতে হতো এবং সাথে কাউকে রাখতে হতো। কিন্তু ব্যথা কমে নি।

একটু ভালো ভাবে হাঁটার জন্যে অনেক ডাক্তার, কবিরাজ, ওঝা, ফকির, পীর-সাধকের পেছনে টাকা খরচ করে নিঃশেষ হয়ে গেছি। তারা বলতো, হাঁটা কি, আপনাকে দৌড়িয়ে দেব। অথচ লাভ কিছুই হয় নি। সব কিছুর ওপর থেকে যখন আস্থা হারিয়ে ফেলেছি তখন আমার এক শুভার্থী পরিবারের মাধ্যমে জানতে পারলাম কোয়ান্টাম মেথডের কথা। ভর্তি হলো। গুরুজী আমাকে বললেন, আপনি দৌড়াবেন। কোর্স করতে করতে বুঝলাম এ কথার তাৎপর্য। অর্থাৎ কোর্সে যে ইতিবাচক শিক্ষা, দিক-নির্দেশনা এবং বিশেষ বিশেষ মেডিটেশন আমরা পাচ্ছি তার মাধ্যমেই একজন মানুষ সুস্থ হওয়ার আত্মবিশ্বাস ও আশাবাদ ফিরে পায় এবং এভাবে সে দ্রুত ও সত্যিকারভাবে সুস্থ হয়ে ওঠে।

তাই অন্যেরা যেখানে আমাকে বলেছিলো- আপনাকে দৌড়িয়ে দেবো, সেখানে গুরুজী বললেন, আপনি দৌড়াবেন। এ দু'য়ের পার্থক্য এখানেই। তার বাস্তব প্রমাণ পেলাম এভাবে যে, কোর্সের ৪র্থ দিন থেকেই আমি কোনো পেইনকিলার খাচ্ছি না, ব্যথার জন্যে মালিশ করছি না এবং গত ১৪ বছরের মধ্যে জীবনে প্রথমবারের মতো চলাফেরা করার জন্যে কোমরের বিশেষ বেন্টটি পরছি না। পায়ে একটু একটু করে জোর ফিরে পাচ্ছি। যে আমি একসময় একটুখানি হাঁটতে পারবো কি না এ নিয়েই ছিলাম ভীষণ সংশয়ী, সেই আমিই এখন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি- সুস্থ দেহে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাঁটতে পারবো।

[ডা. দিলীপ দেবনাথ একজন হোমিও চিকিৎসক, ১৮৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

চাপে আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ি। তাই ব্রেন তা মনে রাখতে পারে না। কোয়ান্টাম মেথড প্রশিক্ষণে মনে রাখার প্রচুর টেকনিক শেখানো হয়। আমি টেকনিকগুলোর মাত্র দু'টো প্রয়োগ করলাম এবং এইচএসসিতে ভালো রেজাল্ট করলাম।

কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় খুব কম্পিটিশন। ঢাকা ভার্চুয়ালি, মেডিক্যাল এবং শাবিপ্রবি- এ তিন জায়গায় পরীক্ষা দিলাম। পরম করুণাময়ের কৃপায় তিন জায়গায়ই চান্স পেলাম। অবশেষে কম্পিউটার সাইন্স পড়ার জন্যে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি; যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া আমার কাছে একসময় স্বপ্নের মতো মনে হতো। কোয়ান্টাম মেথডের কার্যকর পছন্দের আমাকে এ সাফল্য পেতে সাহায্য করেছে।

[শর্মিলা মজুমদার শিক্ষার্থী, ১২৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



এখনও স্বপ্ন দেখি সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশের

—অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান

হয়েছিলো এবং প্রায় তিন শতাব্দী এ ধারা অক্ষুণ্ণ ছিলো। এসময় স্বাধীনভাবে বাঙালির জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্যগুলো বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়।

ইতিহাস সচেতনতার অভাবে ভারত বর্ষের প্রাচীন ইতিহাস অস্বচ্ছ। আলেক্সান্ডারের ভারত আক্রমণের পর গ্রীক ঐতিহাসিকদের লেখায় আমরা জানতে পারি, খৃষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে বাংলা একটি পরাক্রমশালী দেশ ছিলো। আলেক্সান্ডার বিপাশা নদীর তীরে এসে খবর পান, গঙ্গারিডাই ও প্রাসিয় রাজ্যের রাজা অথবা রাজগণ এক বিরাট সৈন্য বাহিনী নিয়ে তাকে বাধা দিতে তৈরি হয়ে আছেন। এটা শুনে গ্রীক সৈন্যরা ভীত হয়ে পড়লো এবং ফিরে গেল।

টলেমির (Ptolemy) রচনা ও পেরিপ্লাস (Periplus) নামক গ্রন্থে খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল নিয়ে এক শক্তিশালী রাজ্য গঠিত ছিলো বলে উল্লেখ আছে। এই রাজ্যের রাজধানী শহর গঙ্গে (Gange) একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিলো। বাংলায় যে সূক্ষ্ম মসলিন তৈরি হতো তা এই বন্দর থেকেই সুদূর পশ্চিম দেশে রপ্তানি করা হতো। এই নগরের কাছেই সোনার খনি ছিলো। ডা. নীহার রঞ্জন রায়ের মতে, বাংলার সুবর্ণ বীথি ও সুবর্ণ গ্রামের উল্লেখ থেকে মনে করা হয়, বাংলায় সোনার খনি ছিলো। ‘পেরিপ্লাস’ গ্রন্থে নিম্ন গাঙ্গেয় ভূমিতে ক্যালটিস নামক এক প্রকার স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। (পৃঃ-৪৩, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা)

প্রাচীন কাল থেকেই বাঙালিরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে আত্মনির্ভরশীল ছিলো। কৃষি কাজে যেমন তারা দক্ষ ছিলো তেমনি ছিলো শিল্প ক্ষেত্রেও। ধান, পাট, নীল, ইক্ষু এবং অতি উন্নত মানের কার্পাস তুলাসহ আম, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারী, কলা, লেবু, ডালিম, ডুমুরসহ বহু ফল-ফলাদির চাষ হতো।

আজকের কুটির শিল্প, প্রাচীনকালে মূলত শিল্প ছিলো। সেই অর্থে প্রাচীন বাংলা তখনকার বিশ্বে একটি শিল্পোন্নত দেশ ছিলো। বস্ত্র শিল্প, চর্ম শিল্প, মৃৎ শিল্প এবং ধাতু শিল্প ছিলো প্রধান। তারা তাম্র এবং লৌহের ব্যবহার জানতো। বস্ত্র শিল্পে তখনকার বিশ্বে তারা সবচেয়ে উন্নত ছিলো, যে শিল্পের সুনাম ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত ছিলো। ৩০০ কাউন্টের সুতা তারা কাটতে পারতো।

ইংরেজ কোম্পানীর চিঠি থেকে ঢাকায় তৈরি নিম্নলিখিত বস্ত্রসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়— মলমল, আলাবালি, সরবতি, তজ্জি, তেরিন্দাম, নয়নসুখ, শিরবান্ধানি (পাগড়ি), ডুরিয়া, জামদানি। মসলিন বস্ত্রের প্রকারভেদ সম্পর্কে ব্রাডলীবাট বলেন, আব-ই-রওয়্যা বা প্রবহমান পানি এবং শবনম বা শিশির ছিলো অত্যন্ত মূল্যবান; অথচ জামদানি, পুষ্পিত মসলিন এবং মলমল খাস বা রাজমসলিনও কম সুন্দর ছিলো না। তিনি আরও বলেন, “For transparency, fineness and delicacy of workmanship these fabrics have never been equalled and not all the improvement in the art of manufacture in modern times have been able to approach them” উৎকৃষ্ট কাপড় খুব বেশি দামে বিক্রি হতো।

সাধারণ মানুষের জন্যে স্বল্প মূল্যের মোটা বস্ত্রও এখানে তৈরি হতো। (পৃঃ-৫২৩, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা)

বস্ত্র শিল্পসহ চামড়া, মৃৎ, ধাতু, স্বর্ণ এবং নৌকা, শকট, কাঠ এবং হাতির দাঁতের শিল্পীদের কারিগরি এবং প্রযুক্তি জ্ঞান ছিলো অতি উন্নত মানের এবং অনেক দেশ থেকেই অগ্রসর। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছাড়াও বাংলাদেশের বহির্বাণিজ্যের বিস্তার ছিলো সমুদ্র পথে সিংহল, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্নিও এবং স্থলপথে চীন, আসাম আর দুর্গম হিমালয়ের পথ দিয়ে নেপাল, ভুটান ও তিব্বত পর্যন্ত।

পরবর্তী কালে বাংলাদেশের নৌ বাণিজ্য সম্প্রসারিত ছিলো দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যের মিশর ছাড়িয়ে ইউরোপের রোম পর্যন্ত।

চতুর্দশ শতাব্দীতে আফ্রিকার পর্যটক ইবনে বতুতা উত্তর আফ্রিকা, আরব হয়ে ভারত, বাংলা, চীন এবং ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। তিনি লিখেছেন—সবাই মিশরের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলেন। “But as far as I can see, by two voyages I have made in the kingdom of Bengal I am of opinion that advantage rather belongs to it (Bengal) than to Egypt. It bears rice in such abundance that it not only feed its neighbours but many very remote points too” (Bernier voyage, page-189)

বঙ্গদেশে আর্যদের আগমনের পূর্বে এ দেশে জাতিভেদ প্রথার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। বাঙালিরা মূলত ছিলো অসাম্প্রদায়িক। বাঙালির মূল দর্শন ছিলো, কবির ভাষায়— ‘সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই’। বাংলাদেশের প্রাচুর্য, রমরমা বাণিজ্য এবং সুলভ জীবন প্রণালীর জন্যে ইউরোপ থেকে আগত বণিকদের মুখে মুখে তখন একটি প্রবচন প্রচলিত ছিলো “There are hundred open gates to enter into the kingdom of Bengal and not one to come away again” বস্ত্র তখনকার যুগে বাংলাদেশকে বলা হতো ভারতের স্বর্গ। (পৃঃ-৫২৮, বাংলাদেশ ইতিহাস পরিক্রমা)

সেই বাংলাদেশ মধ্যপ্রাচ্যে আজ ‘মিসকিন’ নামে পরিচিত, বিশ্বের কাছে অনুন্নত, দুর্নীতিপরায়ণ দেশ হিসেবে চিহ্নিত। তথাকথিত উন্নয়নের জন্যে পশ্চিমা ধনী দেশগুলো থেকে অনুদান আর ঋণের আশায় হন্যে হতে হয় আত্মসম্মান আর আত্মমর্যাদা বিকিয়ে দিয়ে।

অথচ আজো আমরা দরিদ্র নই। আমাদের আছে উন্মুক্ত নীল আকাশ, বাতাস, সূর্যের তাপ, আছে জলসম্পদ, আছে জনসম্পদ। প্রয়োজন একে সুপরিচালিত উপায়ে উৎপাদনের কাজে লাগানো। এছাড়া এখনও আছে মাটির নিচে অবিশ্বাস্য রকমের খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য। যা নেই তা হলো সং ও দক্ষ নেতৃত্ব, যারা জাতিকে দেখাবেন আত্মমর্যাদা আর আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হওয়ার স্বপ্ন।

আমার মনে হয় ক্ষুদ্র আকারে হলেও সেই দায়িত্বটা নিয়েছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। সত্যিকারের আত্মসচেতন, আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন স্বাধীনচেতা মানুষ গড়ার মাধ্যমে হাজার বছরের লাঞ্চিত, উৎপীড়িত, শোষিত জাতিকে আবার একটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন, গর্বিত-গরীয়ান সভ্যতায় পরিণত করার লক্ষ্যে তাদের এই চেষ্টায় আমিও একাত্মতা ঘোষণা করছি।

[গত ৮ জুন, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মাসিক মুক্ত আলোচনায় প্রধান অতিথি বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও বাংলাদেশ কৃষকশ্রমিক সমাজবাদী দলের ফার্স্ট সেক্রেটারি অধ্যাপক সিদ্দিকুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের সারসংক্ষেপ]

ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা যে কোনো জাতির সোনালি ভবিষ্যত গড়বার অন্যতম প্রেরণা। বাঙালি জাতিরও রয়েছে এক সমৃদ্ধ সভ্যতার ইতিহাস, এক গৌরবময় অতীত, যা সে ভুলে গিয়েছিলো পরধন লুণ্ঠনকারী ইংরেজ বেনিয়াদের পরাধীন শাসনের চক্রান্তে পড়ে। আজ আমাদের প্রয়োজনেই সেই সমৃদ্ধ ইতিহাসকে জানতে হবে, কারণ তা আমাদের স্বপ্ন দেখাবে ভবিষ্যতের এক সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশের।

প্রায় পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা বঙ্গদেশ। আজকের বাংলাদেশ তারই অংশ। ড. নীহার রঞ্জন রায়ের মতে প্রাচীন বঙ্গদেশের সীমানা ছিলো উত্তরে হিমালয়, নেপাল, সিকিম ও ভুটান রাজ্য, উত্তর-পূর্ব দিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা, উত্তর-পশ্চিম দিকে দ্বারবঙ্গ পর্যন্ত, পূর্ব দিকে চট্টগ্রাম সমুদ্র পর্যন্ত, পশ্চিমে ময়ূরভঞ্জের পাহাড়, বন ঘেরা মালভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। অসংখ্য ছোট-বড় নদী বিধৌত বাংলাদেশ। এত ছোট অঞ্চলে এত সংখ্যক নদ-নদী পৃথিবীর আর কোনো দেশে নেই। পলিমাটি সমৃদ্ধ বাংলার মাটি তাই কৃষকের প্রাচুর্যের উৎস।

ভৌগোলিক কারণে বাংলার মৃদু ও নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু বাঙালির স্বভাবেরও প্রভাব ফেলেছে। আবেগ আর উচ্ছ্বাসে ভরপুর এবং কোমল ও শান্ত স্বভাবের বাঙালি অতিথিপরায়ণ জাতি হিসেবে পরিচিত হয়েছে সভ্যতার গুরু থেকেই। অন্যদিকে কালবৈশাখী, ঘূর্ণিঝড় বা জলোচ্ছ্বাসের মতো নিত্যসঙ্গী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করতে গিয়ে বাঙালি হয়ে উঠেছে দৃঢ়প্রত্যয়ী, আপোষহীন ও সংগ্রামী।

স্বাধীনতা তাই তার রক্তের ছন্দে ছন্দে। নৌকা নির্মাণে দক্ষতার কারণে নৌ-প্রতিরক্ষা বা নৌযুদ্ধে বাঙালির খ্যাতির কাহিনী ছিলো সবার জানা। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের মতে “পরিবহনের কাজে এবং যুদ্ধের কাজে তারা বিভিন্ন ধরনের নৌকা ব্যবহার করতো। দুর্গ আক্রমণের জন্যে তৈরি নৌকাগুলোর গলুইয়ের সামনের দিক ছিলো দুর্গের উচ্চতায় বেশি। ফলে সৈন্যরা সহজে দুর্গ দখল করে নিতে পারতো।

বস্ত্র উত্তাল নদ-নদী, দীর্ঘস্থায়ী বর্ষা এবং আর্দ্র আবহাওয়ার কারণে প্রাচীনকালে বঙ্গভূমি বহুদিন বহির্বিপ্লব থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলো। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে বাঙালি যুগ যুগ ধরে তার স্বাধীনতা বজায় রাখতে পেরেছিলো। এমনকি বাইরের কোনো শক্তি সাময়িকভাবে বাংলাকে দখল করে নিলেও অচিরেই বাঙালি সেই স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনতো। বিশেষ করে উত্তর ভারতীয় সম্রাটদের অনেকেই নানাভাবে চেষ্টা করেও এখানে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে নি। মুসলমান আমলে সমগ্র বাংলায় সালতানাত প্রতিষ্ঠিত

প্রশ্ন : বিয়ের জন্যে ছেলে-মেয়ের বয়সের পার্থক্য কি থাকা দরকার? থাকলে কত?

উত্তর : বিয়ের জন্যে ছেলে-মেয়ের বয়সের পার্থক্য নিয়ে অহেতুক মাথা ঘামানোর কিছু নেই। বিষয়টি আসলে তাদের দু'জনের বোঝাপড়ার।

নবীজী (সা.) তাঁর নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করেই দেখিয়ে দিয়েছেন যে, বিয়ের জন্যে নির্দিষ্ট কোনো বয়সের পার্থক্য থাকার প্রয়োজন নেই। যেমন, তাঁর ২৫ বছর বয়সে ৪০ বছর বয়সী মা খাদীজাকে বিয়ে করেছেন এবং সুখী দম্পতি হয়েছেন। আবার মা খাদীজার মৃত্যুর পর মা আয়েশার মতো কিশোরীও হাসিমুখে তাঁকে স্বামী হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

প্রশ্ন : ছেলে বা মেয়েকে জীবনের কোন্ পর্যায়ে বিয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত?

উত্তর : একটি ছেলে বা মেয়ে জীবনের যে কোনো পর্যায়ে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারে যদি সে মনে করে বিয়ের জন্যে শারীরিক, মানসিকভাবে সে প্রস্তুত এবং বিবাহিত জীবনের দায়িত্ব নিয়মিত সামর্থ্য তার আছে। কারণ মনে রাখতে হবে, বিয়েটা শুধু জৈবিক চাহিদা পূরণের উপায় নয়, শুধু হানিমুন বা রোমান্টিকতা নয়, বরং বিয়ে হচ্ছে একটি দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত মনে করলেই তখন একটি ছেলে বা মেয়ে তার যে কোনো বয়সে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

তবে সেই সাথে কাকে বিয়ে করবেন, সে বিবেচনাও গুরুত্বপূর্ণ। সত্যিকারের সুখী এবং আনন্দপূর্ণ পরিবার গঠনের জন্যে একটি ছেলে বা মেয়ের তাকেই বিয়ে করা উচিত যাকে সে সম্মান করতে পারে, তার সহযোগী মনে করতে পারে এবং যে তার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে এবং তার জন্যে প্রয়োজনে সবকিছু বিসর্জন দিতে পারবে।

তাই বিয়ের জন্যে শুধু সৌন্দর্য বা অর্থ-বিত্ত নয়, বা উচ্চ ডিগ্রী নয়; ভালো মানুষ খুঁজতে হবে, যার সাথে চেতনার মিল আছে এবং যিনি এ জীবনের পরও মহাজাগতিক জীবনে আপনার সঙ্গী হতে পারবেন।

প্রশ্ন : ছাত্রী জীবনে কলেজ পর্যন্ত আমরা ছেলে-মেয়ে একসাথে পড়েছি। আমার বিয়ে হয়েছে ১৮ বছর এবং স্বামীর প্রতি আমি ১০০% ভাগ বিশ্বে। কিন্তু আমার কোনো ছেলে বন্ধুর সাথে হঠাৎ দেখা হলে এবং কথা হলে আমার স্বামী আমাকে সন্দেহ করেন, আমার সঙ্গে অদ্ভুত আচরণ করেন। এতে আমার মনে খুব কষ্ট লাগে। মেডিটেশনে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করি। কিন্তু বাস্তবে এ নিয়ে কখনো কথা বলি নি। আসলে কারও সাথে দেখা হয়ে গেলে তো আর তাকে অস্বীকার করা যায় না। একথা তাকে কীভাবে বোঝাই?

উত্তর : অনেক পুরুষ বা মহিলা আছেন যাদের সন্দেহ বাতিক রয়েছে। তারা স্ত্রীকে বা স্বামীকে নিজের সম্পত্তি মনে করেন এবং অন্য কারও সঙ্গে কথা বলাটাকে সন্দেহের চোখে দেখেন। এটা এক ধরনের মানসিক রোগ। আপনার স্বামীর ক্ষেত্রে তেমনটি হতে পারে বা না-ও হতে পারে। তবে এক্ষেত্রে আপনাকে সচেতন হতে হবে। কারণ যার সাথে মাঝে মাঝে দেখা হয়, তার সাথে দেখা না হলেও চলে। কিন্তু ঘরে অশান্তি করে আপনি সুখী হবেন না। তাই সম্ভব হলে এই সম্পর্কগুলোকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলুন। আর কখনো সহপাঠীদের সাথে দেখা হয়ে গেলে স্বামীর সামনেই তাদের সাথে কথা বলুন, স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন।

মেডিটেশনে আপনার স্বামীকে বোঝাবার পাশাপাশি সময়-সুযোগ বুঝে সরাসরিও তাকে বলতে

বিয়ে সংক্রান্ত অবিদ্যা

উত্তর দিচ্ছেন

গুরুজী

পারেন। কারণ আপনি আপনার স্বামীর প্রতি ১০০% ভাগ বিশ্বে হলেও তিনি এ ব্যাপারে ১০০% ভাগ নিশ্চিত নন বলেই তার এই সন্দেহবাতিক। তাই আপনি নিজের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে সুযোগ মতো সরাসরি স্বামীকে বোঝাতে চেষ্টা করুন। দেখবেন আপনি তা পারছেন।

প্রশ্ন : সন্তানকে তার জীবন-সঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে সঠিক পরামর্শ কীভাবে দেবো?

উত্তর : সন্তানকে যদি আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে জীবন-সঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে আলাদা করে পরামর্শ দেয়ার কিছু নেই। জীবনের ব্যাপারে সঠিক দিক-নির্দেশনা দিয়ে ছোটবেলা থেকে গড়ে না তুলে শুধু বিয়ের ব্যাপারে বোঝালে হবে না। আর অন্যদিকে তাকে অনন্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুললে এ বিষয়টি সে এমনই বুঝতে পারবে।

প্রশ্ন : বাড়ির বৌকে শাশুড়ি-ননদ নানাভাবে কষ্ট দেয়। ননদরা মনে করে তাদের অধিকার সবচেয়ে বেশি। শাশুড়ি ছেলের বৌকে জ্বালাতন করেন, কাজের মহিলার মতো দেখেন আর নিজের মেয়েদেরকে বিয়ের পরও জামাই-বাচ্চাসহ ছেলের সংসারে, যেখানে তিনি থাকেন, সেখানে থাকতে দেন। এ ব্যাপারে কি করা উচিত?

উত্তর : যে মহিলা তার মেয়েকে বিয়ের পরও নিজের কাছে রেখে দিতে চান, তিনি তার মেয়েরই সবচেয়ে বড় ক্ষতি করছেন। কারণ যে পুরুষ ঘর জামাই হিসেবে থাকে সে আসলে মেরুদণ্ডহীন কাপুরুষ। এরকম পুরুষের স্ত্রী কখনো সুখী হতে পারে না। আর ছেলের বৌকে অত্যাচারকারী কোনো জালেম মায়ের মেয়েও সুখী হতে পারে না।

আর আপনাকে কাজের মহিলা হিসেবে কেন গ্রহণ করেছে? কারণ আপনার মেরুদণ্ড নেই, শেকড় নেই বা আপনার নিজের কিছু করার ক্ষমতা নেই। নিজের পরিচয় না থাকলে তো কাজের মহিলাই হতে হবে। আসলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক অত্যন্ত পবিত্র এবং পরিপূরক সম্পর্ক। পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক। আর পারস্পরিক শ্রদ্ধা তখনই আসে যখন পুরুষের পাশাপাশি নারীরও নিজস্ব পরিচয় থাকে। অতএব আপনি যদি কাজের মহিলা হিসেবে গণ্য হয়ে থাকেন সেজন্যে আপনার এবং আপনার মা-বাবার দায়িত্ব কোনো অংশে কম নয়।

প্রশ্ন : এ্যারেঞ্জড বিয়ের ক্ষেত্রে পাত্রী হিসেবে একটি মেয়ে কীভাবে বুঝবে পাত্র সচ্চরিত্র এবং ভালো কি না। অনেক সময় পাত্রকে সামনা সামনি খুব ভদ্র মনে হলেও পরে দেখা যায় সে আসলে বদরাগী। তাহলে পাত্র সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানবো কী করে?

উত্তর : এটি একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেক সময় ছেলের ডিগ্রী, চেহারা, লৌকিক আচরণ দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে যাই। কিন্তু এটা মোটেই উচিত নয়।

সময় নিয়ে পাত্রের খোঁজ-খবর নেয়া উচিত। আর এটা তেমন কঠিন নয়। কারণ খোঁজ নিতে চাইলে শুধু পাত্র কেন, পাত্রের পরিবার সম্পর্কেও জানা সম্ভব। এক্ষেত্রে অবশ্য পাত্রীর চাইতে তার বাবা-মার দায়িত্বই বেশি।

প্রশ্ন : আমি একটি অবিবাহিতা মেয়ে। সম্প্রতি বিয়ের একটি প্রস্তাব এসেছে। ছেলে ইঞ্জিনিয়ার। ৬ মাস আগে তার স্ত্রী মারা গেছে। এর বেশি আমি জানি না। তবে আমি আমার অভিভাবকদের পাত্রের ব্যাপারে খোঁজ নিতে বলেছি এবং ‘আপত্তি নেই’ জানিয়েছি। বিষয়টি নিয়ে আমি কোনো হীনমন্যতায়ও ভুগছি না। আমার সিদ্ধান্ত কি সঠিক?

উত্তর : স্ত্রী বা স্বামী মারা যেতেই পারেন। এতে সেই ভদ্র লোককে বা ভদ্র মহিলাকে বিয়ে করা যাবে না বা বিয়ে করলে হীনমন্যতায় ভুগতে হবে এটি একটি অবিদ্যা। তবে তার সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে হবে। কারণ অনেক সময় অনেক কিছু গোপন করা হয়। যেমন, ঐ ভদ্র লোকের হয়তো সন্তান থাকতে পারে। সন্তান থাকাটা বিয়ের ক্ষেত্রে বাধা নয়। কিন্তু আপনাকে জানতে হবে যে সন্তান আছে এবং আপনি তা জেনেই তার কাছে যাচ্ছেন। আর জেনে শুনে বিয়ের পর সে সন্তানের মায়ের দায়িত্বও আপনাকে পালন করতে হবে।

অনেক সময় দেখা যায়, বিয়ের আগে পাত্রের আগের সন্তানদের কথা জেনেছেন, তাদের লালন-পালন করার ইচ্ছাও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু বিয়ের পরে সেই বাচ্চাদের আর দেখছেন না, অবহেলা, অত্যাচার করছেন, নতুন সংসারে তাদেরকে উৎপাত বলে ভাবছেন। এটি করলে তিনি অপরাধীর শামিল। কারণ এই বাচ্চাদের মতো অসহায় তো আর কেউ নেই। বাস্তবতা হচ্ছে, বাবার চাইতে মা মারা গেলেই সন্তানরা এতিম হয়। অথচ যে মহিলা এরকম এতিম বাচ্চা পেয়েও তার মাথায় হাত রাখতে পারেন না, তিনি খুবই দুর্ভাগা। কারণ আল্লাহ বলেন, এতিমের মাথার উপর যে হাত রাখে, তার মাথার উপর আমার হাত থাকে। অর্থাৎ আল্লাহর রহমত সবসময় তার সাথে থাকে।

স্বামীর আগের ঘরের ছেলে-মেয়ে আছে, এটা জেনে বিয়ে করার পরও তাকে সন্তানের সন্তান মনে করা, বিমাতাসুলভ আচরণ করার কোনো অধিকার আপনার নেই। যদি না জেনে থাকেন, তাহলে স্বামীকে ছেড়ে আসুন। কিন্তু অসহায় এতিম বাচ্চাদের কষ্ট দিতে পারেন না। আর এটা না জানাটা অপরাধ। কারণ আপনি ভালো মতো খোঁজ নেন নি। আবার পুরুষদের ক্ষেত্রেও এমনটি হতে পারে—বিধবা মহিলার ছোট সন্তান আছে জেনেই কোনো পুরুষ তাকে বিয়ে করলো। কিন্তু এরপর সে এ বাচ্চাকে সাথে রাখতে চাচ্ছে না, বা তার উপর অত্যাচার করছে। সেই পুরুষটিও অপরাধী এবং প্রকৃতির প্রতিশোধ থেকে সে বাঁচতে পারবে না। আসলে বিয়ে বা পরিবার মানে দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে না পারলে বিয়ে করবেন না। আপনাকে কেউ বলে নি বাচ্চাসহ পুরুষ বিয়ে করতে বা বাচ্চাসহ মহিলা বিয়ে করতে। কিন্তু বিয়ে যদি করেন, তাহলে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

প্রশ্ন : মেয়ে নিজের পছন্দ মতো মা-বাবার অমতে বিয়ে করলে কি করণীয়?

উত্তর : বিয়ে করে ফেললে তো আর করার কিছু নেই। যদি ছেলে মেয়ের যোগ্য হয় তাহলে তাদের গ্রহণ করবেন। তাদের জন্যে দোয়া করবেন। কারণ সন্তানকে সুখী দেখাটাই মা-বাবার কাম্য হওয়া উচিত। তবে মা-বাবার দোয়া না নিয়ে কোনো সন্তানেরই এভাবে বিয়ে করে ফেলা উচিত নয়।

ফাউন্ডেশন সংবাদ

চট্টগ্রাম সেন্টার

মা-জীর চট্টগ্রাম সফর



চট্টগ্রামে ব্যায়াম ও সাইকি কোর্স সম্পন্নকারীদের মধ্যে সার্টিফিকেট বিতরণ করছেন মা-জী

গত ৬ এবং ৭ জুলাই চট্টগ্রাম সেন্টার সফর করেন শ্রদ্ধেয়া মা-জী। এ সফরকালে মা-জী মহিলা সেলের সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করেন এবং সাইকি ও ব্যায়ামে অগ্রহী ও অংশগ্রহণকারীদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। এসব কার্যক্রমে সার্টিফিকেট বিতরণ, প্রশ্নোত্তর পর্ব ছাড়াও উপস্থিত সদস্যদের উদ্দেশ্যে তিনি দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন।

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ওয়ার্কশপ

গত ১৮ জুন এবং ১৬ জুলাই সেন্টারের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সেলের উদ্যোগে ক্যারিয়ার প্ল্যানিং বিষয়ক দিনব্যাপী দু'টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সেলের উপদেষ্টা ও ক্যারিয়ার কনসালট্যান্ট জনাব রায়হান উদ্দিন খানের পরিচালনায় ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ও এর বিভিন্ন ধাপ নিয়ে তথ্য নির্ভর এ ওয়ার্কশপে প্রায় অর্ধ শতাধিক সদস্য অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্কশপের ৩য় পর্ব অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২৭ আগস্ট।

মহিলা সেলের কার্যক্রম

গত ১৯ জুন মহিলা সেলের উদ্যোগে বিশেষ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে 'পারিবারিক জীবনে অবদান' নিয়ে আলোচনা করেন জনাব মোহাম্মদ সালাউদ্দিন দুলু ও চট্টগ্রাম সেন্টারের অর্গানাইজার জনাব মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন। অনুষ্ঠানে ৩০ জন মহিলা সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবেদক : শাহরিয়ার হোসেন

সিলেট সেন্টার

সিলেটে বৃক্ষরোপণ



দায়িত্বশীলদের সঙ্গে নিয়ে সিলেট সেন্টারের পরিচালক জনাব সীতাব আলী গাছের চারা রোপণ করছেন

গত ৭ জুলাই সেন্টারের উদ্যোগে শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত শ্রীহট্ট সংস্কৃত কলেজ প্রাঙ্গণ ও ঔষধী বাগান, শহরতলীর গোয়াবাড়ি মাদ্রাসা এবং শহরের পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত মোহাম্মদপুর আবাসিক এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির ৭৫টি চারা রোপণ করা হয়।

সেবা সেল গঠন

সিলেট সেন্টারের উদ্যোগে গত জুন মাসে গঠিত হয়েছে 'সেবা সেল'। কোয়ান্টাম পরিবারের অসুস্থ রোগীদের প্রয়োজনে বিভিন্ন কাজ যেমন, হাসপাতালে রোগীর সাথে থাকা, রোগীকে পথ্য পৌছে দেয়া, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণের ব্যবস্থা করে দেয়া ইত্যাদি ক্ষেত্রে সেবা দেয়ার জন্যে কাজ করছে এই সেবা সেল। জনাব শাহরিয়ার আহমেদকে আহ্বায়ক করে গঠিত এই সেলে আরও আছেন মনসুর আলম চৌধুরী, নাসির আহমেদ, তুহিন দাস টিটো, তানিম ইকবাল জায়গীরদার, নাইম আহমেদ চৌধুরী, আলোয়া সীতাব এবং নাজমুন নাহার জেবা।

ছাতক সেলে ওয়ার্কশপ

গত ১৬ জুলাই অনুষ্ঠিত হয় 'ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণে মাটির ব্যাংক' শীর্ষক দিনব্যাপী এক বিশেষ ওয়ার্কশপ। ৪০ জন সদস্যের অংশগ্রহণে এ ওয়ার্কশপে মূল আলোচনা উপস্থাপন করেন সিলেট সেন্টারের পরিচালক জনাব মোহাম্মদ সীতাব আলী।

যশোর সেলে ১৮৩ ব্যাচের নবীন গ্রাজুয়েট বরণ



নবীন বরণ অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখছেন সেলের পরিচালক খোন্দকার সামসুজ্জামান সুজা। তাঁর ডানে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ডা. মনিরুজ্জামান

গত ২ জুলাই যশোর সেলে আয়োজিত হয় যশোরে অনুষ্ঠিত ১৮৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েটদের নিয়ে এক নবীন বরণ অনুষ্ঠান। ২৭ জন নবীন গ্রাজুয়েটসহ মোট ৪২ জন এতে অংশ নেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেলের পরিচালক খোন্দকার সামসুজ্জামান সুজা। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সেন্টারের নির্বাহী ডা. মনিরুজ্জামান।

খুলনা সেলে ১৮২ ব্যাচের নবীন গ্রাজুয়েট বরণ



নবীন বরণ অনুষ্ঠানে আলোচনা করছেন ডা. মনিরুজ্জামান

গত ২ জুলাই খুলনায় অনুষ্ঠিত ১৮২ ব্যাচের নবীন গ্রাজুয়েটদের ব্যাজ পরিয়ে, ফুল দিয়ে এবং মিষ্টি মুখ করিয়ে বরণ করে নিলো খুলনা সেলের সদস্যরা। নানা বয়সী শতাধিক ব্যক্তির অংশগ্রহণে মুখরিত এ অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নেন রাজশাহী সেন্টারের নির্বাহী ডা. মনিরুজ্জামান।

শিক্ষার্থী কার্যক্রম শুরু

গত ১৫ জুলাই কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে প্রায় দেড় শতাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের শিক্ষার্থী কার্যক্রম শুরুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক।

শিক্ষার্থী কার্যক্রমের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গুরুজী বলেন, ভালো রেজাল্ট, ভালো ছাত্র, ভালো মানুষ এবং 'জীবনে প্রথম'— এই চারটি মূল লক্ষ্যকে ধাপে ধাপে অর্জন করাই হতে হবে একজন সফল শিক্ষার্থীর জীবনের লক্ষ্য। কারণ এই প্রতিটি অর্জনই ধাপে ধাপে তাকে পরিণত করবে একজন অনন্য মানুষে, যার ব্যতিক্রমী গুণাবলি দেখে

মানুষ মুগ্ধ হবে। যেমন, ভালো রেজাল্ট এমন একটি অর্জন যা জীবনের শুরুতেই তাকে দেবে সহজ স্বীকৃতি, গ্রহণযোগ্যতা এবং বাড়তি সুবিধা যা হয়তো অন্যদের অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে পেতে হয়। আর এই ভালো রেজাল্ট করাটা খুব কঠিন কিছু নয়। এর জন্যে খুব মেধাবী হতে হবে, দামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়তে হবে, তা-ও নয়। এর জন্যে কিছু বিশেষ নিয়মে লেখাপড়া করাই যথেষ্ট। কিন্তু শুধু ভালো রেজাল্ট করলেই ভালো ছাত্র বা ভালো মানুষ হওয়া যাবে না, যদি না সে তার মেধার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটায়, জীবনে প্রথম হওয়ার জন্যে ক্রমাগত চেষ্টা চালায়। কারণ জীবনে প্রথম তিনিই, অনন্য মানুষ তিনিই, যিনি এই পরিতৃপ্তি নিয়ে মারা যেতে পারেন যে, তার মেধার যতভাবে

বিকাশ সম্ভব তিনি তা করেছেন। আর তা তখনই সম্ভব, যখন একজন মানুষ একই সাথে চৌকস ও দক্ষ এবং নৈতিক ও মানবিক শক্তিতে উজ্জীবিত হয়। আকর্ষণের কেন্দ্র বিন্দু এবং অন্যদের ভরসাস্থল ও আশ্রয়স্থল হয়।

গুরুজী বলেন, জীবনের অতি গুরুত্বপূর্ণ এই শিক্ষায় সন্তানকে শিক্ষিত করার যে ভূমিকা একসময় মা-বাবা বা শিক্ষকরা পালন করতেন, সেই দায়িত্ব নিতেই ফাউন্ডেশন শুরু করেছে এই শিক্ষার্থী কার্যক্রম। ১২ টি ক্লাসের সমন্বয়ে এক মাসব্যাপী বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্সে নিয়মিত শিক্ষার্থী যে কোনো গ্রাজুয়েট ১০০০ টাকা ফি দিয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। কোর্স শুরু হবে সেপ্টেম্বর থেকে।

এসএসসি-তে জিপিএ ৫ প্রাপ্ত কোয়ান্টাম পরিবারের শিক্ষার্থীদের কয়েকজন

এ বছর অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় কোয়ান্টাম পরিবারের শিক্ষার্থীরা ভালো ফল করেছে যাদের মধ্যে বেশ ক'জন 'এ প্রাস' অর্থাৎ জিপিএ ৫ পেয়েছে। তাদেরই কয়েকজনের পরিচিতি এখানে তুলে ধরা হলো :



সৌমেন সরকার
মতিঝিল মডেল স্কুল
১৭৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



অর্গব মোহাম্মদ খন্দকার
আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ
১৭৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



সওগাত নাজবিন খান
ভিকারনিনিসা নুন স্কুল
১৭৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



সাদিয়া সাবাহ
ভিকারনিনিসা নুন স্কুল
১৮৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



মো. শাইখ সালমান
রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল
১৬১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



রিয়াসাত আরেফিন শৌভন
গত. ল্যাবরেটরী হাই স্কুল,
রাজশাহী
১৬১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



মাহবুব উজ্জামান
মসজিদ মিশন স্কুল,
রাজশাহী
১২২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



দুরদানা রহমান সিমিন
ডা. খান্দেরী বালিকা
উচ্চ বিদ্যালয়
১৫৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



নুদরাদ নাবিলা
ডা. খান্দেরী বালিকা
উচ্চ বিদ্যালয়
১৫৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



রশদাহ মারিয়াম ডায়না
ডা. খান্দেরী বালিকা
উচ্চ বিদ্যালয়
১৮০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



ইমরান মুকিত সিদ্দিকী
নাসিরাবাদ বয়েজ হাই স্কুল
১৮৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট



শীর্ষেন্দু সরকার
কাফকো স্কুল
১৬৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

মনছবির সাফল্য জোসেফিন মিষ্টি গাইন



অবিচল বিশ্বাস নিয়ে
মনছবি দেখলে মানুষ
যে আপাতদৃষ্টে অসম্ভব
লক্ষ্যও অর্জন করতে
পারে তার প্রমাণ আমি
পেয়েছি আমার এই
ছোট্ট জীবনেই।
পরিবারের উৎসাহে
ছোটবেলা থেকে গান

গাওয়ার চর্চা ছিলো। তবে লক্ষ্য ছিলো আর
সবার মতো ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হওয়া। কিন্তু
বাধ সাধলো মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংকে
আশানুরূপ নম্বর না পাওয়া এবং ফলে উচ্চ
মাধ্যমিকে বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি হতে না পারা।
এরপর যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পালা এলো
তখনই রোখ চেপে গেল যে, আমি সঙ্গীতের
ওপর ভারতে উচ্চ শিক্ষা নেবো। কিন্তু বাবা-মা
কিছুতেই রাজি ছিলেন না। এমনকি আমি এতই
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলাম যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে
বিবিএ ভর্তি পরীক্ষা পর্যন্ত দিই নি এ ভয়ে যে,
পরীক্ষা দিলে টিকে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো আর
তখন তারা আমাকে আর যেতে দিতেন না। শেষ
পর্যন্ত কলকাতায় বিবিএ পড়ার অনুমতি পেলাম
এবং টাকা জমা দিয়ে ভর্তির প্রয়োজনীয় কাজও
সম্পন্ন করে ফেললাম।

এর কিছু দিন আগে বই মেলা থেকে
'কোয়ান্টাম মেথড' বইটি কিনে এবং 'মনছবি'
ক্যাসেট দিয়ে আমি নিয়মিত মেডিটেশন করতাম
আর মনছবি দেখতাম আমি ভারতের মুম্বাইতে
সঙ্গীতের ওপর উচ্চ শিক্ষা নিচ্ছি। আমার
বাস্তবতা যত অন্যরকমই হোক না কেন এসময়
আমার সারাক্ষণই মনে হতো, আজ হোক কাল
হোক, গান শিখতে আমি মুম্বাই যাবোই।

ইতোমধ্যে হঠাৎ করে গত জানুয়ারিতে
বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের জন্যে ভারত সরকার
প্রদত্ত স্কলারশীপের ঘোষণা দেখে আবেদন
করলাম এবং আপাতদৃষ্টে অবিশ্বাস্য হলেও যা
ঘটলো, তাহলো মুম্বাইয়ের এসএনডিটি ওমেন্স
ইউনিভার্সিটিতে হিন্দুস্থানী ভোকাল ক্লাসিকেল
মিউজিকে স্নাতক পর্যায়ে বৃত্তি লাভের বিরল
সুযোগ পেলাম।

এখন আমি সেখানে থাকছি। প্রথম বর্ষে
একটা সাবজেক্ট হিন্দিতে লিখেও আমি ফার্স্ট
ক্লাস পেয়েছি। আর এ সবই সম্ভব হয়েছে
মনছবির জন্যে। ছুটিতে দেশে এসে গত ১৪ জুন
জাতীয় জাদুঘর মিলনায়তনে একক পরিবেশনায়
একটি সঙ্গীতানুষ্ঠান করার সাফল্যও যুক্ত হয়েছে
আমার এগিয়ে চলার পথে। আমার এখনকার
মনছবি হলো ভবিষ্যতে উপমহাদেশের একজন
সফল শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা,
বাংলাদেশের বাইরেও সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যে রাখবে
তার অবদান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তা বাস্তবায়িত
হবেই। কারণ মনছবি পূরণের প্রমাণ আমি
পেয়েছি জীবনের শুরুতেই। সে আত্মবিশ্বাসই
আমার চলার পথের পাথর।

[জোসেফিন মিষ্টি গাইন ১৮৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

ব্লাড ক্যাম্প উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা

গত ১৪ জুলাই কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন
হলে আয়োজিত হয় সম্মানিত ব্লাড ক্যাম্প
উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে একটি মতবিনিময় সভা।



একজন সম্মানিত উদ্যোক্তা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের
অধ্যাপক আবেদ ঠাকুর বক্তব্য রাখছেন।

২০০০ সালে ল্যাব প্রতিষ্ঠার পর গত চার বছরে
তিনশতাধিক ব্লাড ক্যাম্প আয়োজনে কোয়ান্টাম
ফাউন্ডেশন স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমকে
সহযোগিতাকারী বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী, ব্যবসায়ী,
পেশাজীবী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং
বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রায় ৬০ জন উদ্যোক্তা
এতে অংশগ্রহণ করেন।

বিকেল ৫:৩০ থেকে রাত ৮:৩০ পর্যন্ত তিন
ঘণ্টাব্যাপী এ অনুষ্ঠানে সম্মানিত উদ্যোক্তারা বিভিন্ন
বিষয়ে নিজেরা এবং কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন স্বেচ্ছা
রক্তদান কার্যক্রমের দায়িত্বশীলদের সাথে মতবিনিময়
করেন। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো নিরাপদ ও
বিশুদ্ধ রক্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে কোয়ান্টাম ল্যাব
যে নীতিমালা অনুসরণ করে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট
ব্যাখ্যা, রক্ত বিতরণের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক কয়েকটি
জ্ঞাতব্য বিষয়কে তুলে ধরা এবং একজন উদ্যোক্তা
হিসেবে ব্লাড ক্যাম্প আয়োজনের জন্যে কোয়ান্টাম
স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম সম্পর্কে যে তথ্যগুলো জানা
থাকা প্রয়োজন তার বিস্তারিত উপস্থাপন।

উদ্যোক্তাদের নিয়ে প্রথমবারের মতো এ ধরনের
মতবিনিময় সভা আয়োজনের ফলে স্বেচ্ছা রক্তদান
কার্যক্রমের গতিশীল ধারায় আরও প্রাণের সঞ্চার
হবে বলে সবাই আশা ব্যক্ত করছেন।

২২ অক্টোবর থেকে ৬ষ্ঠ বার্ষিক কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন

এ বছর পবিত্র রমজান মাসে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৬ষ্ঠ বার্ষিক কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন। ধ্যানের স্তরে কোরআনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি ও অনুধাবনের এক অনন্য আয়োজন এই কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন। কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের আত্মশুদ্ধি ও আত্মউন্নয়নের লক্ষ্যে গত কয়েক বছর ধরে নিয়মিতভাবে আয়োজিত হচ্ছে এ কার্যক্রম।

একটানা ৮ দিনে প্রতিদিন গড়ে সাড়ে ৬ ঘণ্টা করে মোট ৪৫ ঘণ্টায় ধ্যানের স্তরে পরিপূর্ণ মৌন অবস্থায় তরজমাসহ কোরআন তেলাওয়াত শোনার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এই কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন।

আত্মনিমগ্ন অবস্থায় কোরআন শোনা হলে তা একদিকে যেমন কোরআনকে জানার সাথে সাথে মানার আগ্রহ বাড়ায়, তেমনি বৃদ্ধি করে সওয়াব।

কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৩.৪৫ মি. পর্যন্ত দুই ব্যাচে সম্পন্ন হবে এই কার্যক্রম। ১ম ব্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ২২ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর। ২য় ব্যাচ ২৯ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর। এছাড়া ৫ নভেম্বর শুক্রবার সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন মিলনায়তনে সকাল ৯টা থেকে ইফতার পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে দুই ব্যাচের সম্মিলিত আবেদী দোয়া।

উল্লেখ্য, কোয়ান্টাম পরিবারের এসোসিয়েটগণও এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসের কর্মসূচি

ঢাকায়

পরিচিতি সভা :

১৯০ ব্যাচ : ১ সেপ্টেম্বর (বুধবার)

১৯২ ব্যাচ : ২৯ সেপ্টেম্বর (বুধবার)

কোর্স :

১৯০ ব্যাচ : ১০, ১১, ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর

শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

১৯২ ব্যাচ : ৮, ৯, ১০ ও ১১ অক্টোবর

শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ :

২৪ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার)

চট্টগ্রামে

পরিচিতি সভা :

১৯১ ব্যাচ : ১৮ সেপ্টেম্বর (শনিবার)

কোর্স :

১৯১ ব্যাচ : ১, ২, ৩ ও ৪ অক্টোবর

শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ :

১৭ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার)

সিলেটে

কোর্স :

১৮৯ ব্যাচ : ৩, ৪, ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর

শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

কোয়ান্টাম বুলেটিন সেপ্টেম্বর ২০০৮

বন্যা

ত্রাণ

কার্যক্রম

২০০৮



স্যালাইন প্রকল্পে কাজ করছেন তিন প্রজন্মের স্বেচ্ছাসেবী- সন্তোরোধ বেগম সাহেরা খাতুনের সঙ্গে ৬ বছর ও ৯ বছর বয়সী মুশফিক ও মামুন এবং কয়েকজন তরুণ কোয়ান্টায়ার

সারা দেশের গ্রাজুয়েট ও এসোসিয়েটদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ

এবারের ভয়াবহ বন্যায় আর্ত-মানবতার পাশে দাঁড়াতে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উদাত্ত আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন সমাজের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ। নিজেদের একদিনের আয় বা ব্যয়ের সমপরিমাণ অর্থ ফাউন্ডেশনের ত্রাণ তহবিলে দান, ত্রাণ সংগ্রহ ও বিভিন্ন জায়গায় তা বিতরণসহ ফাউন্ডেশনের খাবার স্যালাইন তৈরি প্রকল্পে কাজ করেছেন সন্তোরোধ বৃদ্ধা থেকে শুরু করে ৬ বছরের শিশু পর্যন্ত সব বয়সী স্বেচ্ছাসেবীরা।

ত্রাণ তহবিলে এ পর্যন্ত সংগৃহীত নগদ অর্থের পরিমাণ ৬ লক্ষাধিক টাকা। এছাড়া শুকনো খাবার, ওষুধ ও বস্ত্র এবং ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় স্যালাইন প্রকল্পে তৈরি ১ লক্ষ প্যাকেট খাবার স্যালাইন সংবলিত ত্রাণ তহবিল থেকে এ পর্যন্ত বিতরণ করা হয়েছে ৭৮,০০০ প্যাকেট খাবার স্যালাইন, ১ লক্ষাধিক পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ৬,৬০০ কেজি চিড়া, ৫,২০০ প্যাকেট গুড়, ১১,০০০ কেজি চাল, ৩০০ কেজি ডাল, ৮৫০ কেজি আলু, ৯৪০ কেজি লবণ, ৫০০ প্যাকেট ব্রিচিং পাউডার, ৫০ কাটুন বিস্কিট, ৭,০০০ পিস বস্ত্র এবং প্রায় ৪০০ বিশুদ্ধ পানির ক্যান। এছাড়াও রুটি, হালুয়া, রান্না করা খাবার ও সজি এবং লাইটার, মোমবাতি ইত্যাদিও বিতরণ করা হয়।

বন্যাকবলিত ঢাকা ও তার আশপাশের এলাকা, নারায়ণগঞ্জ, বিক্রমপুর ও কিশোরগঞ্জ এবং সবচেয়ে ব্যাপকভাবে বন্যাক্রান্ত সিলেটের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে এই ত্রাণ কার্যক্রম চালানো হয়। বিশেষ করে, আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে না পারার কারণে পানিবন্দি অবস্থায় কয়েকদিন ধরে যারা ছিলেন খাবার ও পানিবিহীন, তাদের কাছে জীবন ধারণের অত্যাবশ্যকীয় এই সামগ্রীগুলো পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে নিবেদিতপ্রাণ ত্রাণ কর্মীরা।

বন্যার প্রেক্ষিতে ডায়রিয়া ও পেটের পীড়ায় আক্রান্তদের মাঝে বিতরণের জন্যে ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় স্যালাইন প্রকল্পে ২৬ শিফট কাজ করে ১ লক্ষ স্যালাইন তৈরিতে অংশ নেন দুই শতাধিক স্বেচ্ছাসেবী। প্রতিদিন স্যালাইনের গড় উৎপাদন ছিলো ৬ হাজার ব্যাগেরও বেশি।

অর্থ, সময় ও শ্রম সহায়তা এবং মেডিটেশনে দুর্গত মানুষের দুর্দশা মোচনে বিশেষ প্রার্থনায় একাত্ম হওয়া ইত্যাদি যতভাবে সম্ভব নিজেদের সামর্থ্যের সবটুকু নিয়ে এগিয়ে এসেছেন সারা দেশের অসংখ্য গ্রাজুয়েট ও এসোসিয়েট এবং সম্মিলিত চেষ্টার মাধ্যমে পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে এই দুর্ঘোণ মোকাবিলায় প্রয়াস পেয়েছেন।

কারো সাহায্য ছাড়াই হাঁটতে পারছি

কাজী সেলিম আহমেদ

প্রায় বছর
দেড়েক আগে
হঠাৎ করে
ব্রেন স্ট্রোকের
ফলে আমার
সমস্ত শরীর
প্যারালাইজড
হয়ে যায়।



কোনোরকম
চলাফেরা করতে পারতাম না। দিন-
রাত বিছানায় শুয়েই কাটাতে হতো।
তাছাড়া আগে থেকেই আমার উচ্চ
রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ইত্যাদি
শারীরিক জটিলতা ছিলো। ডাক্তারের
পরামর্শে প্রতিদিন আমাকে প্রচুর
ওষুধ খেতে হতো। এমনকি ঘুমের
ওষুধ ছাড়া ঘুমই হতো না। এক
পর্যায়ে শারীরিক অবস্থার কিছুটা
উন্নতি হয়। কিন্তু আমি বাম হাত
নাড়াতে পারতাম না এবং কারো
সাহায্য ছাড়া চলাফেরা করা সম্ভব
ছিলো না। এই দীর্ঘ অসুস্থতায়
আমার সমগ্র মনোবল ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়,
আমি মানসিকভাবে হতাশ হয়ে পড়ি।

পরবর্তীতে জানতে পারি আমার
বড় ভাই কোয়ান্টাম মেথড কোর্স
করে উপকৃত হয়েছেন। তারই
পরামর্শে আমি এ কোর্স করতে
আসি। কোর্সের চারটি দিন আমার
খুব আনন্দে কেটেছে। গুরুজীর
আলোচনা ও মেডিটেশন ভালো
লেগেছে। হিলিং মেডিটেশনে
নিজেকে নিরাময় করেছে। যে
আমাকে কোর্সের প্রথম দিন ধরে
আনতে হয়েছিলো সেই আমি শেষ
দিন কারো সাহায্য ছাড়াই হাঁটতে
পেরেছি। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমেছি।
আমার বাম হাতও নাড়াতে পারছি।

এখন আমি ঘুমের ওষুধ ছাড়াই
রাতে চমৎকার ঘুমাচ্ছি। ডায়াবেটিস
ও প্রেসারের ওষুধও খেতে হচ্ছে না।
সবচেয়ে বড় অর্জন হলো আমি
আমার মনোবল ফিরে পেয়েছি।
নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে আমি সম্পূর্ণ
সুস্থ হতে পারবো বলে বিশ্বাস করছি।
[ইঞ্জিনিয়ার কাজী সেলিম আহমেদ ১৮৮
ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

রিজুভিনেশন কোর্স

আগামী ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর, ঢাকার
ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে
অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে রিজুভিনেশন
কোর্স। দু'দিনের এই কম্প্যাক্ট
ফাউন্ডেশন কোর্স-এর আসন সংখ্যা
সীমিত। তাই প্রবেশপত্র দ্রুত সংগ্রহ
করে নেয়ার জন্যে সকল কোয়ান্টাম
গ্রাজুয়েটকে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

প্রফেসর ডা. এবিএম ইউনুস দেশের একজন বিশিষ্ট ব্লাড ক্যান্সার ও রক্ত রোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের হেমাটোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের অনারারী ডিরেক্টর হিসেবে শুরু থেকেই এ কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। এবারের সংখ্যার সাক্ষাতকার প্রতিবেদনে আমরা জানবো প্রফেসর ডা. ইউনুসের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি সম্পর্কে।

প্রফেসর ডা. ইউনুস ॥ দৃঢ়চেতা ও আত্মবিশ্বাসী এক মানুষ

“আমাদের পাঁচ ভাই তিন বোনের মধ্যে আমি নাকি ছোটবেলায় সবচেয়ে ব্রিলিয়ান্ট ছিলাম। সেজনেই আমার অন্যান্য ভাইদের বাংলা মাধ্যমে পড়ালে আমার বাবা চাইলেন আমি আরবী মাধ্যমে মাদ্রাসায় পড়াশোনা করি। কিন্তু আমি কিছুতেই তা চাই নি। ফলে এমনও হয়েছে, তারা আমাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করিয়েছেন, কিন্তু আমি পালিয়ে এসেছি এবং স্কুলে ভর্তি হয়ে পড়াশোনা করছি। অবশ্য আমার বড় ভাই এবং আত্মীয়দের কেউ কেউ আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আর ভালো ছাত্র হওয়ার সুবাদে অর্থনৈতিক বাধা হয় নি কখনো। কারণ স্কুল লেভেল থেকে শুরু করে এমবিবিএস পর্যন্ত সব পর্যায়েই আমি বৃত্তি নিয়ে পড়াশোনা করেছি। এসএসসি-র রেজাল্টের পর অবশ্য পারিবারিক বিরোধিতা আর থাকে নি। আর সে-ও এক মজার ঘটনা। আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি আমার বেড়ে ওঠার জায়গা বৃহত্তর বরিশালের এক গ্রামের স্কুল থেকে। কিন্তু বরাবরই আমি খুব আত্মবিশ্বাসী ছিলাম। পরীক্ষা দিয়েই আমি স্থির বিশ্বাস করলাম যে মেধা তালিকায় ফার্স্ট হবে। যেদিন রেজাল্ট বের হবে সেদিন সকাল বেলা রেডিও শুনছি সেই খবর শোনারই প্রত্যাশায়। কিন্তু শুনলাম আমি প্রথম নই, হয়েছি দ্বিতীয়, তা-ও দু'নম্বরের ব্যবধানে। কিশোর মনে সেই আশাহতের বেদনা খুব তীব্রভাবে আঘাত করলো।”

নিজের ছেলবেলার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এ কথাগুলো বলছিলেন প্রফেসর ডা. এবিএম ইউনুস। তার কথা থেকেই বোঝা যায়, খুব ছোটবেলা থেকেই নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করার যে দৃঢ়তা এবং নিজের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করার যে আত্মবিশ্বাস তিনি দেখিয়েছেন তা-ই প্রমাণ করে যে তিনি প্রবল মানসিক শক্তির অধিকারী একজন মানুষ। বরিশাল থেকে ঢাকায় এসে ভর্তি হলেন ঢাকা কলেজে। এইচএসসিতেও সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৬ তম হয়ে কৃতিত্বের সাথে পাশ করার পর ১৯৭৭ সালে এমবিবিএস-এ ভর্তি হলেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে। বছর খানেকের মধ্যেই লাভ করলেন মিশর, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, রাশিয়া ও ভারতে এমবিবিএস পড়ার একাধিক বৃত্তি। অবশেষে ভারতের উড়িষ্যা সম্বলপুর ইউনিভার্সিটি সুযোগটি গ্রহণ করলেন এবং প্রথম স্থান অর্জন করে কৃতিত্বের সাথে শেষ করলেন এমবিবিএস।

দেশে ফিরে ডা. ইউনুস বিসিএস পরীক্ষা দিয়ে ঢুকলেন সরকারি চাকরিতে। এর পরই ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে এমফিল কোর্সে রেকর্ড মার্কস পেয়ে অনার্স সহ প্রথম হন। এরপর হেলথ সার্ভিসে সরকারি চাকরিজীবীদের মধ্যে তিনিই প্রথম এফসিপিএস করেন হেমাটোলজির ওপর।

ডা. ইউনুস আমাদের দেশের একজন বিশিষ্ট রক্ত রোগ ও ব্লাড ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ। রক্তের বিভিন্ন রোগ— যেমন রক্ত স্বল্পতা, রক্তক্ষরণ এবং সবচেয়ে পরিচিত রোগ ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় তার রয়েছে দীর্ঘ দিনের পেশাগত এবং ভারত সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশে উচ্চতর প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা।

বাংলাদেশে যারা ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় তাদের প্রায় অধিকাংশের সাথেই চিকিৎসার কোনো না কোনো পর্যায়ে দেখা হওয়ার অভিজ্ঞতা হয়েছে ডা. ইউনুসের। তিনি জানালেন একটি চমকপ্রদ তথ্য। তাহলো, ব্লাড ক্যান্সার সম্পর্কে সাধারণের একটি ধারণা হলো এর চিকিৎসা বোধ হয় বাংলাদেশে নেই। তাই পরিবারের কারও ব্লাড ক্যান্সার হলে সবাই মিলে রোগীকে যে করাই হোক বিদেশে নিয়ে যেতে চান এবং যার ৮০% ভাগই অপ্রয়োজনীয়। কারণ একমাত্র অস্থি-মজ্জা সংযোজন ছাড়া ব্লাড ক্যান্সারের



সহস্র আজীবন স্বেচ্ছা রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে (বাম থেকে) অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ, প্রফেসর ডা. মুজিবুর রহমান ও জাতীয় অধ্যাপক ডা. নুরুল ইসলামের সঙ্গে ডা. এবিএম ইউনুস

আর সকল ধরনের চিকিৎসা সুবিধাই তুলনামূলক কম খরচে বাংলাদেশে পাওয়া যায়। অথচ একই চিকিৎসা বিদেশে বিপুল ব্যয় সাপেক্ষে করাতে গিয়ে সহায়-সম্মল বিক্রি করে রোগীর পরিবার দেশে ফিরে আসছে নিঃশব্দ হয়ে। ডা. ইউনুস বলেন, এই দুর্গতি থেকে রোগী এবং তার পরিবারকে বাঁচাতে হলে একদিকে যেমন প্রয়োজন সাধারণের সচেতনতা, তেমনি সরকারি এবং বেসরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে ক্যান্সারের চিকিৎসা সেবার মান আরও বাড়াতে হবে।

কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের অনারারী পরিচালক হিসেবে তিনি শুরু থেকে একজন আন্তরিক সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালন করছেন। কেন জড়ালেন এ কার্যক্রমের সঙ্গে— এ প্রশ্নের জবাবে ডা. ইউনুস বলেন, আমার রোগীদের বেশির ভাগেরই চিকিৎসার জন্যে রক্ত সংগলনের প্রয়োজন হয়। একবার পুরানো ঢাকার একজন ব্লাড ক্যান্সার রোগী এলেন। রক্তক্ষরণ হচ্ছিলো। রোগীর জন্যে ফ্রেশ রক্ত লাগবে। অভিভাবকরা একটি ব্লাড ব্যাংক গিয়ে নিজেদের ভাষায় বললেন ‘গরম রক্ত লাগবে’। অতএব ফ্রিজের রক্ত বের করে গরম পানি ভর্তি গামলায় কিছুক্ষণ রেখে গরম

রক্ত তাদেরকে দেয়া হলো। রোগীর দেহে সে রক্ত দেয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মারা গেলেন।

আমার পেশাগত জীবনের এরকম আরও কিছু ঘটনা আমাকে অত্যন্ত আন্দোলিত করে, ব্যথিত করে। ইতোমধ্যে কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশন কোর্স করতে এসে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের মোবাইল ব্লাড ডোনেশন কার্যক্রম সম্পর্কে জানলাম। পরবর্তীতে তাদের সঙ্গে মিলেই সিদ্ধান্ত নিলাম এমন একটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করবো যেখানে নিজস্ব ডোনার পুল সৃষ্টির মাধ্যমে নিরাপদ ও সুস্থ রক্ত সুলভে সরবরাহ করা সম্ভব হবে। এর টেকনিক্যাল দিকগুলো দেখার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় আমি নিলাম।

২০০০ সালের এপ্রিলে শুরু হলো কোয়ান্টাম ল্যাবের কার্যক্রম। মাত্র ৪ বছরের মাথায়ই এটি অর্জন করেছে তার লক্ষ্যমাত্রা। ২০০৩ সালে সংযোজিত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির সুবাদে কোয়ান্টাম ল্যাব এখন রক্তের আন্তর্জাতিক মানের একটি আধুনিক ল্যাব। বিশ সহস্রাধিক সদস্যের নিজস্ব ডোনার পুল এবং নিবেদিতপ্রাণ অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবীর আন্তরিক শ্রম এ কার্যক্রমকে দিয়েছে আরও অনন্যতা এবং গতিশীলতা। দেশে সুস্থ ও নিরাপদ রক্ত সরবরাহের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান এখন কোয়ান্টাম স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম।

তবে এখনও কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। ডা. ইউনুস বলেন, যেমন এখনও ২৪ ঘণ্টা সেবা দেয়া যাচ্ছে না। সবাইকে রক্ত দেয়ার একাধ্র চেষ্টা সত্ত্বেও সংগ্রহ স্বল্পতার কারণে বাধ্য হয়ে কাউকে কাউকে ফিরিয়ে দিতে হয়। এজন্যে ডোনার পুল আরও বাড়াতে হবে। তবে যত সীমাবদ্ধতাই থাক, গুণগত মানের প্রশ্নে আমরা কখনো আপোষ করি নি, করবোও না। কারণ আমাদের উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ করা। কোনো প্রাপ্তি বা স্বার্থ হাসিলের জন্যে নয় বরং আমিসহ প্রতিটি সদস্যের দেওয়ার প্রেরণাই কাজ করছে এর পেছনে। তাই আমি বিশ্বাস করি, এটি দিনকে দিন আরো সমৃদ্ধ হবে।



স্ত্রী ও দুই সন্তানের সঙ্গে ডা. ইউনুস

ব্যক্তিগত জীবনে ডা. ইউনুস দুই মেয়ে এবং এক ছেলের জনক। তারাও মেডিটেশন কোর্সে অংশ নিয়েছেন। ডা. ইউনুস মনে করেন, এ কোর্সে একজন মানুষের মানসিক শক্তিকে উজ্জীবিত করা এবং তাকে আত্ম-উন্নয়নের যে দিক-নির্দেশনা দেয়া হয় তা খুবই কার্যকর যদি সে নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা করতে পারে। সেই সাথে আছে মানবতার কল্যাণে উদ্বুদ্ধ করা। কোয়ান্টামের সবচেয়ে ভালো দিক হলো, এর একটি পরামর্শও ক্ষতিকর বা অপ্রয়োজনীয় নয়। এগুলোকে যে নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করবে, তার অকল্যাণের কোনো সম্ভাবনা নেই।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : রাবিয়া নাজরীন

কোয়ান্টাম শিশুসদন : যেখানে কেউ ছিন্নমূল ও পরিত্যক্ত নয়



শিশুসদনের তিন শিশু। ৬ মাসের নাদিরা তাহসীনের দু'পাশে ও মাস বয়সী দু'বোন নাকিসা তাসনীম ও নাবিলা তাসনীম

সকাল সাড়ে ৮টা। গলি থেকে বেরিয়ে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ালো শামীম-শামী দম্পতি। সময়মতো অফিসে যাওয়ার তাড়া দু'জনেরই। অথচ একটা রিক্সাও চোখে পড়ছে না। শামী বললো, “চলো দাঁড়িয়ে না থেকে হাঁটতে থাকি। সামনে হয়তো পাবো।” হাঁটতে শুরু করলো দু'জন। কিছুটা সামনে এগুতেই সিটি কর্পোরেশনের ডাস্টবিনটার সামনে চোখে পড়লো একটা জটলা। শামী বললো, “এ্যাঁই, তুমি একটু দেখ না, কী হচ্ছে ওখানে?” এগিয়ে গেল শামীম। ফিরে এসে যা জানালো তাতে মন ভীষণ খারাপ হয়ে গেল শামীর। রাতের অন্ধকারে কে বা কারা একটি নবজাত শিশুকে ওখানে রেখে গেছে। ভোরবেলা সুইপার ময়লা ফেলতে এসে দেখে বাচ্চাটাকে। তখনও নাকি বেঁচে ছিলো। সে চেষ্টামেচি করে লোক জড়ো করলো। কিন্তু কেউই বুঝতে পারছিলো না বাচ্চাটিকে নিয়ে কি করবে? বামেলার ভয়ে কেউ ওখান থেকে তুলতে পর্যন্ত সাহস পেলো না। অবশেষে দু'ঘণ্টা এ অবস্থায় থাকার পর মারা গেল শিশুটি, বারে পড়লো এক নিষ্পাপ প্রাণ।

অফিসের পথে সারাটা রাস্তা চুপ করে রইলো দু'জনে। বিষণ্ণ মনে হয়তো তারা ভাবছিলো ভোগবাদী

সমাজের বলি হতে হলো এই মাসুম শিশুটিকে— পৃথিবীর রূপ দেখার আগেই। কেউ কি নেই যারা এই শিশুদের বাঁচাতে পারে? দিতে পারে পরিচয়, গড়ে তুলতে পারে যথার্থ মানুষ হিসেবে, যে অধিকার নিয়েই সে এই পৃথিবীতে এসেছে?

পাঠক, এরকম ভাগ্যহত শিশুদের জন্যেই কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের রাজশাহী সেন্টারে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে কোয়ান্টাম শিশুসদন। এ বছর মার্চ মাসে ভাগ্যবান প্রথম শিশুটির আগমনের মাধ্যমে যার যাত্রা শুরু। ইতোমধ্যে এসেছে আরও দু'টি শিশু।

৬ মাসের নাদিরা তাহসীন এ শিশুসদনের ভাগ্যবান প্রথম শিশু। সমাজের আর দশজন শিশুর মতো নাদিরার জন্ম তার পরিবারের জন্যে নিয়ে আসে নি কোনো আনন্দ, ঠাঁই হয় নি তার মায়ের কোলে। এমনকি রাজশাহী সেন্টারের দায়িত্বশীলরা তৎপর না হলে আর কিছুক্ষণ পর শিশুটি ভারতে পাচার হয়ে যেতে পারতো। কিন্তু এই শিশুটিই শিশুসদনের বহুল কাজিক্ত প্রথম অতিথি হয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত করেছে কোয়ান্টাম পরিবারের সবাইকে। আর এই পরিবারই এখন এ শিশুর ঠিকানা, তার শেকড়, তার সবরকম নির্ভরতার আশ্রয়স্থল।

নাদিরার আগমনের তিন মাস পর এসেছে নাকিসা তাসনীম ও নাবিলা তাসনীম নামের যমজ দু'বোন। এখন এদের বয়সও প্রায় তিন মাস। মজার ব্যাপার হচ্ছে নাদিরার সঙ্গে এই দু'বোনের চেহারার আশ্চর্য মিল, যেন তিনজনই একই মায়ের সন্তান। আপন বোনের মতোই শিশুসদনের কর্মীদের মায়ের মমতায় বেড়ে উঠছে এরা।

বাংলাদেশে ছিন্নমূল ও পরিত্যক্ত এ ধরনের নবজাতকদের আশ্রয় দান ও লালনের জন্যে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি কাজ করছে কয়েকটি বেসরকারি সংগঠন; তবে প্রয়োজনের তুলনায় তা

নিতান্তই অপ্রতুল। কারণ হিসেবে অর্থ ও দক্ষ পরিকল্পনার অভাবের পাশাপাশি কাজটির সাথে জড়িত জটিলতাগুলোও কিছুটা উল্লেখযোগ্য।

তবে সৃষ্টির সেবার ব্রত নিয়ে ফাউন্ডেশন দেশের বিভিন্ন স্থানে যেসব কার্যক্রম পরিচালনা করছে তারই অংশ হিসেবে গড়ে উঠেছে এই শিশুসদন।

মা-বাবা বা অভিভাবক কর্তৃক পরিত্যক্ত যে কোনো নবজাত ও কয়েকদিন বয়সী শিশু এই শিশুসদনে আশ্রয় লাভ করতে পারবে। পাঁচ/ছয় বছর বয়স পর্যন্ত এখানে বেড়ে ওঠার পর তারা স্থানান্তরিত হবে শিশুকাননে। সেখানেই লেখাপড়া ও অন্যান্য প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তারা দক্ষ ও স্বনির্ভর মানুষ হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার সুযোগ পাবে।

আপাতত স্বল্প পরিসরে হলেও দূর প্রসারি লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে কোয়ান্টাম শিশুসদন।

শিশুর সংখ্যা বাড়ানোর জন্যে হাসপাতাল, প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগসহ সম্ভাব্য উৎসগুলোর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করছেন ফাউন্ডেশনের রাজশাহী সেন্টারের দায়িত্বশীলগণ।

প্রতিবেদক : রাবিয়া নাজরীন



শিশুদের আদর করছেন মা-জী। পাশে রয়েছেন শিশুসদনের পরিচালক সাহিদা বানু এবং রাজশাহী সেন্টারের দায়িত্বশীল দিল সেতারা চুনী ও ফাতেমা জরীন

কোয়ান্টাম শিশুসদন ও সাহিদা বানু

কোয়ান্টাম শিশুসদনের অনারারী পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন নার্সিং ইনস্টিটিউটের অবসরপ্রাপ্ত প্রিন্সিপাল সাহিদা বানু।



নার্সিং-এর মতো একটি মহান পেশায় এক দীর্ঘ ও গৌরবোজ্জ্বল জীবনের অধিকারী সাহিদা বানু। ১৯৬০ সালে ম্যাট্রিক পাশের পর নার্সিং বিষয়ে উচ্চতর লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করেন। চাকরির পাশাপাশি বিভিন্ন সময় তিনি যে উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন তার মধ্যে রয়েছে ডিপ্লোমা ইন সিনিয়র নার্সিং, ডিপ্লোমা ইন লেডি হেলথ ভিজিটর, পোস্ট

গ্রাজুয়েট ইন এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড টিচিং এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস.সি ইন নার্সিং।

৩২ বছরের কর্মজীবনে তিনি স্টাফ নার্স থেকে শুরু করে নার্সিং ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন দেশের বিভিন্ন স্থানে। বেসরকারি সংস্থা CARE এর কনসালট্যান্ট টিচার হিসেবেও কাজ করেছেন।

১৯৯৫ সালে সাহিদা বানু বৃটিশ সরকারের বৃত্তি নিয়ে স্কটল্যান্ডের ইডেনবার্গে কুইন মার্গারেট কলেজে যান এবং ইন্টারন্যাশনাল হেলথ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে গবেষণাপত্র তৈরি করেন। তাঁর এই কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বিশেষ সম্মাননা সার্টিফিকেটও লাভ করেন।

১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ সরকার নার্সিং পেশায় তাঁর অবদানের জন্যে তাঁকে জাতীয় পুরস্কারে ভূষিত করেন। রাজশাহী নার্সিং ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল হিসেবে দায়িত্ব পালনের পর ২০০০ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন।

এই অবসর গ্রহণের পর-পরই সাহিদা বানু কোয়ান্টাম শিশুসদনের কার্যক্রম শুরু করার কাজে সার্বক্ষণিক ভাবে সম্পৃক্ত হলেন। দীর্ঘ চাকরি

জীবনের পর সাধারণভাবে একজন মানুষ যে ধরনের জীবন-যাপনের কথা ভাবে, অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনের মাঝে একান্তভাবেই নিজস্ব এক অবসর জীবন, তার পরিবর্তে এত দায়িত্বপূর্ণ একটি স্বেচ্ছাসেবার কাজে নিজেকে জড়ালেন কেন— এ প্রশ্নের জবাবে সাহিদা বানু বললেন, সারা জীবন ধরে যে অভিজ্ঞতা, দক্ষতা অর্জন করেছি তার কিছুটা দিয়েও যদি মানবতার একটু উপকার করতে পারি, তবে সেটাই আমার সবচেয়ে বড় তৃপ্তি, বড় প্রশান্তি।

আবার নার্সিং পেশার একজন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে অবসর গ্রহণের পর বিভিন্ন বেসরকারি ও বিদেশি সংস্থায় আকর্ষণীয় চাকরির প্রস্তাবও পেয়েছিলেন। কিন্তু সেসব কিছুকে উপেক্ষা করে তিনি স্বেচ্ছায় নিজেকে জড়ালেন কোয়ান্টাম শিশুসদনের মতো সেবামূলক কাজে।

তাঁর দক্ষ পরিচালনায় কোয়ান্টাম শিশুসদন একটি আদর্শ সেবাকেন্দ্রে পরিণত হবে, যেখানে নাম-পরিচয়হীন পরিত্যক্ত শিশুরা পাবে শক্ত শেকড়ের পরিচয়, গড়ে উঠবে অনন্য মানুষ হিসেবে। এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

বন্যা ত্রাণ কার্যক্রম



নারায়ণগঞ্জ সেলের ত্রাণ কার্যক্রমে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন জনাব জাহিরুল ইসলাম

বন্যা দুর্গত এলাকায় ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছাসেবীদের ত্রাণ বিতরণের সময় একজন বন্যার্তকে দেয়া ফাউন্ডেশনের ফোন নাম্বারে লোকটি পরে ফোন করলেন। জানালেন, তিনিসহ আরও ১২টি পরিবার গত তিনদিন ধরে না খেয়ে আছেন। করুণ আর্তি জানালেন, “দয়া করে আমাদের জন্যে কিছু করুন।” এর আগে, ত্রাণ কর্মীদের কাছে তিনি অবশ্য কিছুই বলেন নি। হয়তো সর্বপ্রাথমী এই বন্যার ছোবলে সর্বস্ব হারিয়েও সামাজিক অবস্থানের কারণে সাহায্য প্রার্থী হবার লজ্জাকে ভুলতে পারেন নি বলে।

বিশুদ্ধ পানির অভাবে মারাত্মক ঝুঁকির সম্মুখীন নিজের ও বছরের বাচ্চাকে দেখিয়ে এক বাবা বলছেন, আমার এই বাচ্চাকে আমি কেমন করে বাঁচাবো? কোথায় পাবো একটু বিশুদ্ধ পানি?

পড়ন্ত এক বিকেলে বিশাল জলরাশির মাঝে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দ্বীপের মতো একেকটা বাড়ির দরজায় দরজায় পানিতে নেমে যখন ত্রাণ পৌঁছে দিচ্ছিলেন ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছাকর্মীরা, এক বৃদ্ধা এসে বললেন, কে তোমরা? কোথেকে এসেছ? এতদিন তো কেউ আমাদের খোঁজ নিতে আসে নি।

ওপরের বর্ণনাগুলো এবারের ভয়াবহ বন্যায় আক্রান্ত আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির কয়েকটি মর্মস্পর্শী দৃশ্যপট— যা প্রতিনির্ভিত্ব করছে সারা দেশের কয়েক কোটি মানুষের অসহায় ও নিঃশ্ব অবস্থার।

এই বিশাল ধ্বংসলীলার সামনে আমাদের সামর্থ্য হয়তো খুবই কম। কিন্তু তারপরও যার যা আছে তা নিয়েই সম্মিলিতভাবে এগিয়ে এলে পরম করুণাময়ের অনুগ্রহে আমরা এই দুর্যোগ মোকাবিলা করতে পারবো— এই বিশ্বাসে উজ্জীবিত হয়ে এবারের বন্যায় বিপন্ন মানবতার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কোয়ান্টাম।

‘৯৮ সালের বন্যার মতো এবারও বন্যা দুর্গত এলাকায় ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম হাতে নিয়েছে ফাউন্ডেশন। বিশেষ রিলিফ টিমের তত্ত্বাবধানে অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হচ্ছে এ কার্যক্রম। জনাব সি.এম কামরুন্নাহ মুনিরকে আহ্বায়ক ও জনাব মো. নাসিমুদ্দীনকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে গঠিত এ টীমে সদস্য হিসেবে আছেন সকল শাখার পরিচালকবৃন্দ। ফাউন্ডেশনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রতিটি শাখা ও সেলের গ্রাজুয়েটরা অর্থ, চাল-ডাল ও কাপড় ফাউন্ডেশনের ত্রাণ তহবিলে জমা দেন। এ ছাড়াও গ্রাজুয়েট ও এসোসিয়েটরা ত্রাণ তহবিলে

জমা দিয়েছেন তাদের এক দিনের আয় বা ব্যয়ের সমপরিমাণ অর্থ। ফাউন্ডেশন থেকে ত্রাণ সামগ্রী হিসেবে বিতরণ করা হচ্ছে চিড়া, গুড়, বিস্কুট, খাবার স্যালাইন, ব্লিচিং পাউডার ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট। ১ লক্ষাধিক পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট (হ্যালোজেন ইউএসপি) বিতরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যা প্রায় ৩,০৭,৩০০ লিটার পানি বিশুদ্ধকরণে সক্ষম।

এবার বন্যায় ফাউন্ডেশনের সবুজবাগ, মতিঝিল, উত্তরা, কুড়িল শাখা ও নারায়ণগঞ্জ সেল-এর আশেপাশের এলাকা প্রাণিত হয়। এসব এলাকায় কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য, এসোসিয়েট, ব্লাড ডোনার ও উদ্যোক্তাদের সাধ্যমতো খোঁজ-খবর নেয়া হয় এবং তাদের প্রয়োজন অনুসারে খাদ্য সামগ্রী, খাবার স্যালাইন ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট পৌঁছে দেয়া হয়।

সবুজবাগ শাখা থেকে আশেপাশের বন্যাকবলিত এলাকায় ১১,৫০০টি পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ১১,২৫২ প্যাকেট খাবার স্যালাইন, ১৫৮টি পানির জার ও ৭৭১ প্যাকেট চিড়া, গুড় বিতরণ করা হয়। ত্রাণ বিতরণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন জনাব মো. মাকসুদুল আলম, জনাব মো. হানিফ চৌধুরী, শ্রী তিতাস ঘোষ, জনাব আসাদুজ্জামান খান রিপন, জনাব মাহমুদুর রহমান ও জনাব আশিকুল ইসলাম প্রমুখ। এছাড়াও অন্যান্য শাখার প্রো-কোয়ান্টিয়ার ও এসোসিয়েটরা এ কাজে সহায়তা করেন।

মতিঝিল শাখা থেকে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের জন্যে কয়েকটি টীম গঠন করা হয়। প্রতিটি টীম আশেপাশের বন্যা কবলিত এলাকা যেমন— বাউড়া, মুগদা, শাহজাহানপুর, বাসাবো, মাভা, রামপুরা প্রভৃতি এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করে। মতিঝিল শাখা থেকে ৮,৯৫০টি পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ৯,২৩৫ প্যাকেট খাবার স্যালাইন, ৫৯৫ প্যাকেট চিড়া ও গুড় বিতরণ করা হয়। এ কাজে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন জনাব বদরুল আলম খান, জনাব দেওয়ান শাফায়েত, জনাব আবু হানিফ, জনাব তায়েব উল আলম, জনাব মো. সালাউদ্দীন ও জনাব কাজী ইমতিয়াজ ইবনে মাহতাব প্রমুখ। এছাড়াও অন্যান্য শাখা-সেলের প্রো-কোয়ান্টিয়াররাও এ কাজে অংশগ্রহণ করেন।

উত্তরা ও কুড়িল শাখা যৌথভাবে খিলক্ষেত, কুড়িল, কুড়াতলী প্রভৃতি এলাকায় বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করে। তারা ৯৮৩ প্যাকেট চিড়া, ১,১২১ প্যাকেট গুড়, ৩,৫৪৪ পিস রুটি, ৭৭ কেজি হালুয়া, ৫৫০টি পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ও ২,৭৭০ প্যাকেট খাবার স্যালাইন বিতরণসহ প্রায় ১১০টি পরিবারের দৈনিক খাবারের ব্যবস্থা করে। এ কাজে অংশগ্রহণ করেন জনাব মো. নাসির উদ্দিন, জনাব তাজ উদ্দিন সবুজ, জনাব শওকত আহমেদ বাবু, ডা. ইমতিয়াজ, জনাব মো. জাহাঙ্গীর আলম, জনাব মুন্সী এরাদত উল্লাহ নাবিল প্রমুখ।

নারায়ণগঞ্জের দেওভোগ, বাবুরাইল, বেপারীপাড়া, পঞ্চবটীস্থ বিসিক শিল্পনগরী, শাসনগাঁও, ধর্মগঞ্জ ও মুসলিম নগরের ১,৫০০ জন বন্যার্তের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে ছিলো— ১,৫৫০ কেজি চিড়া, ১,৫৫০

প্যাকেট গুড়, ৪,১২০ প্যাকেট খাবার স্যালাইন, ২,০৪৫ পিস বস্ত্র ও ৬,০০০ পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট।

ত্রাণ সামগ্রী বিতরণের আগেই ঘরে ঘরে গিয়ে প্রকৃত দুঃস্থ মানুষদের টোকে দিয়ে আসা হয়। ফলে পুরো কার্যক্রম অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সমাপ্ত হয়। ধানমণ্ডি শাখার উপদেষ্টা জনাব জাহিরুল ইসলাম পুরো ত্রাণ কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেন। পরবর্তীতে জনাব কামরুন্নাহ মুনির ও জনাব মো. নাসিমুদ্দীন-এর নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জের সৈয়দপুরে এবং বিক্রমপুরের যশলদিয়া ও কিশোরগঞ্জের আবদুল্লাহপুরে ত্রাণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লেখ্য, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যায় দুর্গত মানুষদের সেবা দানের উদ্দেশ্যে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছিলো। গৃহীত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ, ১ লক্ষ প্যাকেট খাবার স্যালাইন ও ৩ লক্ষ পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বিতরণ এবং বন্যায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত একটি গ্রামকে পুনর্বাসিত করে গ্রামের দরিদ্রদের সামগ্রিক উন্নয়নে সহযোগিতা করা ছিলো উল্লেখযোগ্য।

প্রতিবেদক : সাইফুদ্দিন হাওলাদার



ত্রিমোহনীর জেলপাড়া এলাকায় সবুজবাগ শাখার উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণের সময় এক কংকালসার বৃদ্ধ এভাবেই ক্যামেরাবন্দি হন



নারায়ণগঞ্জ সেলের ত্রাণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী কোয়ান্টিয়ারবৃন্দ



উত্তরা শাখার পক্ষ থেকে ত্রাণ বিতরণ করা হচ্ছে

১০০ ঘণ্টায় ১ লক্ষ স্যালাইন

বন্যা পরবর্তী সময়ে ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাব রোধে স্যালাইন প্রস্তুত ও বন্যার্তদের মাঝে তা বিতরণ প্রকল্প হাতে নিয়েছে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন। ফাউন্ডেশনের শান্তিনগরস্থ কেন্দ্রীয় অফিসে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে ও আইসিডিডিআরবি নির্ধারিত মানের এ স্যালাইন তৈরি প্রকল্পের আয়োজন করা হয়। ১৬ দিনের এ প্রকল্পে ২২০ জন গ্রাজুয়েট ও এসোসিয়েট স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে মোট ২৬ শিফটে এক লক্ষ খাবার স্যালাইন প্রস্তুত করেন। অর্থাৎ গড়ে প্রতিদিন উৎপাদন করা হয় ৬ হাজার প্যাকেটেরও বেশি স্যালাইন।

গত ২৭ জুলাই থেকে শুরু হয়ে ১২ আগস্ট পর্যন্ত শুক্রবার ব্যতীত সপ্তাহের অন্যান্য দিনগুলোতে দৈনিক ২ শিফটে চলে এ কার্যক্রম। এর মধ্যে এক দিনে দুই শিফটে সর্বোচ্চ ১২,০০০ স্যালাইন প্রস্তুত করা হয়।

সর্বমোট ২৬ শিফটের মধ্যে সর্বোচ্চ ২৩ শিফটে স্যালাইন তৈরিতে অংশগ্রহণ করেন ৩ জন— মিসেস আলেয়া আক্তার জাহান, জনাব মো. মাসুম ও জনাব শিমুল মাহমুদ। ২০ শিফটে কাজ করেছেন হাসনাহেনা আকতার, ১৮ শিফটে কাজ করেছেন ২ জন— বেগম শামসুন নাহার ও নাসরিন আক্তার, ১৭ শিফটে অংশগ্রহণ করেছেন রকিবুল হাসান। ১৫ শিফটে কাজ করেছেন পারভীন আক্তার, ১৪ শিফটে ৩ জন অংশগ্রহণ করেছেন— ফেরদৌসী জামান প্রতিভা, মালিহা নাগিস ও জোহরা খাতুন মুন্নি, ১৩ শিফটে অংশগ্রহণ করেছেন ৪ জন— শারমিন আক্তার,

সৈয়দা সাদেকা ইরফাত জাহান, এ.এস.এম বাকী বিল্লাহ ও অনীতা শীল। ১০ শিফটে কাজ করেছেন ৩ জন— ফাহিমা, তুষার আহমেদ ও রিফাত আরা শাহানা। এছাড়া ৮ শিফটে ২ জন, ৭ শিফটে ৬ জন, ৬ শিফটে ৭ জন, ৫ শিফটে ৬ জন, ৪ শিফটে ১৭ জন, ৩ শিফটে ২০ জন, ২ শিফটে ৪০ জন অংশগ্রহণ করেন। শুধুমাত্র ১ শিফটে অংশগ্রহণ করেন ১০৪ জন।

স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন সকল বয়সের মানুষ। একদিকে যেমন ৬ বছরের মুশফিক মাহমুদ অনন্ত, ৯ বছরের মামুন শেখ, তেমনি ৫৮ বছরের বেগম শামসুন নাহার বা ৭২ বছর বয়সী বেগম সাহেরা খাতুনও বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এ সুযোগ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চান নি। সেবার মানসিকতা নিয়ে সকলে নিজেদের সামর্থ্যের সবটুকু ঢেলে দিয়েছেন। অনেকে নিজেরা বন্যার্ত হয়েও ফাউন্ডেশনে ছুটে এসেছেন এ কাজে অংশ নিতে। গ্রাজুয়েট ছাড়াও প্রায় ৪০ জন এসোসিয়েট ও এ স্যালাইন তৈরির কাজে অংশগ্রহণ করেন।

এ স্যালাইন প্রস্তুত প্রকল্পের তত্ত্বাবধানে ছিলেন পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান। এছাড়া উপাদান সংগ্রহ ও কেনাকাটার সার্বিক দায়িত্বে ছিলেন জনাব কামরুন্ম মুন্নির ও জনাব মোহাম্মদ নাসিমুদ্দীন।

ইতোমধ্যেই বন্যাদুর্গত ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও সিলেটের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে মোট ৭৮ হাজার প্যাকেট খাবার স্যালাইন বিতরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় প্রথম বারের মতো ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় স্যালাইন প্রকল্পে অত্যন্ত স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে ৪৩ শিফটে কাজ করে প্রায় এক লক্ষ স্যালাইন প্রস্তুতিতে দেড় শতাধিক প্রো-কোয়ান্টিয়ার অংশগ্রহণ করেন।

প্রতিবেদক : সাইফুদ্দিন হাওলাদার



(ওপরে ও নিচে) স্যালাইন প্রস্তুত কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী কোয়ান্টিয়ারবৃন্দ



স্যালাইনের স্টক দেখছেন মিসেস সুরাইয়া রহমান ও জনাব সি.এম কামরুন্ম মুন্নির

সিলেটে ত্রাণ কার্যক্রম

ফাউন্ডেশনের সিলেট সেন্টারের উদ্যোগে বন্যার্তদের মধ্যে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। সিলেট শহরের বন্যা উপদ্রুত উপশহর, পূর্ব সিলেটের হরিপুর, জৈন্তা এবং পশ্চিম সিলেটের ছাতক ও সুনামগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় ১৭,৯৫০ প্যাকেট খাবার স্যালাইন, ৯,৭৫০ কেজি চাল, ৩০০ কেজি ডাল, ১,৫০০ কেজি মুড়ি, ১,৫০০ কেজি ফিটকিরি, ৫ লিটারের ১০০ পানির জার, ১,৩৫০ কেজি চিড়া, ৮৫০ কেজি আলু, ৫৫০ প্যাকেট বিস্কুট, ৯৪০ কেজি লবণ, ২,০২৫ পিস কাপড়, ১,৩০০টি মোমবাতি, ১,৭৫০টি লাইটার ও ৭,০০০টি পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট, ২০টি প্যারাসিটামল সিরাপ, ৩০টি

মেট্রোনিডাজল, ১৫টি কট্রিম সিরাপ ও ২০০টি কট্রিম ট্যাবলেট বিতরণ করা হয়।

সেন্টারের পরিচালক জনাব মো. সীতাব আলী,

নির্বাহী জনাব হেলাল উদ্দীন, জনাব শাহরিয়ার আহমেদ, জনাব আজিজুর রহমানসহ বহু সংখ্যক প্রো-কোয়ান্টিয়ার এই ত্রাণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।



সিলেটের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পানিবন্দি এক পরিবারের হাতে ত্রাণ সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন সিলেট সেন্টারের পরিচালক জনাব মো. সীতাব আলী। (ডানে) সিলেট সেন্টারের উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচি



প্রশ্ন : স্বামী সন্ধ্যার পর বন্ধুদের সাথে তাস খেলে, আড্ডা দিয়ে বাসায় ফেরে। স্বামীর এসব আচরণের জন্যে সন্তানের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। আমার মেয়ে মা-বাবার সাথে বেয়াদবি করে— এ ব্যাপারে কি করবো?

উত্তর : ছোটবেলা থেকে যদি আপনার মেয়েকে যথাযথভাবে গড়ে তুলতে, তাহলে সে আজকে এরকম বেয়াদবি করতো না। আপনি হয়তো তাকে সেরকম সময় বা মনোযোগ দেন নি। এখন যোহেতু বড় হয়ে গেছে তাই বলে লাভ নেই। একটি চারা গাছ বড় হয়ে গেলে সেটাকে আর বাঁকানো যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মা-বাবা তাদের দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করেন না বলে সন্তান বথে যায়। যদিও এর ব্যতিক্রম রয়েছে, কিন্তু খুব ছোটবেলা থেকেই যদি সতর্ক থাকা যায় তাহলে ছেলে-মেয়েকে সঠিক শিক্ষায় বড় করা সম্ভব।

আর আপনার এটা দুর্ভাগ্য যে, তাস খেলে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিয়ে সময় কাটানো একজন স্বামীর স্ত্রী আপনি। স্বামীকে কমান্ড সেন্টারে এনে বোঝাতে থাকুন। হয়তো তিনি বদলাতেও পারেন।

প্রশ্ন : সন্তানদের পছন্দের ওপর ছেড়ে দিলে তো তারা কলেজ পড়াকালীন যাকেই পছন্দ তাকেই বিয়ে করতে চাইবে। তাদের চোখে তখন রঙিন চশমা থাকে, তাই সবকিছুই ভালো লাগে। বিয়ের পর ছেলেরা যে বদলে যায়, সংসার করা যে কত দায়িত্বপূর্ণ ব্যাপার এসব তাকে কে বোঝাবে?

উত্তর : আপনি নিশ্চয়ই মেয়ের মা বা বাবা। বিয়ের পর ছেলেরা বদলে যায়, এটি যদি আপনি আপনার মেয়েকে বোঝাতে না পারেন, তাহলে আর কে বোঝাবে? ছোটবেলা থেকেই যদি তাকে আত্মপ্রত্যায়া করতে পারেন এবং তার মা-বাবার বাড়িই যে তার শেকড়— এই মনছবি যদি তাকে দিতে পারেন, তাহলে এরকম ভুল করার সম্ভাবনা খুব কম। ছেলে বা মেয়ের সামনে যদি মনছবি থাকে, তাহলে কলেজ পড়াকালীন বিয়ে করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এগুলো তারাই করে যাদের জীবনে কোনো মনছবি নেই।

প্রশ্ন : আমার বিয়ে হয়েছে তিন বছর। কিন্তু স্বামীর প্রচুর দেনা থাকায় এ মুহূর্তে সন্তান চাচ্ছি না। তবে শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে চাপ আছে। অন্যদিকে বয়স ২৮ বছর হলেও সেশনজটের কারণে মাস্টার্স কমপ্লিট হয় নি। আরও দু'বছর পর সন্তান নিতে চাচ্ছি যাতে যত্নে কোনো অসুবিধা না হয়। এ ব্যাপারে পরামর্শ দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : স্বামীর দেনার সাথে সন্তানের কোনো সম্পর্ক নেই। স্বামীর দেনা স্বামী শোধ করবে। সন্তান তো আর শোধ করবে না। আর এ ব্যাপারে শ্বশুরবাড়ির প্রত্যাশাও অযৌক্তিক নয়। তবে পড়াশোনা করা অবস্থায় সন্তান চাচ্ছেন না তার যত্ন ঠিকমতো করতে পারবেন না এ আশংকায়, এটি যুক্তিসঙ্গত এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক। কারণ যে মা ক্যারিয়ার বা অন্য কোনো অজুহাতে সন্তানের অযত্ন করেন, তাকে মা না বলে ডাইনী বলাই উপযুক্ত। সন্তানের যত্ন নিতে না পারলে সন্তান নেবেন না। কিন্তু সন্তান নিলে অবশ্যই তার যত্ন নিতে হবে।

তাই মাস্টার্স শেষ করে সন্তান নিতে চাইছেন, আপনার ক্ষেত্রে এটি ঠিক আছে। তবে বিষয়টি সম্পূর্ণ আপনি ও আপনার স্বামীর ব্যক্তিগত ব্যাপার, তাই আপনারা আলোচনা করেই তা ঠিক করুন।

প্রশ্ন : যদি কেউ বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার সময় বলে যে, সে মাঝে মাঝে মদ্যপান করে তাহলে তাকে কোন দৃষ্টিতে দেখা উচিত? যদিও সে অন্য সব দিক থেকে ঠিক থাকে।

উত্তর : একজন মদ্যপ কখনোই অন্য সব দিক থেকে

বিয়ে সংক্রান্ত অবিদ্যা

উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

ঠিক থাকতে পারে না। এটি বড় বাবুর বিয়ের ঘটনার মতো। পাত্রী পক্ষের লোক বড়বাবু সম্পর্কে খোঁজ নিতে গেলে ঘটক বললো, বাবুর তেমন কোনো বদভ্যাস নেই, তবে মাঝে মাঝে পেঁয়াজ খান। জিজ্ঞেস করা হলো, শুধু পেঁয়াজ? আর কিছু তো নয়? শুধু পেঁয়াজই খান, তবে তা-ও যখন একটু মাংস খান, তখন। আর কিছু? তখন ঘটক বললো, তবে মাংসও সব সময় খান না। শুধু যখন মদ্যপান করেন তখন একটু-আধটু। এরপর শেষবারের জিজ্ঞাসার জবাবে ঘটক বললেন, তবে মদ্যপানও শুধু তখনই করেন, যখন বাড়ী-বাড়িতে যান। এছাড়া বাবুর আর সব ভালো। এ ব্যাপারটিও সে রকম। যে মদ খায় তার অন্য সব আচার আচরণেও তার ছাপ পড়ে এবং আপাতদৃষ্টি তা নজরে না পড়লেও কোনো এক সময় তা প্রকাশ পাবে।

প্রশ্ন : আমি একটি মেয়েকে পছন্দ করি। মেয়েটিও আমাকে পছন্দ করে। দু'জনের চিন্তা-চেতনায় মিল রয়েছে। দুই পরিবারের মধ্যেও অনেক সামঞ্জস্য। তারপরও আমাদের বিয়েকে দুই পরিবারের কেউই মেনে নেবেন না, কারণ মেয়েটি আমার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। এই বিয়ে কতটা জায়েজ এবং সামাজিক ক্ষেত্রে এর কি প্রভাব রয়েছে?

উত্তর : জায়েজ-নাজায়েজ প্রশ্ন এবং সামাজিক ক্ষেত্রে প্রভাব দু'টো আলাদা বিষয়। ছেলে-মেয়ে যদি সুস্থ মস্তিষ্কে, সজ্ঞানে, পরিবারের সম্মতিতে বিয়ে করে, তাহলে সেটা জায়েজ। বিয়ের জন্যে ছেলেকে মেয়ের বড় হতে হবে তা না হলে তা জায়েজ হবে না এটা দ্রষ্টব্য ধারণা। নবীজী (স) এটি তার জীবনেই বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন। যখন তার বয়স ২৫ বছর তখন ৪০ বছর বয়সী মা খাদীজাকে বিয়ে করেছেন এবং সুখী দম্পতি হয়েছেন।

কিন্তু এ ধরনের বিয়ের সামাজিক প্রভাব বা পারিপার্শ্বিক প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারটি আলাদা এবং সে সম্পর্কে আপনাদেরকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে আপনারা কতটা সাহস ও অবিচলতার সাথে মোকাবিলা করতে পারবেন। এর সাথে জায়েজ-নাজায়েজের কোনো সম্পর্ক নেই।

প্রশ্ন : পরিবারে কেউ নামাজ-কোরআন সম্পর্কে উদাসীন হলে এবং অনেক বোঝানোর পরও না বুঝলে কী করণীয়?

উত্তর : এক্ষেত্রে সে না বোঝা পর্যন্ত যত রকমভাবে সম্ভব তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতে হবে। একেক

সময় একেক কৌশল অবলম্বন করতে হবে। আসলে কেউ না বুঝলে আমরা সহজে ক্ষুব্ধ হয়ে যাই, তাকে অভিযুক্ত করি। কিন্তু তাকে তার মতো করে তার ভাষায় বোঝাতে পারছি না বলে যে সে বুঝছে না, এটা বুঝি না। অতএব আপনার চেষ্টা থাকবে সময় সুযোগ এবং ভঙ্গি বুঝে তাকে বলার চেষ্টা করা।

প্রশ্ন : আমার এক আত্মীয়া এবং তার স্বামী কর্মসূত্রে একই অফিসে ছিলেন। পদমর্যাদায় স্ত্রী ছিলেন স্বামীর চেয়ে উঁচু পদে। দু'জনেরই বদমেজাজ স্বভাব এবং বিশেষত কর্মক্ষেত্রে এই ব্যবধানের কারণে মনোমালিন্য সৃষ্টি হয় এবং এক পর্যায়ে সংসার ভেঙে যায়। কর্মক্ষেত্রে এরকম অসমতা থাকলে স্বামী/স্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি কি হওয়া উচিত?

উত্তর : এটি এক ধরনের মানসিক রোগ এবং স্বামীর দিক থেকে হীনম্মন্যতা। স্ত্রী তার চেয়ে ওপরে উঠে গেছে— এ নিয়ে অধিকাংশ স্বামীই হীনম্মন্যতায় ভোগেন। তারা মনে করেন স্ত্রী তাদের চেয়ে inferior। তাই তারা স্ত্রীকে সহযোগী মনে করতে পারেন না। যদি মনে করতেন তাহলে স্ত্রীর সম্মানকে নিজের সম্মান মনে করতেন। স্ত্রী যদি আপনার চেয়েও বেশি পরিচিত হয়, তাহলে আপনারই আনন্দিত হওয়া উচিত। যত বড় পরিচয়ই থাকুক না কেন, তিনি আপনার স্ত্রী। এতে আপনার গর্বিত হওয়া উচিত। আপনি যদি স্ত্রীকে যথাযথ সম্মান করতে পারেন তাহলে আপনার হীনম্মন্যতায় ভোগার কোনো কারণ নেই। এটাই সত্যিকার দৃষ্টিভঙ্গি।

প্রশ্ন : চিভি দেখে প্রভাবিত হই না। তবে একটি সিনেমায় মেয়েদের প্রতি নায়কের শ্রদ্ধাবোধ দেখে খুব ভালো লেগেছিলো। চাই জীবনসঙ্গীও যেন এরকম হয়। এটা কি অবিদ্যা?

উত্তর : চিভি দেখে প্রভাবিত হন না বলছেন। তাহলে মুভি দেখে কেন প্রভাবিত হন? আসলে আমরা যে প্রভাবিত হই, তা-ও মাঝে মাঝে বুঝি না। মেয়েদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ মুভির নায়কের কাছ থেকে কেন শিখতে হবে? মহামানবরাই তো এটি শিখিয়ে গেছেন। নবীজী (স)-এর জীবনে আমরা দেখি মেয়েদের প্রতি কত শ্রদ্ধাবোধ ছিলো তার। তিনি বলেছেন, মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত। বাবার বা স্বামীর পায়ের নিচে— সে কথা বলেন নি। এর চেয়ে বড় সম্মান আর শ্রদ্ধা কী হতে পারে? মুভির নায়ক কি এর চেয়ে বড় সম্মান দেখাতে পেরেছে? আমরা অঙ্গভঙ্গি দেখে বর্তে যাই। তারা যা করে তা-ই ভালো লাগে। সে যে ভান করে পয়সা উপার্জন করছে সেকথা বুঝি না।

প্রশ্ন : আমার কোয়ান্টাম প্রাজুয়েট বড় ভাই অন্য ধর্মের একটি মেয়েকে বিয়ে করতে আগ্রহী। মেয়ের পরিবার এ ব্যাপারে বোধ হয় সহযোগিতা করছে। কিন্তু আমরা আগ্রহী নই। তাকে কীভাবে বোঝাবো?

উত্তর : আপনারা যে আগ্রহী নন সেটা জানাবেন। বিয়ে শুধু একটি নারী আর একটি পুরুষের মধ্যে নয়, এটি একটি পারিবারিক ব্যাপার। বিয়ের সিদ্ধান্ত পারিবারিকভাবে সবাই মিলে নেয়া উচিত।

প্রশ্ন : বিয়ের ক্ষেত্রে নিজের চেয়ে বয়সে বড় কোনো মেয়েকে যদি পছন্দ হয়, তাহলে অনেক কথা শুনতে হয়। পারিপার্শ্বিক অনেক সমস্যা সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে কী করণীয়? নিজের চেয়ে বড় মেয়েকে বিয়ে করা কি সম্ভব?

উত্তর : সামাজিক দৃষ্টিতে এ বিষয়টি প্রচলিত নয়। ধর্মীয় বা আইনগত দিক থেকে অবশ্য কোনো বাধা নেই। আর পারিপার্শ্বিক সমস্যা থাকবেই। কারণ আপনি যদি এমন কাজ করেন যা আপনার চারপাশের মানুষ করছে না, তখন আপনাকে তো কথা শুনতেই হবে।

স্ত্রী তার চেয়ে ওপরে উঠে গেছে— এ নিয়ে অধিকাংশ স্বামীই হীনম্মন্যতায় ভোগেন। তারা মনে করেন স্ত্রী তাদের চেয়ে inferior। তাই তারা স্ত্রীকে সহযোগী মনে করতে পারেন না।

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আমার সালাম
নিবেন। সকলের
দোয়ায় আল্লাহর
রহমতে আমি এখন
সুস্থ আছি।
ডাক্তারের পরামর্শে
অবশ্য এখনও
আমাকে বিশ্রাম
নিতে হচ্ছে।



গুরুজী, আপনি তো জানেন গত ৩০ জুন থেকে সেরিব্রাল ম্যালেইরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে খুবই সংকটাপন্ন অবস্থায় আমি হাসপাতালে ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে চিকিৎসাধীন ছিলাম। ৫/৬ দিন ধরে আমার কোনো হুঁশ ছিলো না। আপনি যেদিন

গুরুজীকে লেখা চিঠি

রাতে সবাইকে আমার জন্যে মেডিটেশন করতে বলেছিলেন সেদিন এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিলো।

চার দিন ধরে আমার ১০৩° থেকে ১০৫° জ্বর কিছুতেই সারছিলো না। সারাক্ষণই আমার গা মুছে দিতে হতো। রাতে সবাই মেডিটেশন করার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু রাত ১১টা থেকে ১২টা— এই এক ঘণ্টা গা মুছে না দিলে আমার অবস্থা কি হবে এই ভেবে আমার মা মেডিটেশনে বসতে চাচ্ছিলেন না।

পরে একজনের অনুরোধে তিনি অন্যদের

সাথে মেডিটেশনে বসেন। এক ঘণ্টা মেডিটেশনের পর আমার শরীর স্পর্শ করে দেখা গেল সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা। জ্বর একদম সেরে গেছে। পরদিন সকালেই আমার জ্ঞান ফিরলো টানা ৪ দিন পর। এসব পরে আমি মায়ের কাছ থেকে শুনেছি। মা যখন এ কথাগুলো বলেন তখন তিনি চোখের পানি ধরে রাখতে পারেন নি।

গুরুজী, এত মানুষের ভালবাসা ও সেবায় আমি অসম্ভব ঋণী হয়ে গেলাম। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সৃষ্টির সেবা করেও এই ঋণের বিপরীতে কিছু করা হয়তো সম্ভব নয়। আপনি ও মা-জী আমার জন্যে দোয়া করবেন। ইতি—

আপনার স্নেহের
আমজাদ হুসাইন

ছাত্র, ১০২ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

ফাউন্ডেশন সংবাদ

রাজশাহী সেন্টার কোয়ান্টাম তথ্য কেন্দ্র



গত ১৭ জুলাই থেকে ৫ দিনব্যাপী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের রবীন্দ্র বাগিচা ভবন চত্বরে একটি তথ্য কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে উৎসাহীদের কোয়ান্টাম মেড ও কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করা হয়। প্রতিদিন প্রায় ৭০ জন আত্মহী ছাত্র-শিক্ষক ও অন্যান্যরা তথ্য কেন্দ্রটি পরিদর্শন করেন ও তথ্য সেবা গ্রহণ করেন।

গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ

গত ২৩ জুলাই, শুক্রবার রাজশাহী টেনিস কমপ্লেক্স মিলনায়তনে দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ। পারিবারিক জীবনে অবিদ্যা, পর্ব-৪ শীর্ষক এই ওয়ার্কশপে গুরুজী চারটি বিশেষ মেডিটেশন ও আলোচনাসহ গ্রাজুয়েটদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। উপস্থিত ছিলেন ২৩২ জন।

প্রো-কোয়ান্টিয়ার ওয়ার্কশপ

গত ২৪ জুলাই, শনিবার রাজশাহী টেনিস কমপ্লেক্স মিলনায়তনে সকাল ৯টা থেকে প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী এক বিশেষ প্রো-কোয়ান্টিয়ার ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ফাউন্ডেশনের রাজশাহী সেন্টার আয়োজিত এ ওয়ার্কশপে গুরুজী দায়িত্বশীলদের

জীবনের লক্ষ্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। অগ্রসর গ্রাজুয়েট ও প্রো-কোয়ান্টিয়ার মিলে ৯৫ জন এ ওয়ার্কশপে অংশ।

ব্যায়াম কোর্সের প্রত্যয়ন

গত ২৮ জুলাই বুধবার বিকেলে কোয়ান্টাম ব্যায়াম কোর্সের ২য় ব্যাচের প্রত্যয়ন অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সের প্রশিক্ষক আহমেদ জুবাইর হাসান এবং আয়েশা সিদ্দিকা ফারাহ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। প্রায় ৪০ জন কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ও এসোসিয়েট এতে অংশগ্রহণ করেন।

স্বেচ্ছা দাফন কার্যক্রম

গত মার্চ মাসে সেন্টারের স্বেচ্ছা দাফন কার্যক্রম গুরু হওয়ার পর এ যাবত একজন সনাতন ধর্মাবলম্বীর লাশের শেষকৃত্যসহ মোট ৯ জন দরিদ্র বা নাম পরিচয়বিহীনের লাশ দাফন করা হয়।

মা-জীর রাজশাহী সফর

গত ২ আগস্ট, সোমবার শ্রদ্ধেয়া মা-জী রাজশাহী সেন্টার সফর করেন। দুই দিনব্যাপী এ সফরে মা-জী শতাধিক গ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টারকে ব্যক্তিগত সাক্ষাত প্রদান করেন।

যশোর সেল

১ম গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপ



গত ২৩ জুলাই, শুক্রবার ফাউন্ডেশনের যশোর সেলের উদ্যোগে দিনব্যাপী বিশেষ ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ৪০ জন গ্রাজুয়েটের উপস্থিতিতে আলোচনা করেন পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান ও কেন্দ্রীয় পাঠচক্রের পরিচালক মওলানা ছায়ীদুল হক।

আলোচকরা বলেন, ফাউন্ডেশনের সকল কার্যক্রম

সৃষ্টির সঙ্ঘটি অর্জনের ভিত্তিতে পরিচালিত। আত্মউন্নয়ন ও সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ করে নিজেকে অনন্য মানুষে পরিণত করা ও জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছা সম্ভব।

সাইকি ওরিয়েন্টেশন ক্লাস

গ্রাজুয়েটদের আত্মিক উন্নয়ন ও অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ১৫ ও ১৬ জুলাই দু'দিনব্যাপী ১ম ব্যাচের সাইকি ওরিয়েন্টেশন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। ক্লাস পরিচালনা করেন সেলের সাইকি প্রশিক্ষক শরফরাজ আবু আব্দুল্লাহ এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সেল পরিচালক খন্দকার সামসুজ্জামান সুজা।

চট্টগ্রাম সেন্টার

মওলানা ছায়ীদুল হকের চট্টগ্রাম সফর

গত ১০ আগস্ট, মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় পাঠচক্রের পরিচালক মওলানা ছায়ীদুল হক চট্টগ্রাম সেন্টার সফর করেন। দিনব্যাপী এ সফরে তিনি দান ও প্রো-মাস্টারদের আত্মমূল্যায়ন পত্র সংরক্ষণের গুরুত্বের ওপর আলোচনা করেন। তিনি সেন্টারের মাটির ব্যাংক টিমের সাথে মাটির ব্যাংক কার্যক্রম পর্যালোচনা ও মোটিভেশন বিষয়ে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন।

আত্মবাদ সেলের বর্ষপূর্তি

গত ৬ জুলাই আত্মবাদ সেলের তৃতীয় বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উদযাপিত হয় সেলের নিজস্ব কার্যালয়ে। এতে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৭০ জন গ্রাজুয়েট ও এসোসিয়েট। বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আকর্ষণীয় একটি দেয়ালিকাও প্রকাশ করা হয়।



আত্মবাদ সেলের দেয়ালিকা উদ্বোধন করছেন চট্টগ্রাম সেন্টারের অর্গানাইজার জনাব এস.এম. সাজ্জাদ হোসেন

একটি শিশু হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ না খৃষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করবে সে সিদ্ধান্ত একমাত্র স্রষ্টার। পবিত্র বাইবেলে বলা হয়েছে ঈশ্বর মানুষকে তার সাদৃশ্যে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে ঘৃণা করা মানে ঈশ্বরকে ঘৃণা করা। মানুষকে ভালবাসা মানে ঈশ্বরকে ভালবাসা। আর প্রতিটি ধর্মের মূল সুর একই— স্রষ্টাকে ভালবাসো, মানুষকে ভালবাসো। ক্ষমা ও প্রেমে হৃদয়কে পরিপূর্ণ কর। তাহলেই পরিত্রাণ পাবে।

গত ২৭ জুলাই, মঙ্গলবার মাসিক মুক্ত



মাননীয় আর্চ বিশপ মাইকেল রোজারিও-এর হাতে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দিচ্ছেন গুরুজী ও মা-জী

মাসিক মুক্ত আলোচনা সব ধর্মের মূল সুর একই

আর্চ বিশপ মাইকেল রোজারিও

আলোচনায় প্রধান অতিথির ভাষণে ‘যীশুর জীবন ও শিক্ষা’ প্রসঙ্গে এ কথাগুলো বলেন বাংলাদেশে মহামান্য পোপের প্রতিনিধি খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আর্চ বিশপ মাইকেল রোজারিও।

আর্চ বিশপ তার আলোচনায় বলেন, একটি মানব শিশু কোন ধর্মীয় পরিবেশে জন্মগ্রহণ করবে সে ব্যাপারে স্রষ্টার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। সেজন্যে জন্ম নয়, বিবেক অনুসারে কর্মই তাকে হয় স্বর্গে না হয় নরকে নিয়ে যাবে। আর ধর্মীয় দিক থেকে কর্মের



বলেন, ভালবাসার এই দুটি দিকের মধ্যে মানুষকে ভালবাসা তুলনামূলকভাবে কঠিন। এক্ষেত্রে প্রধান বাধা হচ্ছে ক্ষমা করতে না পারা। আর এ ব্যাপারে খৃষ্টান ধর্মের একটি শিক্ষা হলো অন্যের কাছ থেকে যা আশা কর আগে নিজে সে আচরণ কর। অর্থাৎ অন্যায় করে আমি যদি অন্যের কাছ থেকে ক্ষমা আশা করি তাহলে আমার প্রতি কেউ অন্যায় করলে তাকেও ক্ষমা করতে হবে। আর এ ক্ষমাও খৃষ্ট ধর্মের অন্যতম প্রধান শিক্ষা। কারণ যেখানে ক্ষমা আছে, সেখানে ভালবাসা আছে। ক্ষমার মাধ্যমে সৃষ্টিকে ভালবাসা যায়। সৃষ্টিকে ভালবাসলে স্রষ্টাকে ভালবাসা যায়। আর সেটাই স্বর্গ লাভের উপায়। সকল ধর্মের মূল কথা এটিই।

প্রতিবেদক : নাজমুন নাহার

ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা হলো, ঈশ্বরকে ভালবাসো এবং মানুষকে ভালবাসো। মানুষকে ভালবাসার অর্থ এই নয় যে, একজন খৃষ্টান আরেকজন খৃষ্টানকেই শুধু ভালবাসবে।

আর্চ বিশপ

রিউম্যাটিক ফিভার ভালো হয়েছে

সুমনা রহমান

খুব ছোটবেলা থেকেই আমি সাইনুসাইটিসে ভুগছি। তাছাড়া রিউম্যাটিক ফিভারও ছিলো।



আমার জন্ম ভারতের নাগাল্যান্ডে। ওখানকার দু’জন ডাক্তারের পরামর্শে আমি আট বছর নিয়মিত ওষুধ খেয়েছি। পরবর্তীতে এদেশে আসার পর সিলেটের দু’জন প্রখ্যাত ডাক্তারের পরামর্শে ওষুধ খেতে থাকি। এতে রোগের তীব্রতা কমেছে বটে কিন্তু নির্মূল হয় নি। তাই ওষুধ আর রোগ যন্ত্রণাকে নিয়ে চলছিলাম।

কিন্তু কয়েক মাস নিয়মিত হিলিং মেডিটেশন করে সাইনুসাইটিস ও ১২ বছর পুরানো রিউম্যাটিক ফিভার বিদায় নিয়েছে। এ সাফল্যে আমি অভিভূত।

আমার স্মৃতিশক্তিও অনেক বেড়েছে। ফলে দ্রুত পড়া তৈরি করতে পারছি। তাছাড়া কমান্ড সেন্টার ব্যবহার করে যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে অনুকূলে নিয়ে আসায় লাভবান হচ্ছি।

[সুমনা রহমান ১১৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

আমি পেয়েছি অন্তর্গুরু ড. এম শাহ আলম খান

ভীষণ যুক্তিবাদী আমার মন। সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করি। স্রষ্টাকে খুঁজি যুক্তি দিয়ে। দর্শন, সাহিত্য, এমনকি কোরআনেও যুক্তি খুঁজি। ফলে কিছুদূর এগিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যাই। অনুভূতি স্থবির হয়ে পড়ে। কোর্সের ১ম দিনের আলোচনার পর সমস্ত যুক্তিকে বাস্তববন্দি করে ঘরে রেখে এসেছি মুক্ত মন নিয়ে। এখন আমার মাকেও বলেছি, এ কোর্স তার করা দরকার। এ থেকেই বোঝা যায় আমার উপলব্ধি।



‘আমি এক অনন্য মানুষ, আমরা এক মহান জাতি’ চমৎকার একটা লোগো। এ কথাটি দেশকে ভালবেসে দেশে থাকতে আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে। জীবনের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের কাছ থেকে দীক্ষা পেয়েছি। পেয়েছি অন্তর্গুরু। সে এক অবর্ণনীয় অনুভূতি। তিনি এখন আমার নির্ভরযোগ্য সঙ্গী।

[বুয়েটের ইনস্টিটিউট অব ওয়াটার এন্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্টের এসিস্টেন্ট প্রফেসর ড. এম শাহ আলম খান, ১৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

দীর্ঘ ৮ বছর পর একটানা ৩ ঘণ্টা ঘুমিয়েছি

জান্নাত মারিয়া

প্রায় ২৫ বছর হয়ে গেল আমাদের বিয়ের। ছেলে-মেয়ে জন্মের পর রাতে তাদের ঘুম পাড়িয়ে পাশে বসে থাকতাম যে কোনো সময় জেগে উঠতে পারে, বিছানা ভিজিয়ে ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে ভেবে। দিনের পর দিন এরকম চলতে থাকায় একসময় এমন হয়ে গেল যে, রাতে আর ঘুম আসে না। সবাই যখন গভীর ঘুমে, আমি জেগে হয় ইবাদত করছি, নয়তো বিছানায় এপাশ-ওপাশ করছি। নিজের ঘুমের ওষুধের প্রেসক্রিপশন নিজেই করতাম। কিন্তু তন্দ্রা ভাব আসা ছাড়া কোনো কাজ হতো না। কোর্সের প্রথম দিন ‘আয় ঘুম আয়’ টেকনিক শিখে রাতে প্রয়োগ করলাম। ৯৯৯ থেকে উল্টো গুণতে গুণতে ৭০০-র ঘরে এসে কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম টের পাই নি। একটানা তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছি। যা গত সাত-আট বছরে হয় নি।



[গৃহিণী জান্নাত মারিয়া ১৮৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

কোয়ান্টাম ব্যায়াম করে শারীরিক কষ্ট থেকে মুক্তি

সালমা আক্তার

দীর্ঘ দিন ধরে মেরুদণ্ডের ব্যথায় ভুগছিলাম। তাছাড়া রাতে খাবারের পরপরই বুকে গ্যাস জমা



হতো, যার কারণে প্রতি রাতেই ঘুমাতে কষ্ট হতো। এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে কোয়ান্টাম ব্যায়াম কোর্সে ভর্তি হই। নিয়মিত ব্যায়াম এবং শিথিলায়নের মাধ্যমে আমার অনেক দিনের এসব সমস্যা থেকে এখন আমি মুক্ত। মাত্র ৭ দিন ব্যায়াম করেই দীর্ঘ দিনের শারীরিক কষ্ট থেকে মুক্তি পেলাম। দম, পরিমিত আহার এবং নিয়মিত কোয়ান্টাম ব্যায়ামের অনুশীলনের মাধ্যমে সুস্বাস্থ্য লাভ করা সম্ভব যা নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করেছি।

[সালমা আক্তার, ১৬৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট, সহকারী অধ্যাপিকা, বেগম বদরুন্নেছা কলেজ]

ক্লাসে প্রথম ও জীবনে প্রথম হওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থী কার্যক্রম শুরু

“প্রতিটি মানুষের মধ্যেই বড় কিছু করার সম্ভাবনা রয়েছে। সে-ই সফল হয় যে এই সম্ভাবনায় বিশ্বাস স্থাপন করে এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্যে নিয়মিত কাজ করে ও পথের বাধাগুলোকে দূর করার জন্যে সচেতন চেষ্টা চালায়। এ সূত্রকে প্রয়োগ করেই পৃথিবীর সফল ব্যক্তিদের ৯০% অত্যন্ত সাধারণ পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে উঠে এসেছেন। শিক্ষার্থী কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তোমরাও প্রমাণ করেছ গড়ালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে ব্যতিক্রমী হওয়ার প্রক্রিয়ায় নিজেদের সম্পৃক্ত করার আন্তরিক আগ্রহ তোমাদের রয়েছে। এ প্রক্রিয়া আন্তরিকভাবে অনুসরণ করলেই তোমরা ক্লাসে প্রথম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনেও প্রথম হবে।”

গত ২৫ সেপ্টেম্বর, শনিবার বিশেষ শিক্ষার্থী কার্যক্রমের পায়োনিয়ার ব্যাচের প্রথম ক্লাসে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে একথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী।

২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত শান্তিনগরস্থ সেমিনার হলে

বিশেষ শিক্ষার্থী কার্যক্রমের পায়োনিয়ার ব্যাচের শেষ ক্লাসে জীবনে প্রথম হওয়ার মনছবিতে নিম্নলিখিত শিক্ষার্থীদের কয়েকজন



ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসের কর্মসূচি

ঢাকা

পরিচিতি সভা :

১৯৩ ব্যাচ : ১ ডিসেম্বর (বুধবার)
১৯৪ ব্যাচ : ২৯ ডিসেম্বর (বুধবার)

কোর্স :

১৯৩ ব্যাচ : ১০, ১১, ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর (শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

১৯৪ ব্যাচ : ৭, ৮, ৯ ও ১০ জানুয়ারী, ২০০৫ (শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

কমপ্যাক্ট রিজুভেনেশন কোর্স :

১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর (বৃহস্পতি ও শুক্রবার)

মাস্টার্স কমপ্যাক্ট রিপট কোর্স :

২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর (শুক্র ও শনিবার)

প্রতিদিন দেড় ঘণ্টা করে ১২ দিনে অনুষ্ঠিত এ কোর্সে অংশ নেন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ জন শিক্ষার্থী। কোর্সের মডারেটর রাবিয়া নাজরীনের সহযোগিতায় ক্লাস পরিচালনায় আরও অংশ নেন নাজমুন নাহার, শম্পা রায়, প্রাণজিৎ লাল শীল ও ফেরদৌসী সুলতানা। প্রত্যেকেই স্ব-স্ব শিক্ষাক্ষেত্রে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন।

সমাপনী ক্লাসে গুরুজী ‘কীভাবে শুরু করতে হবে’- সে সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা দেন। তিনি বলেন, “শুরু করতে হবে মনছবি দিয়ে। কারণ মনছবি শুরু হয় শূন্য থেকে, শেষ হয় পূর্ণতা দিয়ে। সেই সাথে রুটিন অনুসরণের মাধ্যমে সময়ের ওপর নিজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এখানে শেখা পড়াশোনার ও পরীক্ষা দেয়ার বিশেষ কায়দা-কানুন প্রয়োগ করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকারক সম্পর্ক ত্যাগ করে এমন সম্পর্কে মিশতে হবে যা সং ও নিজের লক্ষ্য অর্জনের পথে সহায়ক।”

শিক্ষার্থী কার্যক্রমের ১ম ব্যাচের ক্লাস শুরু হবে ৩ ডিসেম্বর, শুক্রবার।

অক্টোবর মাসে সরবরাহ ১৭৮৩ ইউনিট

গত অক্টোবর মাসে কোয়ান্টাম ল্যাব সর্বমোট ১৭৮৩ ইউনিট রক্ত উপাদান সরবরাহ করেছে। সরবরাহকৃত রক্তের মধ্যে ছিলো ২০৬ ইউনিট প্লাটিলেট কনসেন্ট্রেট, ১৭০ ইউনিট ফ্রেশ ফ্রোজেন প্লাজমা, ৪১ ইউনিট প্লাটিলেট রিচ প্লাজমা, ৩৯৭ ইউনিট রেড সেল কনসেন্ট্রেট ও ৯৬৯ ইউনিট হোল ব্লাড। এর মধ্যে ল্যাব ও ক্যাম্পের সংগ্রহ যথাক্রমে ৫৫৫ ইউনিট ও ৮২৭ ইউনিট। ল্যাব প্রতিষ্ঠার পর এক মাসে এটাই সর্বোচ্চ পরিমাণ রক্ত সরবরাহ।



অবিদ্যা পর্ব-৫ (বিবাহ খণ্ড) ওয়ার্কশপে গুরুজী

বিয়ের ব্যাপারে ভুল ধারণা ও মাত্রাতিরিক্ত প্রত্যাশাই দাম্পত্য জীবনে অশান্তির প্রধান কারণ

‘রাজা বানকে আনারে, মুঝে লেকে যানারে, ছম ছমছম ছম।’ বিয়ের প্রসঙ্গে হিন্দি সিনেমার এই গানটিতে যে উচ্ছ্বাস, যে মোহময় কল্পনা ফুটে উঠেছে, বাস্তব জীবনেও তা-ই হবে— এমন অলীক কল্পনা করতে গিয়েই বিয়ে সংক্রান্ত অবিদ্যা বা ভ্রান্ত ধারণায় আক্রান্ত হই আমরা। যার প্রথমটি হচ্ছে বিয়ের জন্যে খরচের প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠা। একটি মাত্র বিয়ের জন্যে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে একাধিক অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি পোশাক ও অলংকার কেনাকাটা করতে গিয়ে হয় টাকার শ্রাদ্ধ। ঋণ করে হলেও বিয়ের এই ফুটানি করতে গিয়ে অনেক পরিবার দুর্দশায় নিপতিত হয়।

অথচ বিশ্বপুঁজিবাদী চক্র নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থেই ভোজন, বিনোদন এবং জৈবিক চাহিদা পূরণকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রচার করতে মিডিয়ায় ব্যবহার করেছে। এজেন্ডাই মিডিয়াতে বিয়েকে কাল্পনিক এক বিশাল ব্যাপার হিসেবে চিত্রিত করা হয়। অথচ বিয়ে আসলে একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনা যার মাধ্যমে দু’জন নর-নারীর জৈবিক চাহিদা পূরণের বিষয়টিই সর্বজন গ্রহণযোগ্যতা পায়।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অবিদ্যা পর্ব-৫ (বিবাহ খণ্ড) ওয়ার্কশপে এক কথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। তিনি বলেন, বিয়ে সংক্রান্ত দ্বিতীয় অবিদ্যা হচ্ছে বিয়েকে ‘ফরজ’ বা বাধ্যতামূলক মনে করা। অথচ নবীজী (স.) বলেছেন, “বিয়ে হলো আমার স্নুত। যে ব্যক্তি (শারীরিক ও আর্থিক সঙ্গতি থাকার পরও) এই স্নুতকে লঙ্ঘন করলো সে আমার দলভুক্ত নয়।”

অর্থাৎ জৈবিক চাহিদা বিয়ের মাধ্যমেই পূরণ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু যিনি জৈবিক প্রয়োজন সেভাবে অনুভব করেন না, তার জন্যে বিয়ে ফরজ নয়। প্রসঙ্গত গুরুজী বিয়ের জন্যে মানসিক আগ্রহের গুরুত্বকে তুলে ধরে বলেন, কারণ যদি বিয়ের ব্যাপারে অবচেতন মনে কোনো অনীহা থাকে, তার বিয়ে হওয়া যেমন একদিকে বিঘ্নিত হবে, তেমনি জোর করে বিয়ে দেয়া হলেও আরেকটি মানুষকে প্রবঞ্চিত করা হবে। এক্ষেত্রে অভিভাবকদের জোর-জবরদস্তি একেবারেই অনুচিত।

বিয়ের তৃতীয় অবিদ্যাকে গুরুজী চিহ্নিত করেন “বিয়ে না করলে জীবন বৃথা”— এই ধারণাকে। তিনি বলেন, বিয়ে করেছেন এমন অনেকে যেমন বিখ্যাত রয়েছেন, তেমনি বিয়ে করেননি এমন প্রচুর নারী-পুরুষের নামও আমরা ইতিহাসে পাই যারা বিখ্যাত হয়েছেন। অর্থাৎ জীবন সার্থক হওয়া বা বিখ্যাত হওয়ার সাথে বিয়ের সম্পর্ক নেই। তবে, তিনি বলেন, স্বামী-স্ত্রী যদি পারস্পরিক মেধা বিকাশ ও আলোকিত পথের সহযোগী হন এবং সন্তানকে আলোকিত হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে সফল দম্পতি হিসেবে অবশ্যই তারা স্বীকৃত হবেন। আমরা এমন সফল দম্পতিই প্রত্যাশা করি।

গুরুজী আরও বলেন, বিয়েতে পাত্র-পাত্রীর পছন্দই চূড়ান্ত হওয়া উচিত। তবে তা সমসামাজিক ও সমসাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের দু’টি পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আট শতাধিক গ্রাজুয়েটের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী এ ওয়ার্কশপে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বিয়ে সম্পর্কিত আরো বহু অবিদ্যাকে চিহ্নিত করে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করা হয়।

অধ্যাপক ডা. মতিউর রহমান মোল্লা দেশের একজন বিশিষ্ট ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জন। সহজ বাংলায় বললে মুখমণ্ডল ও মুখগহ্বরের শল্য চিকিৎসক। আশির দশকের শেষ দিকে তার হাত ধরেই বাংলাদেশে ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জারির যাত্রা শুরু। বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জারি বিভাগের অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

অধ্যাপক ডা. মতিউর রহমান মোল্লা

মেধাকে যিনি

রূপান্তরিত

করেছেন সেবায়



শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের দোতলার একটি কেবিন। পাঁচ মাস বয়সী ঈষিকা এসেছে সুদূর সুনামগঞ্জ থেকে। ছোট্ট ফুটফুটে ঈষিকার মুখের দিকে তাকালে ক্ষতটাই প্রথমে চোখে পড়ে। জন্ম থেকেই তার ওপরের ঠোঁট গভীরভাবে

কাটা। তখন অস্ট্রেলিয়ার একটি সার্জন দল বাংলাদেশ সফর করছেন। মেয়ের মুখের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে ছুটে এসেছেন মা-বাবা। বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়ার বিশেষজ্ঞ সার্জনরা মিলে ৩ ঘণ্টার দীর্ঘ সার্জারি করলেন। পোস্ট অপারেটিভ ওয়ার্ডে রাতটা কাটিয়ে মায়ের কোলে করে ঈষিকা যখন কেবিনে ফিরে এলো আশেপাশের কেউই তাকে প্রথমে চিনতে পারেন নি। তাদের বিস্মিত মুখ চাওয়া-চাওয়ি বলে দিচ্ছিলো গতকালের ঈষিকা আর আজকের ঈষিকার মধ্যে কত তফাৎ। এরকম অসংখ্য ঠোঁট-কাটা রোগীর মুখে স্বাভাবিক হাসি ফিরিয়ে আনতে নেপথ্যে যারা কাজ করছেন তাদেরই একজন অধ্যাপক মতিউর রহমান মোল্লা।

“অথচ ছাত্র থাকাকালীন কখনো ভাবি নি ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেশিয়াল হবে আমার সাবজেক্ট। এনাটমি, ফিজিওলজি, দাঁত, চোখ- যে বিষয়ই হোক না কেন আমাকে ডাক্তার হতে হবে- মনের মধ্যে এ দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে ১৯৭৩ সালে ভর্তি হলাম ঢাকা ডেন্টাল কলেজে। তার আগে নওগাঁর কেডি হাইস্কুল থেকে এসএসসি পাশ করি। রেলওয়েতে বাবার বদলির চাকরির সুবাদে উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ছ’মাস পরপর আমাদেরকেও স্কুল বদল করতে হতো। এরপর রাজশাহী কলেজ থেকে ১৯৭২ সালে এইচএসসি পাশ করি। গ্রাম থেকে এসেছি বলে ডেন্টাল কলেজে সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকতাম। ইংরেজি পারতাম না বলে যেচে কারো সাথে কথাও বলতাম না। ফার্স্ট ইয়ারে রেজাল্ট তেমন ভালো হলো না। মনে কিছুটা দুঃখ নিয়ে তখন থেকেই আমার সাবজেক্টগুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করি। ধীরে ধীরে পড়ার প্রতি ভালবাসা জন্ম নিতে লাগলো। ইতিবাচক ফল পেতে দেরি হয় নি। ফাইনাল ইয়ারে থার্ড হলেও সেকেন্ড ও থার্ড ইয়ারে পরপর দু’বার ফার্স্ট হয়েছিলাম। শুধু লেখাপড়া নয়, যে কোনো কাজে নিষ্ঠা আর ভালবাসা থাকলে একসময় না একসময় ভালো ফল আসবেই।” শিক্ষা জীবনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এ কথাগুলো বলছিলেন ডা. মতিউর রহমান মোল্লা।

১৯৭৮ সালে পাশ করে বেরোনোর পর ডা. মোল্লা তার কর্মজীবন শুরু করেন কুমিল্লা সদর হাসপাতালে। ১৯৮৩ সালে তিনি জাপান সরকারের স্কলারশীপ নিয়ে ওসাকা ইউনিভার্সিটিতে ডিপ্লোমা করেন। পরে হিরোশিমা বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরাল ক্যান্সারের ওপর গবেষণা করে ১৯৮৭ সালে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। দেশে ফিরে ১৯৮৮ সালে ঢাকা ডেন্টাল কলেজে প্রথমে সহকারী অধ্যাপক এবং পরে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালন করেন।

দেশে তখন ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জারির তেমন কোনো সুযোগ ছিলো না। ডা. মোল্লা পায়োনিয়ার হিসেবে এ বিভাগের শল্য চিকিৎসা ও স্নাতকোত্তর শিক্ষা চালু করার দায়িত্ব নেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করে দেশে ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জারি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি বলেন, “আমার সৌভাগ্য যে এ সুযোগ আমি পেয়েছি। আজকে যখন দেখি আমার ছাত্ররাও দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে কাজ করছে, নিজেকে তখন সার্থক মনে হয়।” ১৯৯৯ সালে ডা. মোল্লা যোগ দেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে। সোহরাওয়ার্দীর ম্যাক্সিলোফেশিয়াল ডিপার্টমেন্টকে ঢেলে সাজানোর পুরো দায়িত্ব পড়ে তার ওপর।

অধ্যাপক ডা. মতিউর রহমান মোল্লা বাংলাদেশের প্রথম সারির একজন ওরাল এন্ড ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জন। মুখমণ্ডল ও মুখগহ্বরের বিভিন্ন অংশ যেমন

চোয়াল তালু ঠোঁট জিহ্বা গাল কপাল ইত্যাদি অংশে ক্যান্সার, টিউমার, মুখমণ্ডলের ফ্র্যাকচার এবং জন্মগত ঠোঁট-কাটা, তালু কাটা, মুখমণ্ডলের অসমান চোয়ালের হাড়ে সার্জারির মাধ্যমে সমতা আনা ইত্যাদি শল্য চিকিৎসায় তার রয়েছে দীর্ঘ দিনের পেশাগত অভিজ্ঞতা। জাপান, অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞ সার্জনদের সাথে কাজ করেছেন তিনি। ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জারিতে বিশেষ অবদানের জন্যে যুক্তরাষ্ট্রের ফেলো অব ইন্টারন্যাশনাল কলেজ অব সার্জনস্ বাংলাদেশের যে দু’জনকে সম্মাননা প্রদান করেছে তাদের মধ্যে তিনি একজন।

এ ধরনের সার্জারির পর স্বাভাবিক মুখাবয়ব সত্যিই ফিরে আসে কি না এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, এটা নির্ভর করছে সঠিক সময়ে চিকিৎসা করানোর ওপর। ঠোঁট-কাটা শিশুর জন্যে জন্মের পর থেকে প্রথম ৩ মাস আর তালু কাটা শিশুর ক্ষেত্রে এক থেকে দেড় বছর বয়স অপারেশনের জন্যে সবচেয়ে উপযুক্ত সময়। এজন্যে বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের দেশেই এখন সুচিকিৎসা দেয়া সম্ভব হচ্ছে।

কথাপ্রসঙ্গে বাংলাদেশে ওরাল বা মুখের ক্যান্সার নিয়ে এক পরিসংখ্যানের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, প্রতি বছর ৪০ থেকে ৫০ হাজার লোক এ রোগে আক্রান্ত হয়। শুধু বাংলাদেশ নয়- ইন্ডিয়া, পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৩০ ভাগ মুখের ক্যান্সারে আক্রান্ত। পুষ্টিহীনতার পাশাপাশি এ রোগের অন্যতম প্রধান কারণ হলো- তামাক পাতা, জর্দা এমনকি সুপারিও। আক্রান্তদের প্রায় ৭০ ভাগ গ্রাম থেকে আসেন। প্রাথমিক অবস্থায় ক্যান্সারে আক্রান্ত অংশে কোনো ব্যথা হয় না। ধীরে ধীরে ক্ষতটা যখন অনেকখানি ছড়িয়ে পড়ে তখন ব্যথা শুরু হয়। কিন্তু

ততদিনে ক্যান্সার অ্যাডভান্সড পর্যায়ে চলে যায়। একটু সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমেই এ অবস্থাকে এড়াতে পারা যায়।

একজন অধ্যাপক হয়েও তার সাবজেক্টে নিজেকে এখনো ছাত্র মনে করেন। তিনি বলেন, আমি মনে করি একজন মানুষের জ্ঞানার কোনো শেষ নেই। যদি কখনো মনে হয় সব জানা হয়ে গেছে তাহলে বুঝতে হবে আমিও শেষ হয়ে গেছি।

তিনি এবং তার স্ত্রী ফুকুমি মরিয়ম মোল্লা অংশ নিয়েছিলেন কোয়ান্টাম মেথড মেডিটেশন কোর্সে। তার মতে মেডিটেশনের মূল প্রাপ্তিই হচ্ছে মানসিক প্রশান্তি। মন প্রশান্ত থাকলে আনন্দের সাথে প্রতিটি কাজ করা যায়। পেশাগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন, অনেক সময় মানসিক অস্থিরতা, নার্ভাসনেস, হতাশার কারণে

মাংসপেশী ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না, চোয়ালের স্বাভাবিক মুভমেন্ট ব্যাহত হয়। ফলে হাঁড়ের জয়েন্টে ব্যথা হয়, মুখ হা করা যায় না। এসব ক্ষেত্রে সামান্য ওষুধের পাশাপাশি রোগীদেরকে তিনি মেডিটেশন করার পরামর্শ দেন।

সাত ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি অষ্টম। ভাই-বোন সবাই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এক ছেলে ও দুই মেয়ের জনক। ছেলে শুন, দুই মেয়ে নাফিসা ও আনিসাকে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই বাবা হিসেবে তার দায়িত্ব বলে তিনি মনে করেন।

তিনি বলেন, একজন ডাক্তার মানে এই নয় যে, সে শুধু ভালো সার্জারি করবে। তিনি তার ছাত্র-ছাত্রীদেরকে সার্জিকেল দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি সবসময় বলেন ভালো মানুষ হতে। সেবার মনোভাব নিয়ে যাতে তারা রোগীর পাশে দাঁড়াতে পারে। অন্যদেরকে শুধু বলেন না- নিজের জীবনেও তিনি এর প্রতিফলন দেখিয়েছেন।

তিনি স্বপ্ন দেখেন এমন এক বাংলাদেশের যেখানে প্রতিটি মানুষ হবে একই সাথে দক্ষ এবং মানবিক বোধসম্পন্ন। তার মতে- আমরা সবাই যদি নিজ নিজ ক্ষেত্রে সাধ্যমতো অবদান রাখতে পারি তাহলে এ স্বপ্নের বাস্তবায়ন শুধু সময়ের ব্যাপার।

□ সাক্ষাতকার গ্রহণে :
রাবিয়া নাজরীন ও
শাফিয়া নাজরীন



স্ত্রী ফুকুমি মরিয়ম মোল্লা, ছেলে শুন, মেয়ে নাফিসা ও আনিসা

টানা তেইশ দিন লড়াই করে অবশেষে মৃত্যুর কাছে হেরে গেল মেয়েটি। মানুষ নামের নরপশুরা শুধু তার সম্মম কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, ধারালো অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করেছে, এসিডে বলসে দিয়েছে, মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্যে শরীরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তবু রাহেলা বেঁচে ছিলো। কোনোরকমে লেগে থাকা স্পাইনাল কর্ড, এসিড আর আগুনে পোড়া শরীর নিয়ে তিনদিন দুঃসহ যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে রাহেলা রোদে পুড়েছে, বৃষ্টিতে ভিজছে, পোকা-মাকড়ের কামড় খেয়েছে। শ্রষ্টা তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন বোধকরি সেই নরপশুদের চিনিয়ে দেয়ার জন্যেই। কতটা মানসিক জোর, প্রাণশক্তি থাকলে সম্ভব এভাবে বেঁচে থাকা! একজন সত্যিকার বীরের পক্ষেই সম্ভব এভাবে লড়াই করা। তাই রাহেলা এক মৃত্যুঞ্জয়ী বীর।



বাংলাদেশের প্রতিটি নারী যদি এরকম সাহস ও প্রাণশক্তি ধারণ করতে পারতো তবে একজন নারীও আর নির্যাতিত হতো না। কোনো মানুষরূপী পিশাচ সাহস পেতো না নারীর সম্মম হামলা করার। সাধারণভাবে আমরা মনে করি, নির্যাতিত হয়েছে

মৃত্যুঞ্জয়ী রাহেলা শেখালো যা

রিফাত আরা শাহানা

যে নারীটি, যাবতীয় লজ্জা অপমান তারই। কারণ সে সম্মান হারিয়েছে। অথচ সত্যি হলো, লজ্জা, অপমান তার নয় বরং সেই পুরুষের যে নারীটিকে নির্যাতন করেছে। সম্মান হারিয়েছে সে নিজেই।

আমরা প্রতিবাদ করতে ভয় পাই, চুপ করে থাকি। যেমন ছিলাম রাহেলার বেলায়। মরণের মুখে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে নির্যাতনকারী পশুদের শনাক্ত করে গেছে, আর আমরা যার যার অবস্থানে থেকে যতটুকু প্রতিবাদ করা সম্ভব ছিলো তার সিকিভাগও করি নি। ঘৃণ্য এ পাপের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারি নি। এ লজ্জা সকলের। এ দায় আমাদের সবার। নিজের নিরাপত্তা নিয়ে সম্মত থেকে আমরা স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়েছি। একবারও ভাবি নি যে, নিজের ক্ষেত্রে হলে আমরা কী করতাম। আমরা অনুভব করি নি একজন মজলুমের যন্ত্রণাকে।

গত ২৪ সেপ্টেম্বর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত গ্রাজুয়েট ওয়ার্কশপে গুরুজী

এভাবেই রাহেলাকে বীরের সম্মানে ভূষিত করেন। তিনি আরো বলেন, যারা নারীর সম্মমহানি ঘটায় শুধু যে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত তা নয়। বরং যে সব বাবা-মায়েরা এ ধরনের সন্তানদের প্রশ্রয় দেয় তাদেরও শাস্তি হওয়া উচিত। পত্র-পত্রিকায় এসমস্ত পশুদের পাশাপাশি তাদের বাবা-মায়েরও ছবি থাকা উচিত। যাতে সবাই চিনে নিতে পারে এদের। যেন ধিক্কার জানাতে পারে সেই মা-কে, যে এরকম ফেরারী সন্তানের জন্যে লুকিয়ে খাবার নিয়ে যায়। কেননা একজন সন্তানের সুন্দরভাবে গড়ে ওঠায় যেমন মায়ের কৃতিত্ব, তেমনি সন্তান পাপাচারী হয়ে ওঠার দায়ও মায়ের। সে বাবাকেও ধিক্কার জানানো উচিত যে এমন পাপী সন্তানকে রক্ষার চেষ্টা করে।

ওয়ার্কশপে গুরুজীর পরিচালনায় বিশেষ মেডিটেশনে রাহেলা নামের এই মজলুম মেয়েটির কষ্ট ও যন্ত্রণার সাথে একাত্মতা বোধ করে চোখের পানি ধরে রাখতে পারেন নি কেউ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে যার যার অবস্থান থেকেই দাঁড়াতে হবে। তা যদি পত্রিকায় একটি ছোট চিঠি পাঠিয়ে হয়, তবুও। ধর্মিতা হয়ে, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়েও অত্যাচারী নরপশুদের যে শোনাতে পারে শান্তির বাণী— সেই মৃত্যুঞ্জয়ী রাহেলা জীবন দিয়ে যেন এ কথাটিই শিখিয়ে গেল আমাদের।

[রিফাত আরা শাহানা ফটো জার্নালিস্ট, ১৬০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

প্রকৌশলী কাদের এহসান— কাজই যার ভালবাসা



বিক্রয় উপব্যবস্থাপক প্রকৌশলী কাদের এহসান তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং বিদেশে প্রশিক্ষণের দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে পাঁচ বছরের চেষ্টায় উদ্ভাবন করেন সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে পাওয়ার সোর্স তৈরির পরিকল্পনা যা এখন দেশের অন্যতম ব্যাটারী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান রহিমআফরোজের সহায়তায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তৈরি হচ্ছে। দাম পড়ছে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পাওয়ার সোর্সের দামের ৭ ভাগের ১ ভাগ মাত্র। এর ক্ষয়রোধ ক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে বেশি।

এ সাফল্য এবং কৃতিত্বের জন্যে নিয়মিত মেডিটেশন ও

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিকে অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে উল্লেখ করেন ১১৮ ব্যাচের কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট প্রকৌশলী এহসান। সেই সাথে কোয়ান্টাম প্রো-মাস্টার স্ত্রী শিক্ষিকা শারমীন খালেদ ও একমাত্র কন্যাকে নিয়ে রচিত প্রো-অ্যাকটিভ পারিবারিক পরিমণ্ডল তাকে দিয়েছে এই নিরবচ্ছিন্ন কাজে মন-প্রাণ ঢেলে দেয়ার অনুকূল পরিবেশ।

দেশের জন্যে, মানুষের জন্যে কল্যাণকর কিছু করার চেষ্টায় নিবেদিত তার সব চেষ্টা। উল্লেখযোগ্য একটি অবদানের মাধ্যমে তিনি এর প্রমাণও রেখেছেন। ভবিষ্যতে কল্যাণমূলক আরও বিভিন্ন অবদান রাখার জন্যে আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে তিনি সবার দোয়া প্রার্থী।

□ শিরিন সালমা

ওপেন হার্ট সার্জারি আর করাতে হয় নি

ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ুন কবীর

৫/৬ বছর আগে আমার ছোট ভাইয়ের প্রথম হার্ট অ্যাটাক হয়। তখন দেশে ও বিদেশে কিছু দিন চিকিৎসা গ্রহণ করে সে সুস্থ হয়। গত বছর তার আবারও অ্যাটাক হলো। হার্ট ফাউন্ডেশনে ভর্তির পর ডাক্তাররা জানালেন এনজিওগ্রাম করে দেখতে হবে হার্ট কী পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অবস্থা বুঝে ওপেন হার্ট সার্জারি বা আর্টারিতে স্টেন্ট লাগানোর ব্যবস্থা করতে হবে। এনজিওগ্রাম এবং এ দু'ধরনের চিকিৎসার ব্যাপারে আমার ভাইয়ের মনে ভীতি কাজ করছিলো। কিছু দিন অপেক্ষার পর সে বিদেশে গেল আগেরবারের চিকিৎসকের কাছে দেখাতে। সে ধরেই নিয়েছিলো এবার ওপেন হার্ট সার্জারি করাতে হবে।

দিন পনেরো পর দেশে ফিরে সে যা জানালো তাতে আমরা বিস্মিত হলাম। কারণ তার ওপেন হার্ট সার্জারি, স্টেন্ট এমনকি এনজিওগ্রাম পদ্ধতিতেও টেস্ট করাতে হয় নি। এর চেয়ে উন্নততর একটি পদ্ধতি— 'স্ক্রিনিং টেস্ট'— করে দেখা গেল তার হার্টের রিপোর্ট আশাতীত ভালো, যা ওষুধেই নিরাময় সম্ভব।

পরম করুণাময়ের এ অসীম অনুগ্রহের জন্যে তার দরবারে লাখ শুকরিয়া। আমি বিশ্বাস করি বিশেষ হিলিং সেশনে নিয়মিত হিলিংয়েরই সাফল্য এটি। কারণ তার হার্ট অ্যাটাক হওয়ার পর থেকে দেশে ফেরা পর্যন্ত প্রায় ৮ মাস নিয়মিতভাবে চটগ্রাম সেন্টারের সাপ্তাহিক হিলিং সেশনে তার জন্যে প্রার্থনা করা হয়েছে।

[ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ুন কবীর টিএন্ডটি বোর্ডের অবসরপ্রাপ্ত বিভাগীয় প্রকৌশলী]

স্ট্রী শারমীন খালেদ ও একমাত্র কন্যার সঙ্গে প্রকৌশলী কাদের এহসান

দেশের জন্যে আন্তরিকতা ও দরদ থাকলে মেধা ও দক্ষতাকে বিকশিত করে কীভাবে দেশের সেবা করা যায় তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন প্রকৌশলী কাদের এহসান। নিজ উদ্ভাবনী ক্ষমতাকে ব্যবহার করে তিনি দেশকে বাঁচাচ্ছেন প্রতি বছর কোটি টাকার যন্ত্রপাতি আমদানির হাত থেকে।

বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহের জন্যে যে হাজার হাজার মাইল পাইপলাইন ব্যবহার করা হয় দীর্ঘদিন ব্যবহারজনিত কারণে এর ক্ষয়রোধ ও একে পুনরায় ব্যবহার উপযোগী করে তোলার জন্যে গ্যাস সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিবছর কোটি কোটি টাকা মূল্যের 'পাওয়ার সোর্স' বিদেশ থেকে আমদানি করে থাকে।

বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেম লিমিটেডের বর্তমান

প্রত্যয়ন অনুষ্ঠানে গ্রাজুয়েটদের অনুভূতি

ধর্ম ও কোয়ান্টাম পরিপূরক

মোস্তাক মোহাম্মদ

পেশাগত কারণে আমাকে ধর্ম নিয়ে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়। আমি জানি বিজ্ঞান, ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক আছে। একটা আরেকটার পরিপূরক। পাশ্চাত্য সমাজের প্রভাবে আমরা ক্রমশ বস্তুবাদী হয়ে পড়ছি। ধর্মের কল্যাণময়-

তার বাণী থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। কিন্তু এই কোর্সে এসে দেখলাম এখানে ধর্ম, বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার এক চমৎকার সমন্বয়। এ জ্ঞানের মাধ্যমে আমি আমার কাজের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করতে পারবো।

[মোস্তাক মোহাম্মদ, সহকারী অধ্যাপক, আরবী বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



মাইগ্রেন ভালো হয়েছে

মাহবুবা বুলবুল সোমা

কয়েক বছর ধরেই আমার মাইগ্রেনের সমস্যা ছিলো। এ ব্যথা নিয়ে কোনো কাজ ভালোভাবে করতে পারতাম না। সবসময় একটা অশান্তভাব থাকতো। মনে হতো এই মাইগ্রেন আর কোনো দিন ভালো হবে না। কোর্স করতে এসে প্রথম দিন থেকেই মাথা ব্যথা নেই। মনে হয় আমাকে ছেড়ে অনেক দূরে চলে গেছে। আমি এখন সুস্থতা ও আনন্দ অনুভব করছি।

[মাহবুবা বুলবুল সোমা, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত, ১৮৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



বিশ্বাস করছি সুস্থ হবো

মিজানুর রহমান রতন

১৯৯৯ সাল থেকে আমি এক অদ্ভুত সমস্যায় ভুগছি। মনে হতো আমার নাক, কান ও মাথা থেকে যেন গরম বাতাস বের হচ্ছে। বাংলাদেশের সেরা নিউরোলজিস্ট ও সাই-কিয়াট্রিস্ট দেখিয়েছি। এতে করে অর্থনৈতিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। কিন্তু এখন আমি এ আত্মবিশ্বাস অর্জন করেছি যে, নিয়মিত মেডিটেশন ও নিরাময়ের দিক-নির্দেশনা মেনে চলে আমি সুস্থ হয়ে উঠবো।

[মিজানুর রহমান রতন শিক্ষক, ১৮৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



না রেগে জিতে গেলাম

মুতাকাব্বির এ চৌধুরী

আমার মা-বাবা মারা যাবার পর মানসিকভাবে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। কোর্সে আসার সময় ড্রাইভার গাড়ি নষ্ট করে ফেললেও তাকে কোনো বকাঝকা করি নি। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, না রেগে আমিই জিতে গেলাম।

[মুতাকাব্বির এ চৌধুরী, আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায়ী, ১৭১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



অবসর জীবন কাজে লাগাবো

এম.এ. মোতালিব

শুধুমাত্র রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পারার কারণে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ-এসব ক্রমিক ডিজিজ বাঁধিয়ে ফেলি আমি। এমনকি হার্ট অ্যাটাকও হয়েছে। কিন্তু রাগ দূর করে এখন আমি প্রো-অ্যাকটিভ। আমার দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। আগে চিন্তা করতাম আর বেশিদিন বাঁচবো না। জীবনটা কোনোরকম দায়সারা ভাবে কাটিয়ে দিতে পারলেই হবে। আর এখন ভাবছি চাকরি থেকে অবসর নেয়ার পরও মানুষের জন্যে অনেক কিছু করার আছে।

[এম.এ. মোতালিব, প্রোজেক্ট কো-অর্ডিনেটিং ডিরেক্টর, ডিপার্টমেন্ট অব এগ্রিকালচার এক্সটেনশন, ১৮৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



কনফিউশন থেকে কনফিডেন্স

এ.এস.এম. তানভীর হাসান

আজন্না লালিত কনফিউশন নিয়ে আমি এসেছিলাম। ছবি আঁকার সময় প্রচণ্ড মনোযোগ দিতে হয়। শুরুতে আত্মবিশ্বাসের সাথে বসলেও যেই ছবি ভালো হতে থাকে তখনই কনফিউশন শুরু হয়, শেষ করতে পারবো তো? এ কোর্সের শুরুতেও ছিলো নানা কনফিউশন। দ্বিতীয় দিন থেকেই দেখছি কনফিউশন পালাতে শুরু করেছে। আজকে পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলতে পারছি, কনফিউশন আর নেই, আমি এখন কনফিডেন্ট।

[এ.এস.এম. তানভীর হাসান, চারুকলা ইনস্টিটিউট, ঢাকা, এর শিক্ষার্থী, ১৭৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



আমার সমস্যা প্রকৃতির সমস্যা ইফাত আরা

পরিবারকে ছেড়ে আবাসিক হলে থাকার ফলে নিজেকে খুব একা মনে হতো। আমার সমস্যাগুলো কাউকে বলতে পারতাম না। এভাবে মনের দিক থেকে দুর্বল হয়ে যাওয়ার ফলে আমার সাফল্যগুলো যেন হারিয়ে যাচ্ছিলো।

এ কোর্সে এসে আমার বিশ্বাস বেড়েছে। বুঝতে শিখেছি আমি প্রকৃতিরই অংশ। তাই আমার সমস্যা প্রাকৃতিক নিয়মেই দূর হয়ে যাবে।

[ইফাত আরা, বুয়েটে অধ্যয়নরত, ১৭৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



পরীক্ষায় নার্ভাসনেস কমে গেছে লুনা চৌধুরী

আগে পরীক্ষার সময়ে খুব নার্ভাস হয়ে পড়তাম। পরীক্ষার হলে গেলে আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেতো এবং প্রশ্নের উত্তর সব ভুলে যেতাম। এছাড়া সবসময় নেগেটিভ চিন্তা করতাম এবং ভাবতাম, আমি কিছু করতে পারবো না। কিন্তু কোর্স করে আমার নার্ভাসনেস কমে গেছে। বিশ্বাস করছি জীবনে বড় কিছু করতে পারবো।

[লুনা চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের ছাত্রী, ১৬৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



একবারেই পাস করতে পারবো রওনক জাহান

ডাক্তারি পাশ করার সাথে সাথে বিয়ে হয়ে যাওয়ায় প্র্যাকটিস করা হয়ে ওঠে নি। আমি যে একজন ডাক্তার তা ভুলে গিয়ে চিন্তা-চেতনায় হয়ে উঠি একজন খাঁটি গৃহবধূ। পরবর্তীতে ইংল্যান্ডে গিয়ে নতুন করে পড়াশোনা করা আমার জন্যে খুব কঠিন হয়ে পড়ে। কিছুতেই পাস করতে পারছিলাম না। তিন তিনবারের চেষ্টায় আমি আই.ই.এল.টি.এস প্রথম পর্ব পাস করি। এ কোর্স করে এখন আমি দ্বিতীয় পর্ব একবারেই পাস করতে পারবো বলে বিশ্বাস করছি।

[রওনক জাহান, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের চিকিৎসক, ১৮৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



ফোড হচ্ছে এমন ঝগা বিষ,
যা আপনি নিজে পান
বপাছেন আর ভাবছেন
আপনার প্রতিপক্ষ মারা

শিক্ষার্থী কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের অনুভূতি

গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত ফাউন্ডেশনে অনুষ্ঠিত হয় ১২ দিনব্যাপী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্যে বিশেষ শিক্ষার্থী কার্যক্রমের পায়োনিয়ার ব্যাচের ক্লাস। বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০ জন শিক্ষার্থী এতে অংশগ্রহণ করেন। তাদেরই কয়েকজনের অনুভূতি এখানে বিবৃত হলো।

ভালো রেজাল্ট করার আগ্রহ বেড়েছে

মোহাম্মদ নূর হোসেন

শিক্ষার্থী কার্যক্রমের মাধ্যমে লেখাপড়ায় কৌশলগত সমস্যা চিহ্নিত করার পাশাপাশি অল্প সময়ে পড়া তৈরির টেকনিকগুলো জানতে পেরেছি। এখন সময়কে পুরোপুরি কাজে লাগানোর প্রয়োজন অনুভব করছি। আর প্রথম দু'টি ক্লাসের আলোচনা ও ব্রেনের মেডিটেশনের মাধ্যমে ভেতরের অনন্য ও অফুরন্ত ক্ষমতার ব্যাপারে সচেতন হয়েছি। এখন বিশ্বাস করি আমিও ভালো রেজাল্ট করতে পারবো।

[মোহাম্মদ নূর হোসেন, মিরপুর সরকারি বাংলা কলেজের এইচএসসি ২য় বর্ষের ছাত্র, ১৭১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



হীনম্মন্যতার কোনো কারণ নেই

মোহাম্মদ আলী

এইচএসসি পরীক্ষার পর আমার সহপাঠীদের অনেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলো। আর আমি ভর্তি হলাম জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে। এ নিয়ে নিজের কাছে খারাপ লাগতো। শিক্ষার্থী কার্যক্রমে এসে দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেল। কারণ এখন আমি জানি ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হলে ভালো ছাত্র হওয়ার সুযোগ বেড়ে যায়। কিন্তু এটি অপরিহার্য নয়। বিকল্প পন্থায় চেষ্টা করেও ভালো ছাত্র হওয়া যায়। প্রয়োজন শুধু দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি এবং নিজের ওপর আস্থা স্থাপন।

[মোহাম্মদ আলী, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ম্যানেজমেন্ট-এ পড়ছেন, ১২৬ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



শিক্ষার্থী জীবনে প্রথম হওয়ার নির্দেশনা পেয়েছি

বিধান রায়

শিক্ষার্থী কার্যক্রমে অংশ নিতে চতুর্থম থেকে এসেছি আমি। এ কোর্সে অংশ নিয়ে জানলাম শিক্ষার্থী জীবনে কেন ও কীভাবে প্রথম হওয়া যায়। এই নির্দেশনাগুলো সামনে রেখে এখন থেকে নতুন উদ্যমে কাজ করছি আমি।

[বিধান রায়, এইচএসসি পরীক্ষার্থী, ১৭৯ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



প্রশান্ত প্রত্যয় নিয়ে পরীক্ষা দিতে পেরেছি

ইশরাত জাহান সেতু

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সারাদেশে অনার্স ১ম বর্ষের ফাইনাল পরীক্ষা শুরু হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষার্থী কার্যক্রমের ক্লাস চালিয়ে যেতে লাগলাম। কোর্সের মাধ্যমে পরীক্ষায় আশানুরূপ ফল করার উপায় হিসেবে বিভিন্ন নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করে এবার আমি পরীক্ষা দিতে পেরেছি তৃপ্তি ও প্রশান্ত প্রত্যয় নিয়ে।

[ইশরাত জাহান সেতু, সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজে ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্রী, ৯০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



যে কোনো পেশায় সেবা দেয়া সম্ভব

আফরোজা খানম করবী

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভাবতাম ডাক্তার হলেই বোধহয় মানুষের সেবা করা যায়। বিবিএ প্রোগ্রামে পড়ছি বলে আমার পক্ষে আর সেবা করা সম্ভব নয়। শিক্ষার্থী কার্যক্রমে এসে বুঝলাম যে আসলে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বা বিবিএ, এমবিএ করেও সেবা দেয়া সম্ভব। প্রয়োজন শুধু ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ত্যাগ করে সেবার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করা। আর মেথাকে সেবায় রূপান্তরিত করলে প্রাচুর্য আসবে সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায়।

[আফরোজা খানম করবী, এশিয়া প্যাসিফিক ইউনিভার্সিটির বিবিএর ছাত্রী, ১৫০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



বন্ধুত্ব সম্পর্কে ধারণা পেয়েছি

ফাতেমা জহুরা

শিক্ষার্থী কার্যক্রমের মাধ্যমে আমি বন্ধুত্ব সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করেছি। ক্লাসমেট হলেই সে বন্ধু নয় এবং তার ওপর আবেগগত ভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়া অনুচিত— এ সত্যগুলো জানার ফলে ক্লাসমেটদের সঙ্গে বন্ধুত্ব নয়, সুসম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে আমি সচেতন হয়েছি।

[ফাতেমা জহুরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিন্যান্সে এমবিএ করছেন, ১৭৩ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



দক্ষতা ছাড়া সত্যতা শক্তিহীন

নিজের দায়িত্ব নিজেকেই নিতে হবে

মাহিদুল ইসলাম

আমরা শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ সময় ভালো রেজাল্ট না করতে পারার জন্যে নানা অজুহাত দেখাই। যেমন ঠিকমতো ক্লাস হয় নি, পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা থাকায় পড়তে পারি নি ইত্যাদি ইত্যাদি। একজন শিক্ষার্থী যদি তার লেখাপড়ার ব্যাপারে সচেতন হয় তাহলে পারিপার্শ্বিক বাধা কোনো বাধা নয়। শিক্ষার্থী কার্যক্রমে অংশ নিয়ে ভালো রেজাল্ট না করার নেপথ্যের কারণ চিহ্নিত করার গুরুত্বপূর্ণ যে দিক-নির্দেশনাগুলো পেয়েছি তা আমার শিক্ষা জীবনে পাথেয় হয়ে থাকবে।

[মাহিদুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার্থী, ১৭১ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



পড়ায় রেগুলারিটি এসেছে

আরিফুল ইসলাম

আগের পরীক্ষাগুলোতে কেন ভালো রেজাল্ট করতে পারি নি বা পরের পরীক্ষাগুলোতে কেন ভালো করতে হবে এসব নিয়ে কখনোই ভাবতাম না। যে কারণে পরীক্ষা শুরুর এক সপ্তাহ আগে আমাকে পড়ার টেবিলে বসতে দেখা যেত। তা-ও একটানা পড়তাম না। অথচ গতকাল আমি টানা ৩ ঘণ্টা পড়তে পেরেছি।

আমি মনে করি শিক্ষার্থী জীবন কেমন হওয়া উচিত, কেন ভালো রেজাল্ট করতে হবে এবং কীভাবে ভালো রেজাল্ট করা যায় তা জানার জন্যেই একজন শিক্ষার্থীর এ কোর্সে অংশগ্রহণ করা উচিত।

[আরিফুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এল.এল.বি-তে অধ্যয়নরত, ১৮৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



বাকি সময়টুকু কাজে লাগাতে চাই

সামিনা মুস্তারীন

একাডেমিক লেখাপড়ার প্রায় শেষ পর্যায়ে আছি আমি। তারপরও শিক্ষার্থী কার্যক্রমে অংশ নিয়েছি এজন্যে যে, আগের ভুলগুলোর আর পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। যেটুকু সময় হাতে আছে তার পুরোটার সদ্যবহার করে সফলতা লাভ করাই আমার লক্ষ্য।

[সামিনা মুস্তারীন বুয়েটে এম.এস করছেন, ১৫০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]



প্রশ্ন : ছোটবেলা থেকেই মায়ের মাত্রাতিরিক্ত আল্লাদ পেয়ে পেয়ে আমার একমাত্র ভাইটি এখন একেবারেই বখে গেছে। ছিনতাই, চাঁদাবাজি ও সম্ভ্রাসী কাজকর্মের সাথে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছে নারী ঘটিত কেলিংকারীও। তারপরও মায়ের রয়েছে ছেলের প্রতি অন্ধ ভালবাসা। বোন হিসেবে আমার কী করণীয়?

উত্তর : আসলে সন্তান সুসন্তান হওয়ার কৃতিত্ব যেমন মায়ের, তেমনি কুসন্তান হওয়ার দায়ভারও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মায়ের। বিশেষ করে ছেলে সন্তানের প্রতি মা-দের অন্ধ ভালবাসা এবং মাত্রাতিরিক্ত আল্লাদই ছেলের বখে যাওয়ার প্রধান কারণ। এর কারণ হচ্ছে, সাধারণভাবে একজন মা ভাবেন তার ছেলে স্বামীর বাড়িতে তার অবস্থানকে মজবুত করার সবচেয়ে বড় অবলম্বন। ফলে সচেতন বা অবচেতনভাবে ছেলে এবং মেয়ের প্রতি তার আচরণে দেখা দেয় বৈষম্য। শিক্ষা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধায় বৈষম্য করেন। ‘ছেলে আপন, মেয়ে পর’- এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সবকিছু দেখেন। ছেলের দোষ-ত্রুটিগুলোকে তিনি হয়তো অবলীলায় ক্ষমা করে দেন। আর এই প্রশ্রয় পেতে পেতে সে আরও বেশি বেশি সীমালঙ্ঘনে উদ্বুদ্ধ হয়। এমনকি লাম্পট্য করে, নারীর সম্মত্বাহনী করেও সে আশ্রয় পায় মায়ের কাছে। মা হয়তো ভাবেন- পুরুষ মানুষ, ক্ষণিকের আবেগে একটু ভুল করে ফেলেছে। এটা মনে রাখলে কি আর চলে? অন্যায়ের প্রতিকারের চেয়ে মা সেটা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেন। হয়তো বলেন, সব দোষ সে মেয়ের। আমার ছেলে ধোয়া তুলসী পাতা। ধিক্ এরকম মাকে যে নারী হয়েও আরেকজন নারীর লাঞ্ছনাকারী ছেলেকে প্রশ্রয় দেয় শুধুমাত্র নিজের গর্ভজাত হওয়ার কারণে।

বোন হিসেবে আপনার আর কিছু করার নেই। তার জন্যে দোয়া করতে পারেন যেন সে এই পথ থেকে ফিরে আসে।

প্রশ্ন : উচ্চ শিক্ষিত একটি মেয়ের জীবন সঙ্গী যদি তেমন শিক্ষিত না হয়, তাহলে কি সমস্যা হতে পারে?

উত্তর : এটি নির্ভর করে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। একজন অশিক্ষিত স্বামীরও এমএ পাশ স্ত্রী থাকতে পারে এবং তারা সুখী পরিবার হতে পারেন। স্বামী যদি হীনম্মন্যতায় না ভুগে তার চেয়ে শিক্ষিত একজনকে স্ত্রী হিসেবে পেয়ে সম্মানিত বোধ করেন এবং স্ত্রীও যদি সেই স্বামীকে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন তাহলেই আর কোনো সমস্যা থাকে না।

প্রশ্ন : বিয়ের সময় মেয়ের পরিবার থেকে বরকে খাট আলমারিসহ নানারকম আসবাব ও ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী দেয়া হয়। এগুলো কি যৌতুকের আওতায় পড়ে?

উত্তর : অবশ্যই কনের মা-বাবা কৌতুক করে এগুলো দিচ্ছেন না। তারা যৌতুক হিসেবেই দিচ্ছেন প্রচলিত সমাজের তথাকথিত নিয়মের চাপে বাধ্য হয়ে এবং যাতে বিয়ের পর মেয়েকে স্বশ্রুত বাড়ির খোঁটা না শুনতে হয়। কিন্তু সত্য হচ্ছে, কোনো আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন ছেলেরই উচিত নয় স্বশ্রুত বাড়ি থেকে তথাকথিত উপহার হিসেবে পাওয়া এ সমস্ত আসবাব-উপকরণ গ্রহণ করা যা যৌতুকেরই নামান্তর। বরং স্ত্রীকে বলা উচিত, “দেখ, আমার খাট নেই, তুমি যদি আমার সঙ্গে মেঝেতে থাকতে পারো তাহলে আসতে পারো। আর যদি মনে কর, বাবার বাড়ি থেকে খাট আসবে, তাহলে সে খাটে তুমিই থাকবে। আমি আমার মেঝেতেই ঘুমাবো।” এটাই হলো পুরুষত্ব। “স্বশ্রুত বাড়ি থেকে না চাইতেই দিয়েছে, অতএব কী করবো?”- এই মানসিকতা আসলে মনের ভেতরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষারই অন্য নাম। এরা কাপুরুষ, লোভী এবং মেরুদণ্ডহীন ছাড়া আর কিছু নয়।

প্রশ্ন : বুড়ো বয়সে মা ছেলের ওপর নির্ভর করছেন বাধ্য

বিয়ে সংক্রান্ত অবিদ্যা

উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

হয়ে। কিন্তু ছেলে মায়ের শারীরিক-মানসিক কোনো অসুবিধার খোঁজ রাখে না। মা মর্মান্বিত হলেও ছেলেকে খুব ভালবাসেন বলে গুমরে থাকেন, আল্লাহর কাছে ছেলের জন্যে ক্ষমা চান, যাতে এসবের কারণে তার কোনো ক্ষতি না হয়। তারপরও কি ছেলের ক্ষতি হবে?

উত্তর : যে ছেলে মায়ের আহর-অসুখের খোঁজ না নেয়, তার ওপর অভিশাপ এমনিতেই আসবে। মায়ের অভিশাপ দেয়ার দরকার নেই। এমন ছেলেকে ছেলে না বলাই ভালো। আমাদের দেশে মায়েরা ছেলেদেরকে যে পরিমাণ ভালবাসেন, সে ভালবাসা যদি মেয়ের জন্যে থাকতো, তাহলে তাদের জীবন আরও সুখের হতো, সুন্দর হতো। বাবা-মায়ের কাছে ছেলের সাত খুন মাফ। কিন্তু মেয়ের জন্যে তারা কন্যাদায়গ্রস্ত। ‘কন্যাদায়গ্রস্ত’ শব্দটি শুধু বাংলা ভাষাতে রয়েছে। অথচ নবীজী (স.) বলেন, যে ব্যক্তি তিনটি কন্যাকে লালন করলো, সে বেহেশতে যাওয়ার পথকে মুক্ত করলো। দু’টি বা একটি মেয়ের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। অর্থাৎ কন্যা বাবা-মায়ের জন্যে এসেট বা সম্পদ যদি তারা তাকে ঠিকভাবে লালন করেন, বড় করেন। কন্যাদায়গ্রস্ত শব্দটি বাংলা ভাষা থেকে বহিষ্কার করা উচিত। আর মেয়েকে কন্যাদায়গ্রস্ত বলার কারণে প্রকৃতির শাস্তি হচ্ছে বুড়ো বয়সে অধিকাংশ মা-বাবাকে সেই কন্যাই দেখাশোনা করে।

প্রশ্ন : ইসলাম ধর্মমতে নারী পুরুষের সমান মর্যাদা পেলেও সম্পত্তি বন্টনে কেন অসমতা থাকে?

উত্তর : ইসলাম ধর্মে সম্পত্তি বিভাজনে এ দৃষ্টিভঙ্গির কারণ হচ্ছে ইসলাম ধর্মমতে মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে এবং স্ত্রীকে ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ছেলের, মেয়ের নয়। এমনকি তার যদি কোনো সম্পদ না-ও থাকে, তবুও স্ত্রীর সম্পত্তি দিয়ে স্ত্রী বা পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে পারবেন না। অতএব পুরুষের যেহেতু পারিবারিক এবং সামাজিক দায়িত্ব বেশি, তাই সম্পত্তি বিভাজনের ক্ষেত্রে তাকে কিছুটা বেশি দেয়া হয়েছে নারীর চেয়ে। আর সম্পত্তির আরও কিছু ক্ষেত্রে মেয়েদের যে অধিকার রয়েছে পুরুষের তা নেই। যেমন, বাগদানের সময় বা বিয়ের সময় মেয়েরা যে উপহার পায় তার ওপর স্বামীর কোনো অধিকার নেই। স্ত্রীর আয়ে স্বামীর ভাগ নেই। এমনকি বিয়ের পরও স্ত্রী যে উপার্জন করেন, তার সবটাই তার। পরিবারে খরচ করার জন্যে স্বামী তাকে জোর করতে পারবেন না।

প্রশ্ন : বাবা-মা যদি মনে করেন, সন্তানদের কাছ থেকে তাদের শেখার কিছু নেই, তারাই সব জানেন এবং সন্তানদের কথা শুনতে অগ্রহী না হন, তাহলে কী করণীয়?

উত্তর : এক্ষেত্রে ব্যর্থতা সন্তানদের। সন্তান, বাবা-মাকে তারা যে ভাষায় বোঝেন সে ভাষায় বোঝাতে পারছেন না বলেই তারা বুঝছেন না। আপনি যদি শ্রদ্ধা করার মতো কাজ করেন তাহলে আপনার মা-বাবাও আপনাকে শ্রদ্ধা করবেন। এটাই বাস্তবতা। কিন্তু তার আগে আপনার নিজেকে সে পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। আর আপনি যেহেতু সত্য বলছেন, তাই আজ হোক,

কাল হোক আপনার কথা তারা শুনবেন।

প্রশ্ন : আমাদের সমাজে বিয়ের প্রস্তাব এলে মেয়েকে আগে দেখা হয়। অনেক সময় মেয়ে পক্ষ এতে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। এটা কি অবিদ্যা?

উত্তর : আগে পরে দেখা নিয়ে বিদ্যা-অবিদ্যার কিছু নেই। বিয়ের জন্যে কাউকে না কাউকে তো আগে দেখতে হবে। হয় মেয়েপক্ষ আগে ছেলেকে দেখবে, নয়তো ছেলেপক্ষ আগে মেয়েকে দেখবে। আর বিয়ের প্রস্তাব সাধারণভাবে ছেলেপক্ষ দেয় বলে তারা মেয়েকে আগে দেখতে যায় যা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। এতে বিদ্যা অবিদ্যার কিছু নেই।

প্রশ্ন : বিয়ের পর একটি ছেলে তার বাবা-মার সাথেই থাকছে। অথচ কনেকে তার বাবা-মা থেকে পৃথক থাকতে হয়। এটা কি ন্যায়সঙ্গত?

উত্তর : এ ক্ষেত্রে হয় ছেলেকে মেয়ের বাসায় থাকতে হবে, নয়তো মেয়েকে ছেলের বাসায় থাকতে হবে। মেয়ের বাসায় যদি ছেলে থাকে, তাহলে ছেলের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব মেয়েকে নিতে হবে। ছেলেকে তখন হতে হবে ঘর-জামাই। আমাদের সমাজে ছেলে মেয়েকে বিয়ে করছে তার ভরণ-পোষণের সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে। এজন্যে ছেলের বাড়িতে মেয়েকে যেতে হচ্ছে। উপজাতীয়দের মধ্যে আবার উল্টো নিয়ম। সেখানে বিয়ের পর ছেলেরা মেয়ের বাড়ি যায় কারণ ছেলের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব মেয়ের। অর্থাৎ যে সমাজে যে রেওয়াজ সেভাবেই যাওয়া-আসা হয়। আমাদের সমাজের মেয়েরাও যদি ছেলেদের দায়িত্ব নিতে চায় তাহলে দেখা যাবে বিয়ের পর ছেলেরা কাঁদতে কাঁদতে মা-বাবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, কাউকে তার আচরণ থেকে পৃথক করতে পারি না বলে ভুল করি। কিন্তু আচরণই তো ব্যক্তির প্রতিফলন। আচরণ দিয়েই কাউকে বিচার করা হয়। যেমন, কেউ মিথ্যা বললে আমরা তাকে ‘মিথ্যাবাদী’ বলি। কেউ চুরি করলে ‘চোর’ বলি। মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং বৈশিষ্ট্য সবকিছুই আচরণ দিয়ে নির্ধারিত হয়। আর আচরণ শেখার জন্যেই আমরা ফাউন্ডেশনের সাথে যুক্ত। তাহলে আচরণকে বাদ দিয়ে কীভাবে তাকে পুরস্কৃত করবো?

উত্তর : চুরি করলে ‘চোর’ হয়- এটা ঠিক। কিন্তু আমরা তাকে বদলাতে চাচ্ছি, ‘চোর’ রাখতে চাচ্ছি না। এখন সবসময় যদি তাকে আপনি বলেন, “এই চোর, এদিকে আয়” বা “এই মিথ্যাবাদী, এদিকে আয়”, তাহলে সে কি আপনার কথা শুনবে? আপনার বাসায় ছোট একটি বাচ্চা কোনো জিনিস লুকিয়ে ফেলেছে। আপনি যদি এ নিয়ে সবসময় তাকে খোঁটা দেন, তাকে কি কখনো ভালো করতে পারবেন? আমরা আচরণ শেখার জন্যে এবং শেখানোর জন্যে এখানে এসেছি। যেহেতু আমরা আচরণ শেখাতে চাই, তাই তার আচরণ দিয়ে আমরা প্রভাবিত হবো না।

একজন আপনাকে গালি দিলো বা আপনার সাথে মিথ্যা কথা বললো। আপনিও তাকে গালি দিয়ে বা মিথ্যা বলে প্রভাবিত করতে পারবেন না। এক শাশুড়ি তার ছেলে বৌয়ের নামে অন্যদের কাছে খুব নিন্দেমন্দ করতেন। কিন্তু ছেলে বৌ তা জেনেও শাশুড়ি এবং অন্যদের সাথে খুব স্বাভাবিক আচরণ করতেন। কখনো রাগারাগি বা ক্ষোভ প্রকাশ করেন নি। এমনকি নন্দদের নিন্দে করেছেন, নিজের মায়ের কাছে এ অভিযোগ শুনে নন্দরাও তার দিকে তেড়ে এসেছেন। তখনও তিনি স্বাভাবিক ছিলেন। তার আচরণই পরবর্তীতে শাশুড়িসহ অন্য সবার ধারণা বদলাতে সাহায্য করেছে এবং তাকে পরিণত করেছে সবার প্রিয় পাত্র। কাজেই কারো আচরণ বদলাতে চাইলে তাকে তার আচরণ থেকে আলাদা করতে হবে এবং সেই আচরণে প্রভাবিত হওয়া যাবে না।

ফাউন্ডেশন সংবাদ

রাজশাহী সেন্টার

জানাজা শিক্ষা ক্লাশ

গত ২ অক্টোবর, শনিবার সন্ধ্যা ৭টায় সেন্টারে জানাজা শিক্ষার একটি বিশেষ ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। স্বেচ্ছা দাফন উইং এর ১৯ জন প্রো-কোয়ান্টিয়ারের অংশগ্রহণে মুসলিম লাশ দাফনের নিয়ম এবং দোয়াসমূহ শেখানোর লক্ষ্যে এ ক্লাসটি পরিচালনা করেন মওলানা মো. আনোয়ার হোসেন।

দায়িত্বশীল ওয়ার্কশপ

গত ৩ অক্টোবর, রবিবার বিকেল সাড়ে ৩টায় সেন্টারে বিশেষ দায়িত্বশীল ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। ১০৪ জন দায়িত্বশীলের অংশগ্রহণে আড়াই ঘণ্টাব্যাপী এ ওয়ার্কশপে আত্মমূল্যায়ন পত্র সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তার ওপর মওলানা ছায়ীদুল হক-এর আলোচনার রেকর্ডকৃত অংশ শোনানো হয়। এছাড়া কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনের গুরুত্ব ও রমজান মাসের কার্যক্রমসমূহ দায়িত্বশীলদের সামনে তুলে ধরা হয়।

স্বেচ্ছা দাফন কার্যক্রম

সেন্টারের স্বেচ্ছা দাফন কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় গত সেপ্টেম্বর মাসে সাতজন মৃতের দাফনসহ এ পর্যন্ত মোট ১৮ জন মৃতের দাফন সম্পন্ন হয়েছে।

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ওয়ার্কশপ

গত ৮ অক্টোবর, শুক্রবার রাজশাহী বরেন্দ্র উন্নয়ন ফোরামের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত হয় ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ওয়ার্কশপের চতুর্থ পর্ব। ১৩৫ জন গ্রাজুয়েট ও অ্যাসোসিয়েটের উপস্থিতিতে দিনব্যাপী ওয়ার্কশপে ক্যারিয়ার গঠন, ক্যারিয়ার নির্বাচনের উপায়, জব মার্কেট পরিস্থিতি, ইন্টারভিউ এবং পছন্দমতো চাকরি পাওয়ার জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করার উপায় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন ক্যারিয়ার কনসালটেন্ট মোহাম্মদ রায়হান।

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ



চট্টগ্রাম সেন্টার

চট্টগ্রাম সেন্টারের দশ বছর পূর্তি

গত ২৭ আগস্ট, বিকেলে চট্টগ্রাম সেন্টারের ১০ বছর পূর্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় এক স্মৃতিচারণ সভা ও চা চক্র। প্রথম ব্যাচের সদস্যসহ অন্যান্যরা স্মৃতিচারণ ছাড়াও তাদের ব্যক্তিগত সাফল্য ও সঙ্গে থাকার সুফল সম্পর্কে আলোচনা করেন।

২০ জুলাই, ১৯৯৪ সালে যাত্রা শুরু পর চট্টগ্রাম সেন্টারের উদ্যোগে এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় ৩৮টি কোর্স এবং বর্তমানে মোট গ্রাজুয়েট সংখ্যা প্রায় দুই হাজার। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে আত্মউন্নয়ন ও হক্কুল ইবাদ কার্যক্রমে সেন্টার কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে।

কোয়ান্টাম ব্যায়াম কোর্সের সার্টিফিকেট বিতরণ

গত ১৩ অক্টোবর সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় কোয়ান্টাম ব্যায়াম পুরুষ বিভাগের ১৭ ও মহিলা বিভাগের ১৫ ব্যাচের সমাপনী ও সার্টিফিকেট বিতরণ অনুষ্ঠান। এতে পুরস্কার প্রদান, সার্টিফিকেট বিতরণ ও সমাপনী বক্তব্য রাখেন অর্গানাইজার মো. সাজ্জাদ হোসেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ব্যায়াম প্রশিক্ষক সৈয়দ আহসান হাবীব মুরাদ ও মিসেস কানিজ ফাতিমা।

সিলেট সেন্টার

ব্রাণ বিতরণ

গত ১১ অক্টোবর, সোমবার সেন্টারের উদ্যোগে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলায় বন্যা দুর্গতদের মাঝে ২০০০ পিস কাপড় বিতরণ করা হয়। সেন্টারের পরিচালক জনাব সিঁতাব আলীর নেতৃত্বে ৩ জন দায়িত্বশীল এবং সুনামগঞ্জ থেকে অধ্যক্ষ আব্দু মিয়াসহ ৪ জন কোয়ান্টায়ার মিলে ব্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

সুনামগঞ্জ সেলে মাটির ব্যাংক বিষয়ক বিশেষ ওয়ার্কশপ

গত ২৮ সেপ্টেম্বর, বুধবার বিকেল ৫টায় সুনামগঞ্জ সেলে মাটির ব্যাংক কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে দায়িত্বশীলদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ ওয়ার্কশপ।

১৬ জন দায়িত্বশীলের অংশগ্রহণে এ ওয়ার্কশপে সেলের পরিচালক সৈয়দ কাওসার আহমদ, সিলেট সেন্টারের নির্বাহী এবং মাটির ব্যাংক কার্যক্রমের পরিচালক আজিজুর রহমান খান ও প্রফেসর আব্দু মিয়া তাদের আলোচনায় মাটির ব্যাংক বিতরণের গুরুত্ব ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেন।

উত্তরা শাখায়

অ্যাসোসিয়েট ওয়ার্কশপ

গত ৮ অক্টোবর, উত্তরা শাখায় অনুষ্ঠিত হয় অ্যাসোসিয়েট ওয়ার্কশপ। এতে প্রশ্লোভের পর্বসহ শিথিলায়ন, মনছবি ও মেডিটেশনের গুরুত্ব এবং সম্ভবভাবে সৃষ্টির সেবার উপকারিতা বিষয়ে আলোচনা করা হয়। গ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার, অ্যাসোসিয়েট ও অতিথিসহ প্রায় ১৩৫ জন এ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন।



শেরপুর সেল উদ্বোধন করছেন বগুড়া সেলের আহ্বায়ক জনাব মাসফিকুর রহমান

শেরপুর সেলের উদ্বোধন

গত ১ অক্টোবর, শুক্রবার সকাল সাড়ে ৯টায় যৌথ মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন শেরপুর সেলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বগুড়া সেলের আহ্বায়ক জনাব মাসফিকুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ১৬ জন গ্রাজুয়েট ও অ্যাসোসিয়েট উপস্থিত ছিলেন।

বগুড়া ও শেরপুর সেল সফর

গত ৯ অক্টোবর, শনিবার ফাউন্ডেশনের আট সদস্য বিশিষ্ট বিশেষ দায়িত্বশীল টিম বগুড়া ও শেরপুর সেল সফর করেন। এই সফরকালে চট্টগ্রাম সেন্টারের অর্গানাইজার মো. সাজ্জাদ হোসেন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম এবং 'মেধা ও যোগ্যতার পরিপূর্ণ বিকাশে মেডিটেশনের ভূমিকা' সম্পর্কে আলোচনা করেন। বগুড়া সেলে প্রায় ৪০ জন এবং শেরপুর সেলে প্রায় ৩০ জন গ্রাজুয়েট ও অ্যাসোসিয়েট উপস্থিত ছিলেন।

যশোর সেলে কোয়ান্টাম ব্যায়ামের পরিচিতি সভা

গত ১৭ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার যশোর সেলে কোয়ান্টাম ব্যায়াম কার্যক্রমের পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেল পরিচালক খন্দকার সামসুজ্জামান সূজার উপস্থিতিতে ব্যায়ামের প্রশিক্ষক ইকবাল আল মাহমুদ কোয়ান্টাম ব্যায়ামের পরিচিতি এবং সুস্থতা ও মেডিটেশনের জন্যে ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

নারায়ণগঞ্জ সেলের উদ্যোগে স্বেচ্ছা দাফন কার্যক্রম শুরু

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন নারায়ণগঞ্জ সেল স্বেচ্ছা দাফন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। পরিচয়হীন মৃতদেহ বা দাফনে অক্ষম অভাবগ্রস্তের মৃতদেহ পূর্ণ ধর্মীয় মর্যাদায় দাফন বা সংকারের ব্যবস্থা গ্রহণ এ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য।

মিরপুর শাখার দায়িত্বশীল ওয়ার্কশপ

গত ৮ অক্টোবর, শুক্রবার মিরপুর শাখার নিয়মিত কার্যক্রমের পর অনুষ্ঠিত হয় শাখার দায়িত্বশীলদের অংশগ্রহণে এক বিশেষ দায়িত্বশীল ওয়ার্কশপ। এতে কেন্দ্রীয় বিভিন্ন কার্যক্রমে শাখার অবস্থানের মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যত করণীয় সম্পর্কে আলোচনা হয়।

মাসিক মুক্ত আলোচনায় আল্লামা আবুল কালাম আজাদ

মেডিটেশন নামাজে মনোযোগ বাড়ায় তার প্রমাণ আমি নিজেই পেয়েছি

“মেডিটেশন হচ্ছে বিজ্ঞান। মেডিটেশনের অনুশীলন নামাজে মনোযোগ ও ভূক্তিকে নিঃসন্দেহে বাড়িয়ে দেয় যার প্রমাণ আমি নিজেও পেয়েছি। কারণ মনকে প্রশান্ত করার এই বৈজ্ঞানিক পন্থা আয়ত্ত করে কেউ যখন নামাজে দাঁড়ান তখন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই নামাজের প্রতিটি অংশকে তিনি অনুভব করেন অনুভূতির ভিন্ন মাত্রায়।”

গত ৫ অক্টোবর, মঙ্গলবার কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে আয়োজিত মাসিক মুক্ত আলোচনায় প্রধান অতিথির ভাষণে একথা বলেন বিশিষ্ট আলেম ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাস্সেরে কোরআন আল্লামা আবুল কালাম আজাদ।

তিনি বলেন, প্রতিটি মানুষ ভালো বৈশিষ্ট্য নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। বেড়ে ওঠার পরিবেশ এবং সেই পরিবেশ থেকে সে কী শিখবে— তার এই স্বাধীন ইচ্ছাই তাকে ভালো বা মন্দ বানায়। পবিত্র কোরআন একদিকে মানুষের এই স্বাধীনতার স্বীকৃতি দিয়েছে, আরেক দিকে তাকে নিজে ভালো হতে এবং অন্যের ভালো করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। যারা মেডিটেশন চর্চা করেন, তারা এই অনুশীলনেই নিয়োজিত হন এবং নিজের প্রশান্তি ও সাফল্য লাভের পাশাপাশি তারা হয়ে ওঠেন অন্যের কল্যাণকামী ভালো মানুষ। তাই মেডিটেশনও হতে পারে ইবাদত যখন তা হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে।

কোরআন শোনা ও বোঝার গুরুত্ব

প্রসঙ্গে আলোচনায় তিনি বলেন, আল্লাহ তার পরিকল্পনা অনুযায়ী মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। দুনিয়ায় মানুষ যাতে নিরাপদে পথ চলতে পারে, ভালো-মন্দ বুঝতে পারে এজন্যে সৃষ্টা মানুষের মুক্তির জন্যে পবিত্র কোরআনে দিয়েছেন প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা। যারা এ নির্দেশনা মেনে চলবে ও তা সঠিকভাবে অনুসরণ করবে তারা জান্নাত লাভ করবে। তাদের কোনো ভয় কিংবা দুশ্চিন্তার কারণ থাকবে না।

ঈমানদারগণ যখন কোরআন শোনেন এবং জানেন তখন তাদের ঈমানের সমৃদ্ধি আসে। কিন্তু সমৃদ্ধি আসার জন্যে একটি শর্ত হচ্ছে কোরআনের কথা তাকে বুঝতে হবে।

তাই শুধু পড়লেই হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনে কি বলা হয়েছে তা বোঝা না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের কোরআনের জ্ঞান হয়েছে তা বলা যাবে না। আল্লাহ কোরআন নাযিল করেছেন মানার জন্যে। যদি মানতে হয় তাহলে কোরআন জানতে হবে। আর জানতে হলে তা বুঝতে হবে। কোরআন জানা ও বোঝার মাধ্যমেই কেবল মানার আশ্রয় সৃষ্টি হতে পারে।

আল্লামা আবুল কালাম আজাদ আরও বলেন, কোরআন শরীফকে অত্যন্ত পবিত্র গ্রন্থ মনে করে একে মুসলমানরা ছাড়া অন্য কেউ বা মুসলমানও যখন-তখন স্পর্শ করতে পারবে না, পড়তে পারবে না ইত্যাদি ধারণা পোষণ করে আমরা কোরআনকে প্রকারান্তরে দূরেই ঠেলে দিয়েছি। কেউ



মাসিক মুক্ত আলোচনায় প্রধান অতিথির ভাষণ দিচ্ছেন বিশিষ্ট আলেম ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাস্সেরে কোরআন আল্লামা আবুল কালাম আজাদ

বা আবার মনে করছি তাবিজের কাজে বা রোগ সারানোর কাজে বা তেলাওয়াত করে এক হরফে দশ নেকী হাসিলের মতো ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যেই বোধ হয় কোরআন। অথচ পবিত্র কোরআনেই বলা হয়েছে, কোরআন কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর নয়, সমগ্র মানবজাতির জন্যে সম্পূর্ণ জীবন বিধান। কিন্তু সম্মানের স্থূল ধারণা পোষণ করে কোরআনের এই ব্যাপকতাকে বুঝতে এবং এ থেকে উপকার পেতে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। আর এতে সার্থক হচ্ছে শয়তানের উদ্দেশ্যই। কারণ শয়তান ততক্ষণ পর্যন্তই কোনো মানুষকে বন্ধু করে রাখতে পারে যতক্ষণ সে মানুষ কোরআন থেকে দূরে থাকে। কোরআন জানলে শয়তানের পক্ষে আর তার ওপর কর্তৃত্ব করা সম্ভব নয়।

কোরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লামা আজাদ বলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ প্রতিটি প্রশ্নের জবাব রয়েছে কোরআনে। মানুষ

যা এখন জানতে পারছে কোরআনে তা চৌদশত বছর আগে বর্ণনা করা হয়েছে। কোরআনের মোজেনা হচ্ছে মানুষের যত অশান্তি থাকুক না কেন অর্থ বুঝে কোরআন পড়লে অশান্তি দূর হবে। তবে যে যত মনোযোগী হবে সে তত ভালো বুঝতে পারবে। কোরআনের সাথে যদি কেউ সম্পর্ক স্থাপন করে তাহলে তা তাকে জান্নাতে না পৌঁছানো পর্যন্ত তার থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না।

তাই কোরআনকে যারা জানতে চাই, বুঝতে চাই তারা যদি এমন একটি রুটিন করে নিই যে, প্রতিদিন কোরআনের অন্তত ১টি বা ২টি আয়াত ও ১টি হাদীস অর্থসহ জেনে তারপর ঘুমাবো, তাহলে এক বছরের মধ্যেই আমরা দেখবো বিষয়টি আমাদের জন্যে কত সহজসাধ্য। পারলৌকিক মুক্তির সাথে সাথে পার্থিব কল্যাণ নিশ্চিত করবে এই চর্চা।

□ রাবিয়া নাজরীন

দেশব্যাপী কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনে বিপুল উপস্থিতি

ধ্যানের স্তরে কোরআন তেলাওয়াত ও তরজমা শোনা এবং তা অনুধাবন করার মাধ্যমে রমজান মাসে পবিত্র কোরআন খতম প্রক্রিয়া এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গত কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় এ বছরও ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনের ৬ষ্ঠ আয়োজন। ঢাকার মিরপুর ও উত্তরা শাখাসহ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও লামা সেন্টারে আয়োজিত এ কার্যক্রমে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশ নেন।

কেন্দ্রীয় ভাবে ঢাকার কাকরাইলস্থ মেডিটেশন হলে দুই ব্যাচে অনুষ্ঠিত হয় এ কোয়ান্টায়ন। ১ম ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয় ২২ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর। ২য় ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয় ২৯ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর। উভয় ব্যাচে অংশগ্রহণকারী ছিলেন যথাক্রমে ১৬০ ও ১৪০ জন।

গুরুজী শহীদ আল বোখারীর পরিচালনায় দুই ব্যাচের সম্মিলিত আখেরী দোয়া অনুষ্ঠিত হবে ৫ নভেম্বর। সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত আখেরী দোয়ায় অংশ নেবেন পাঁচ শতাধিক সদস্য।

২৩ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর রাজশাহী সেন্টারে কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনের ১টি ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। আখেরী দোয়া অনুষ্ঠিত হয় ৩০ অক্টোবর। দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা ছায়ীদুল হক।

২০ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর সিলেট সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনের ১ম ব্যাচ। ২য় ব্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ৩০ অক্টোবর থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত।

দুই ব্যাচের সম্মিলিত আখেরী দোয়া অনুষ্ঠিত হবে ৭ নভেম্বর। সিলেট সেন্টারের পরিচালক জনাব সিতিব আলী দোয়া পরিচালনা করবেন।

২৩ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর চট্টগ্রাম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়

কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনের ১টি ব্যাচ। আখেরী দোয়া অনুষ্ঠিত হয় ২৯ অক্টোবর। দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা মাজেদুর রহমান।

লামা সেন্টারে ২২ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর ১টি ব্যাচে সম্পন্ন হয় কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন। আখেরী দোয়া অনুষ্ঠিত হয় ২৭ অক্টোবর। দোয়া পরিচালনা করেন মওলানা ছায়ীদুল হক।

এছাড়াও ঢাকাস্থ মিরপুর ও উত্তরা শাখায় দুই ব্যাচে কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন অনুষ্ঠিত হয়। ১ম ব্যাচ অনুষ্ঠিত হয় ২২ অক্টোবর থেকে ২৮ অক্টোবর এবং ২য় ব্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ২৯ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর। উভয় শাখার আখেরী দোয়া কেন্দ্রীয় ভাবে সম্পন্ন হবে ৫ নভেম্বর। □ নাজমুন নাহার

নীরব ও গোপন দান সূক্ষীর রহমত আরো। তাই প্রশান্তি প্রাচুর্য ও সমস্যামুক্তির জন্যে সব সময় নীরবে-নিভুতে দান করুন।

কোয়ান্টাম শিশুসদনে আকিকা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

গত ২৬ নভেম্বর, শুক্রবার ফাউন্ডেশনের রাজশাহী সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় কোয়ান্টাম শিশুসদনের প্রথম ৫টি শিশুর আকিকা ও দোয়া মাহফিল। এ অনুষ্ঠানে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেটের শতাধিক দায়িত্বশীল ও প্রো-কোয়ান্টিয়ারসহ দুপুরের আপ্যায়ন পর্বে অংশ নেন রাজশাহীর কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট ও স্থানীয় অ্যাসোসিয়েটসহ প্রায় ২৭০০ জন অতিথি। রাজশাহী সেন্টারের এ আয়োজনটি ফাউন্ডেশনের ইতিহাসেও এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় আয়োজন।

২০০৪ সালের মার্চ মাসে ভাগ্যবান প্রথম শিশুটির আগমনের মধ্য দিয়ে হিন্দুমূল ও পরিত্যক্ত নবজাতকদের আশ্রয় ও লালনের জন্যে প্রতিষ্ঠিত এ শিশুসদনের যাত্রা শুরু হয়। এরপর গত ৮ মাসে এসেছে আরও ৪টি শিশু। সবগুলো শিশুই মেয়ে। সবচেয়ে বড় শিশুটির নাম নাদিরা তাহসীন। বয়স ৯ মাস। তারপর যমজ দুবোন, নাম নাফিসা তাসনীম ও নাবিলা তাসনীম। বয়স ৬ মাস ১৫ দিন। তারপর নাজিয়া তানজীম। বয়স ৩ মাস। সবচেয়ে ছোট শিশুটির নাম লাবিবা। বয়স ২ মাস।

আকিকা অনুষ্ঠানের জন্যে গত কয়েকমাস ধরে রাজশাহী সেন্টারের দায়িত্বশীল ও প্রো-কোয়ান্টিয়ারদের মধ্যে চলে ব্যাপক প্রস্তুতি। এ উপলক্ষে গুরুজী-মাজী ও পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমান রাজশাহী আগমন করেন।

২৬ নভেম্বর সকালে গুরুজীর পরিচালনায় বিশেষ দোয়া অনুষ্ঠানের পর আপ্যায়ন পর্ব শুরু হয়। এজন্যে রাজশাহী সেন্টারের নিজস্ব কম্পাউন্ড ছাড়াও সেন্টার ও প্রতিবেশীদের বাড়ির ছাদ ও জমিতে নির্মিত হয় ৫টি স্টেশন। এ ব্যাপারে এলাকাবাসী ও প্রতিবেশীদের সার্বিক সহযোগিতার জন্যে ফাউন্ডেশন আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে ডা. খাজা নুরুল্লাহী এবং তার স্ত্রী মিসেস নুরুল্লাহার বেগম, জনাব আতিকুর রহমান, জনাব শামসুর রহমান, জনাব টুটুল, জনাব বেনু ও মিসেস আমোনা খাতুনের নাম উল্লেখ্য।

শিক্ষার্থী কোর্সের স্কুল পর্যায়ের ব্যাচ শুরু ২ জানুয়ারী

ক্লাসে প্রথম ও জীবনে প্রথম হওয়ার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশনের বিশেষ শিক্ষার্থী কোর্সের পায়োনিয়ার ব্যাচের সফল সমাপ্তির পরে প্রথম ব্যাচের ক্লাস পূর্ণোদ্যমে চলছে। স্কুল পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রী কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েটদের জন্যে ২য় ব্যাচের ক্লাস শুরু হবে ২ জানুয়ারী, ২০০৫ থেকে।



কনিকা মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রফেসর ড. এম. শমশের আলী 'আজ থেকে এ তিনটি কনিকা আমার আজীবনের সঙ্গী'



কনিকা মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি ড. শমশের আলী

এবারের পবিত্র রমজানে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের প্রকাশনার তালিকায় সবচেয়ে চমকপ্রদ সংযোজন হলো কোরআন কনিকা, হাদীস কনিকা ও সর্বোত্তম আদর্শ কনিকা। ১ নভেম্বর বাদ আসর ফাউন্ডেশনের শান্তিনগরস্থ সেমিনার হলে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কনিকাসমূহের মোড়ক উন্মোচন করেন প্রধান অতিথি দেশের নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, ইসলামী চিন্তাবিদ ও টিভি ব্যক্তিত্ব প্রফেসর ড. এম. শমশের আলী। মোড়ক উন্মোচনের পর ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তিনটি কনিকার এক সেট তার হাতে তুলে দিলে তিনি মন্তব্য করেন, "আজ থেকে এ তিনটি কনিকা আমারও আজীবনের সঙ্গী।"

দীর্ঘ ২৩ বছরে নাজিল হওয়া মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআনে রয়েছে মানবজাতির জন্যে মহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে অসংখ্য দিক-নির্দেশনা। কোরআনের এ

নির্দেশনাগুলো জানা, বোঝা এবং মানার জন্যে প্রয়োজন দৈনন্দিন জীবনে এ বাণীর চর্চা। আর এ চর্চাকে সহজ করতেই সংকলিত হয়েছে কোরআন কনিকা, যাতে পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন সূরার ৬৭টি আয়াতের মর্মবাণীকে অত্যন্ত সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে।

হাদীস কনিকায় রয়েছে রাসূলে পাক (স.)-এর ৬৩টি হাদীসের সংকলন। সহজবোধ্য ভাষা এবং জীবনমুখী বিষয়বস্তুর কারণে যা খুবই আকর্ষণীয় পাঠ্য একটি আইটেম।

সর্বোত্তম আদর্শ কনিকায় রয়েছে দৈনন্দিন জীবনের প্রাসঙ্গিক ৫৭টি

হাদীসের সংকলন। চমৎকার আকর্ষণীয় চাররঙা প্রচ্ছদের লেমিনেটেড এ কনিকাগুলো সবসময় নিজের সাথে রাখার পাশাপাশি অন্যদের উপহার দেয়ার জন্যে চমৎকার গিফট আইটেম হিসেবে পাওয়া যাচ্ছে নামমাত্র মূল্যে।



কনিকার মোড়ক উন্মোচন করছেন প্রফেসর ড. শমশের আলী

লামায় এতেকাফ

রমজান মাসে ফাউন্ডেশন আয়োজিত আত্মউন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মধ্যে লামায় পুরুষদের এতেকাফ অন্যতম। ২০০২ সালে লামাস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন রিসর্টে প্রথমবারের মতো এতেকাফ অনুষ্ঠিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ৩য় বারের মতো লামায় এতেকাফ অনুষ্ঠিত হয় গত ৫ নভেম্বর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত।

মওলানা ছায়ীদুল হকের নেতৃত্বে ৩৭ জনের একটি টীম লামায় এতেকাফে অংশগ্রহণ করেন।

অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ঢাকা থেকে ২১ জন, চট্টগ্রামের ৬ জন সিলেটের ৪ জন, রাজশাহীর ৩ জন, লামা সেন্টারের ২ জন ও খুলনার ১ জন ছিলেন।

রমজানে মহিলাদের ১০০ ঘণ্টাব্যাপী ছয় দুয়ারি কোয়ান্টায়ন

এবারের রমজানে ফাউন্ডেশনে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হয় মহিলাদের ১০০ ঘণ্টাব্যাপী ছয় দুয়ারি কোয়ান্টায়ন। ৬ নভেম্বর রাত থেকে ১১ নভেম্বর ফজর পর্যন্ত শান্তিনগরস্থ সেমিনার হলে একটানা চলে ৪ দিন ৫ রাতের এ প্রোগ্রাম। এতে অংশ নেন ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও লামা থেকে মোট ২৯ জন মহিলা।

বৈষয়িক ও আত্মিক উন্নতির প্রথম সারিতে পৌছানোর যোগ্যতা নারীদের রয়েছে- এ আত্মবিশ্বাস অর্জন এবং এ পথের অন্তরায়গুলোকে শনাক্ত করার জন্যে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক আত্ম-পর্যালোচনা এবং ভালো ও দক্ষ মানুষ হওয়ার গুণাবলি অর্জনের প্রক্রিয়া বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয় ১০০ ঘণ্টার এ প্রোগ্রামে।

রিজুজিনেশন কোর্সের স্থান পরিবর্তন

সর্বশক্তি সকলের সদয় অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, অনিবার্য কারণে ১৬ ও ১৭ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিতব্য রিজুজিনেশন কোর্স ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটের পরিবর্তে নিচের ঠিকানায় অনুষ্ঠিত হবে:

বি.সি.আই.সি মিলনায়তন

৩০-৩১ দিলকুশা, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।

ডিসেম্বর-জানুয়ারী মাসের কর্মসূচি

ঢাকায়
পরিচিতি সভা :
১৯৪ ব্যাচ : ২৯ ডিসেম্বর, বুধবার, '০৪
কোর্স :
১৯৪ ব্যাচ : ৭, ৮, ৯ ও ১০ জানুয়ারী, '০৫
বিশেষ শিক্ষার্থী ওয়ার্কশপ :
৩১ ডিসেম্বর, শুক্রবার, '০৪
বিশেষ শিক্ষার্থী কোর্স (স্কুল লেভেল) :
২য় ব্যাচ শিডিউল ক্লাস : ২, ৩, ৫, ৭, ৮, ৯, ১২, ১৪, ১৫, ১৬ ও ১৭ জানুয়ারী '০৫

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক। বর্তমানে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক। দেশে ও বিদেশে তার প্রকাশিত বই ২৫টি এবং প্রবন্ধ ৮৬টি। গবেষণায় কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে ড. হোসেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন পুরস্কারসহ আমেরিকান বায়োগ্রাফিক্যাল ইনস্টিটিউট কর্তৃক ১৯৯৭ ও ২০০১-এ ‘ম্যান অব দি ইয়ার’ সম্মানে ভূষিত হন। ১৯৯৩ সালে মেডিটেশন ক্যাসেট প্রকাশনা উৎসবে সম্মানিত বিশেষ অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত ড. হোসেন সূচনালগ্ন থেকেই ফাউন্ডেশনের একজন আন্তরিক শুভানুধ্যায়ী।

কোয়ান্টাম মেথড মানুষকে যথার্থ মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেয়

ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন



১৯৪৭ সালের ৫ নভেম্বর। ঘোর কৃষ্ণপক্ষের রাত। বগুড়ার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করলো একটি শিশু। জন্মের সাথে সাথে পারিবারিক বৈরীপক্ষ প্রচার করে দিলো ঘোর অমানিশায় জন্ম নেয়া এই শিশু ভবিষ্যতে খুব বড় রকমের সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর পেরিয়ে গেছে বহু বছর। সেদিনের সেই শিশু বৈরী পরিবেশ-পরিস্থিতি ও মানুষের মোকাবেলা করে আজ জীবনে প্রতিষ্ঠিতদের একজন। দেশের সীমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও তার খ্যাতির ব্যাপ্তি। শৈশবের সেই তথাকথিত অপয়া ছেলেটিই আজ প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ, বাংলা একাডেমির সাবেক মহাপরিচালক এবং বর্তমানে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন।

দাদা-নানার বাড়িতে প্রথম শৈশবে যে জিনিসটির সাথে পরিচয় হয়েছিল তা হলো বই। অন্যদিকে নাটক ও গান-বাজনা পাগল বাবার সুবাদে সংস্কৃতির আর একটি দিকও দেখা হয়েছিলো। কিন্তু পড়ুয়া এবং রাশভারী মায়ের কঠোর অনুশাসনে বইকে তিনি তার সঙ্গী করে নিয়েছিলেন ছোটবেলাতেই। ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালেই বগুড়ার সবচেয়ে প্রাচীন উডবার্ন লাইব্রেরীর সর্বকনিষ্ঠ সদস্য হয়েছিলেন তিনি। তাই অকপটে তিনি ঋণ স্বীকার করেন সেই লাইব্রেরী এবং মায়ের কাছে। কেননা লাইব্রেরী থেকে মায়ের জন্যে বই আনতে আনতে ১৯৬৫ সালে বগুড়া ছেড়ে আসার সময়ে তিনি পড়তে পারেন এমন সব বই পড়া হয়ে গিয়েছিলো তার। তার ভাষায়, “বৈষয়িক দিক থেকে না হলেও জ্ঞানের দিক থেকে সামান্য যা সঞ্চয় করেছি, সেজন্যে এই লাইব্রেরীর কাছে এবং একই সাথে আমার মায়ের কাছে অপরিসীম ঋণী।”

মাকে প্রচণ্ড ভয় পেতেন তিনি। তারপর মামাদের। কারণ একেক মামা তাকে একেকদিকে পারদর্শী করে তুলেছেন। কেউ শিখিয়েছেন বাংলা। কেউ ইংরেজী, কেউ অংক। মামাদের হাত ধরেই তিনি স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলেন বগুড়া জেলা স্কুলে এবং ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরাসরি তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন। সেই থেকে শুরু। শিক্ষাজীবনের প্রতিটি ধাপ তিনি পেরিয়েছেন অসাধারণ কৃতিত্বের সাথে। বগুড়া জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক, ইন্টারমিডিয়েট শেষ করে ১৯৬৫-তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হলেন। অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার সাতদিন আগে রাজনৈতিক মামলার আসামী হিসেবে গ্রেফতার হয়ে গেলেন আইয়ুব খানের আমলে। জামিন নিয়ে এসে পরীক্ষা দিতে হলো। তারপরও রেকর্ড নম্বর নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হলেন। মাস্টার্সেও প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করলেন।

১৯৭০-এ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন শিক্ষক হিসেবে। কীভাবে তিনি এতদূর এলেন? কোন্ সে শক্তি যা তাকে অনুপ্রেরণা যোগায়? ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন বলেন, “আমি জীবনে যখনই কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি তখনই সেটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছি এবং লড়ে পথ করে নিতে চেষ্টা করেছি। যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স পড়ার সময় প্রথম বর্ষে আমি তৃতীয় হলাম। কারণ ধীর হাতের লেখার কারণে পুরো উত্তর করতে পারি নি। এরপর আমি আমার ডায়েরিতে লিখলাম, ফাইনাল পরীক্ষায় আমি প্রথম হবোই। সেভাবেই প্রস্তুতি নিলাম। নোট ছোট করলাম না। হাতের লেখাকে ক্রমাগত দ্রুতগতির করলাম। অবশেষে অনার্স পরীক্ষার মাত্র ৭ দিন আগে ঐ দুর্ঘটনার পরও রেকর্ড মার্কস পেয়ে ফাস্ট হলাম। এভাবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমার সহজাত লড়াই মনোভাবই হয়তো আমাকে শক্তি যুগিয়েছে। সেই সাথে আছে স্রষ্টার প্রতি নির্ভরতার শক্তি।” এ প্রসঙ্গে ড. হোসেন একটি ঘটনা বলেন, ২০০০ সালে যখন আমেরিকা থেকে ফিরছিলেন, এয়ারপোর্টে সদ্যকেনা স্যুটকেসের তালা কিছুতেই খুলছিলো না। এসি চলছে, স্যুট পরা। তবুও আসন্ন সংকটের কথা ভেবে ঘামছেন আর মনে মনে আয়াতুল কুরসী পড়ছেন। যখন তার স্যুটকেস চেক করার পালা এলো— স্রষ্টার নাম নিয়ে তালা টিপে ধরলেন; তালা খুলে গেল। বেঁচে গেলেন অনাহত বিড়ম্বনার হাত থেকে।

আরেকবার এমন হলো, একদিনের মধ্যে ২০০০ পাউন্ড জমা দিয়ে ভিসা এক্সটেন্ড না করানো গেলে লন্ডন ছেড়ে আসতে হবে পড়াশোনা শেষ না করেই। কিন্তু সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের কাছে আছে মাত্র ১৫০ পাউন্ডের মতো। তিনি প্রস্তুতি নিচ্ছেন দেশে ফেরত আসার। সে মুহূর্তে সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে তার এক বন্ধু নিজে এসে অর্থের যোগান দিলেন। এরকম অসংখ্য ঘটনায় তিনি বিশ্বাস নির্মাণ করেছেন যে, স্রষ্টা আছেন এবং তিনি সাহায্য করেন প্রতি পদে। স্রষ্টা আছেন অপরিসীম ইতিবাচকতায়। তাই ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের অভিধানে নেতিবাচক কোনো কথা নেই।

১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বাংলা ভাষায় ১ম মেডিটেশন ক্যাসেট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সম্মানিত বিশেষ অতিথির পদ অলংকৃত করেন। ফাউন্ডেশনকে সমর্থন যোগানোর পেছনে তার এ ভূমিকাকে তিনি এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, কোয়ান্টাম মেথডের উদ্ভাবক ও প্রশিক্ষক গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজ্ঞাতকের সাথে আমার পরিচয় ছিলো। তার কাজটির গুরুত্ব এবং কল্যাণকর দিক সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ ছিলাম। মানসিক স্বস্তি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা মেডিটেশন দিয়ে থাকে। কোয়ান্টাম মেথড মানুষকে যথার্থ মানুষ হওয়ার শিক্ষা দেয়; দেয় বেঁচে থাকার স্বস্তি। অস্থির এই সময়ে সবাই যখন নিজের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত তখন এই মহতী উদ্যোগ সত্যিই শুভ কামনার দাবিদার। ড. হোসেন ১০ বছরের ইনসমনিয়া থেকে নিজে নিজেই আত্মবিশ্বাসের মাধ্যমে মুক্তি পেয়েছেন। তাই তিনি মনে করেন— মানুষ তার মনের ক্ষমতা অর্থাৎ আত্মবিশ্বাস কাজে লাগিয়ে যে কোনো কিছু করতে পারে। কোয়ান্টাম মেথড এ আত্মবিশ্বাস জন্মানোর কাজটি করে থাকে।

কমনওয়েলথ স্কলারশীপ নিয়ে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনিয়র এমএস এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট এবং আমেরিকার ৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট ডক্টরেট করেছেন এই বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ। ইতিহাসের আলোকে তিনি বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে যে, একজন ভালো মানুষ, একজন যোগ্য নেতার অভাবেই পিছিয়ে আছে অপরিমেয় সম্ভাবনার এ দেশ। আজ আমরা যে গুটি গুটি পায়ে হাঁটছি, হাঁচট খাচ্ছি, সব দূর হয়ে যাবে একজন নেতার আগমনে এবং ইতিহাস সাক্ষী সেই নেতা আসবেন। তবে স্বাসরঞ্জিকর, হতাশাব্যঞ্জক এই দুঃসময়কে মোকাবেলার অঙ্গীকার নিজের ভেতরে থাকতে হবে। নেতিবাচকতার বীজ উপড়ে ফেলতে হবে। এই ইতিবাচকতা এবং আশাবাদ ড. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন নিজের জীবনে লালন করেন পুরো মাত্রায়। সেজন্যেই শত হতাশার মুখেও নির্দিধায় বলতে পারেন, বেশ ভালো আছি এবং আগামীতে আরও ভালো থাকবো। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক থাকার সময় একুশে বই মেলাকে সুশৃঙ্খলভাবে অনুষ্ঠিত করার জন্যে এককভাবে লড়াই করতে গিয়েও দেখিয়েছেন এই অদম্য মনোবল।

একটি মাত্র ছেলে। পুত্রবধু এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষিকা স্ত্রীকে নিয়ে পরিতৃপ্ত এবং আজন্ম সফল এ মানুষটি বিশ্বাস করেন আমাদের হৃদয়ে দিনবদলের স্বপ্নকে ধারণ করতে হবে। কারণ পৃথিবীর ইতিহাসে যত মানুষ পরিস্থিতির রদবদল ঘটিয়েছেন তারা সবাই ছিলেন স্বাণ্টিক। স্বপ্ন না দেখলে কাউকে এগিয়ে নেয়া যায় না। তাই ২০২৫ সালের মানবিক মহাসমাজের স্বপ্নের সাথে তিনি একাত্মতা প্রকাশ করেন। এদেশের হাজার বছরের ইতিহাস তাই সাক্ষ্য দেয় আমরা অপার সম্ভাবনাময়— কাজ শুধু স্বপ্নকে সামনে রেখে এগিয়ে যাওয়া আর বিশ্বাস করা যে, নেতা অবশ্যই আসবেন। নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের পুনর্জাগরণের যুগে আমরা প্রবেশ করবোই।

□ সাক্ষাৎকার গ্রহণ : শম্পা রায় ও রাবিয়া নাজরীন

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আসসালামু আলাইকুম।
গত বছরের কথা।
তখনও কোয়ান্টাম
থ্রাজুয়েশন কোর্স করি
নি। মাস্টার্স পরীক্ষার
মাত্র তিন মাস বাকি।
অথচ পড়াশোনায়
একটুও মনোযোগ
নেই। ভালো রেজাল্টের
প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি। এমনি অবস্থায়
একদিন এক ছোট ভাইয়ের কাছ থেকে পাওয়া
মনছবি ক্যাসেটটি আমি শুনি। যা আমাকে ভালো
রেজাল্ট করার সাহস ও উৎসাহ যোগায়। বিশ্বাসের
সাথে আত্মনিমগ্ন হয়ে আমি পড়াশোনা শুরু করি।
এভাবে ভালো রেজাল্টের জন্যে নিয়মিত মনছবি ও
পড়াশোনার মাধ্যমে কোনোরকম দৃষ্টিভ্রান্তি ছাড়াই
আমি পরীক্ষা দেই এবং ফার্স্ট ক্লাস অর্জন করি।
এমনকি এই মনছবির কারণে এ বছর কোর্স
করতেও সক্ষম হয়েছি।



গুরুজী, দোয়া করবেন যেন এই ভালো রেজাল্ট
দিয়ে দেশের জন্যে কাজ করতে পারি। ইতি—

আপনার স্নেহের
জোহরা খাতুন
১৮৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট

গুরুজীকে লেখা চিঠি

শ্রদ্ধেয় মহাজাতক,

আসসালামু আলাইকুম। আমি সম্প্রতি আপনার
লেখা ‘কোয়ান্টাম মেথড’ বইটি সংগ্রহ করেছি।
বইটি নিয়মিত অধ্যয়ন করে আমি খুব সহজেই
শিখিলায়ন রপ্ত করতে পেরেছি। দীর্ঘদিনের প্রচণ্ড
মাথা ব্যথার কষ্ট দূর করার জন্যে আমি শিখিলায়নে
নিয়মিত অটোসাজেশন দিতে থাকি। ফলে অবাক
হয়ে লক্ষ্য করলাম কিছুদিনের মধ্যেই আমার মাথা
ব্যথা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেছে। এজন্যে আমি
আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি এবং আপনাকে
আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বিনীত—

ইমরান খসরু
কোয়ান্টাম অ্যাসোসিয়েট
সোনাডাঙ্গা, খুলনা

শ্রদ্ধেয় গুরুজী,
আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আল্লাহর
রহমতে মা-জী ও কোয়ান্টাম পরিবারের সকল
সদস্যসহ ভালো আছেন। গুরুজী, আমি জাপানের
ফুকাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি করার জন্যে
মনবুশো স্কলারশীপ পেয়েছি। অক্টোবরের ১
তারিখে আমার ফ্লাইট।

গুরুজী, দেশে থাকাকালীন আমি নিয়মিত
মেডিটেশন ও কোয়ান্টামের প্রতিটি প্রোগ্রামে
আন্তরিকতার সাথে অংশগ্রহণ করেছি। জাপানে
গিয়েও যেন নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা ও মানবতার
কল্যাণে কাজ করতে এবং সুস্থতার সাথে
সঠিকভাবে পি.এইচ.ডি সম্পন্ন করতে পারি
সেজন্যে আমি আপনার কাছে দোয়া চাচ্ছি।

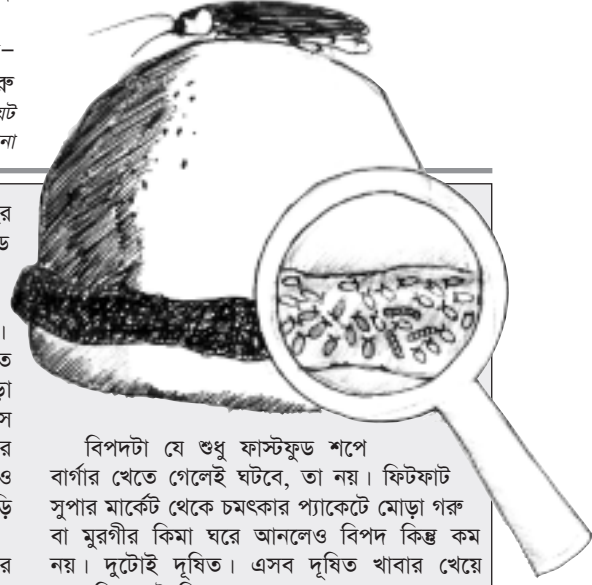
ইতি—

আপনার স্নেহধন্য

মোঃ আব্দুল মতিন

প্রভাষক, রসায়ন বিভাগ

খুলনা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়



প্লিজ, বার্গার খাবেন না

হাসান ফেরদৌস

প্রতিদিন মজা করে বার্গার বা মাংসের কিমা দিয়ে
তৈরি মজাদার কোনো ফাস্টফুড খাচ্ছেন। আর এর
সাথে গবাদি পশুর কিছু বিষ্ঠাও আপনি খেয়ে
ফেলছেন। অবাক হচ্ছেন? তাহলে জেনে নিন নিচের
কিছু তথ্য।

একটি বিফ বার্গারে যে মাংসের কিমা থাকে, তা
কমপক্ষে এক ডজন গরু এবং কখনো কখনো
শখানেক গরুর মেশানো মাংস থেকে বানানো।
এসব গরু একাধিক দেশ থেকে সংগৃহীত। এই
কিমার সামান্য কণামাত্রও যদি ই-কলি জীবাণু দ্বারা
দূষিত হয় তাহলে আপনি অসুস্থ তো হবেনই। তা
আপনার মৃত্যুরও কারণ হতে পারে।

যে গবাদি পশুর মাংস থেকে কিমা বানানো
হচ্ছে, তারা কী খায় জানেন? ইউরোপ, আমেরিকাতে
গবাদি পশু মাত্রই অন্য মৃত পশুর (যেমন— শূকর,
কুকুর ও বেড়াল) প্রক্রিয়াজাত বর্জ্য ও অন্যান্য
পশুভিত্তিক উপদ্রব্য (বাই-প্রডাক্ট) খেয়ে বাঁচে।
এছাড়া এদের করাতগুঁড়ো ও পুরনো কাগজের মণ্ডও
খেতে দেয়া হয়। ১৯৯৭ সালের আগ পর্যন্তও
এদেশে মৃত গবাদি পশু খেতে দেয়া হতো
নিয়মিতভাবে। বৃটেনে একারণে ‘ম্যাড কাউ ডিজিজ’
মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ার পর থেকে পশুখাদ্য
হিসেবে মৃত গবাদি খাওয়ানো নিষিদ্ধ হয়।
তারপরও জেনে রাখুন, এ দেশের প্রায় প্রতিটি
প্রধান কসাইখানায় যে গবাদি পশু দৈনিক জবাই
করা হচ্ছে, তার অনেকগুলোই হাম ও ফিতাকৃমি
রোগে আক্রান্ত। যে বিশাল মিশ্রণযন্ত্রে ফেল
মাংস পেষণ করা হচ্ছে, তাতে হরহামেশাই মাংসের
সঙ্গে পোকামাকড়, আবর্জনা, মানুষের ঘাম এবং
কখনো কখনো বমি গুলে একসঙ্গে প্যাটি হয়ে
বেরিয়ে আসছে।

সম্প্রতি সাংবাদিক এরিক শ্রুসার তিন বছর
একটানা গবেষণা চালিয়ে আমেরিকার ফাস্টফুড
সাম্রাজ্যের ওপর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ লিখেছেন,
নাম ‘ফাস্টফুড নেশান’। তাতে তাবৎ সূত্রসহ
এসব তথ্য সবিস্তারে তুলে ধরা হয়েছে।
ডজনখানেক কসাইখানা ঘুরে ঘুরে শ্রুসারের অভিমত
হলো— গবাদি পশু জবাইয়ের পর তার চামড়া
ছাড়ানো হয় যন্ত্র দিয়ে। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই সে
চামড়া নিখুঁতভাবে ছাড়ানো হয় না বলে কিমার
জন্যে প্রস্তুত মাংসের ভেতর চামড়া, কাদামাটি ও
বিষ্ঠা নিয়মিতভাবে ঢুকে পড়ে। পেট ও নাড়িভুড়ি
পরীক্ষার করা হয় হাত দিয়ে।

কিন্তু যারা কসাইখানায় কাজ করে তাদের
অধিকাংশই অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত অতি নিম্ন
বেতনভোগী ইমিগ্র্যান্ট। পরীক্ষার-পরিচ্ছন্নতার
বালাই তাদের অধিকাংশেরই নেই। হাত দিয়ে
ছাড়তে গিয়ে তারা অনেক সময়ই সেসব নাড়িভুড়ি
এবং গবাদির বিষ্ঠা মাংসের সঙ্গে গ্রাইন্ডারে ছুড়ে
দেয়। অত্যন্ত দ্রুততার সাথে ঘটায় গড়ে ৬০টি
গবাদি প্রতিটি শ্রমিককে কেটে-ছেঁটে গ্রাইন্ডারে
ফেলতে হয়। এসময়ে মাংসের সঙ্গে আর কি কি
ঢুকে পড়ছে তা আর হিসেব করে দেখছে কে?

শ্রুসারের হিসেবে, কসাইখানার মাংসের সঙ্গে
আবর্জনা ও গবাদি পশুর বিষ্ঠা মিশিয়ে তৈরি কিমার
পরিমাণ ২০ শতাংশ। যদি একটি মাত্র গরু বা
মুরগী থেকে দূষিত পদার্থ গ্রাইন্ডারে ঢুকে পড়ে,
তাহলেও বিপুল পরিমাণ কিমা দূষিত হওয়ার
সম্ভাবনা রয়েছে। দলাইলমলাই হয়ে সে মাংস যখন
কিমা হয়ে বার্গার হিসেবে দোকানে হাজির হয়,
তখন তার কোন্টা দূষিত, কোন্টা স্বাভাবিক, সে
হিসেব নেয় কার সাধ্য? আমেরিকাতে বড় ধরনের
কোনো মিট প্রসেসিং প্ল্যান্টে দৈনিক কমপক্ষে ৮
লাখ পাউন্ড কিমা বানানো হয়। যদি একটি ই-কলি
জীবাণু আক্রান্ত গবাদির মাংসও সে কিমায় থাকে
তাহলেও অন্ততপক্ষে ৩২ হাজার পাউন্ড কিমা
ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

বিপদটা যে শুধু ফাস্টফুড শপে
বার্গার খেতে গেলেই ঘটবে, তা নয়। ফিটফাট
সুপার মার্কেট থেকে চমৎকার প্যাকেটে মোড়া গরু
বা মুরগীর কিমা ঘরে আনলেও বিপদ কিন্তু কম
নয়। দুটোই দূষিত। এসব দূষিত খাবার খেয়ে
আমেরিকায় দৈনিক ২ লাখ মানুষ রোগগ্রস্ত হচ্ছে।
হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে ৯ হাজার রোগী। এদের
মধ্যে দৈনিক মারা যাচ্ছে ১৪ জন। যারা অসুস্থ হচ্ছে
বা মারা যাচ্ছে তাদের একটা বড় অংশ হচ্ছে স্কুলের
ছেলে-মেয়ে।

ফাস্টফুড ক্ষতিকর এ কথা জানা সত্ত্বেও
সরকারিভাবে তা নিয়ন্ত্রণের কোনো উদ্যোগ নেয়া
হচ্ছে না। কেননা, আমেরিকাতে ফাস্টফুড ইন্ডাস্ট্রি
এখন এক বিশাল সাম্রাজ্য। মোট এক ডজন
বহুজাতিক করপোরেশন এ সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রক।
মোট ১৩টি মিট প্রসেসিং প্ল্যান্টে এ দেশের
সিংহভাগ মাংস কিমা প্রক্রিয়াজাত হয়। এ শিল্পের
সাথে অতি ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে এ দেশের
রাজনৈতিক ও সরকারি ব্যবস্থাপনার।

তাই জনগণের সচেতনতাই এই অস্বাস্থ্যকর
খাবারের উৎপাদন বন্ধ করতে পারে। ফাস্টফুড
আপনাকে খেতেই হবে এমন তো কোনো কথা
নেই। আপনি আমেরিকায় বা বাংলাদেশে—
যেখানেই থাকুন— ফাস্টফুড গ্রহণের অভ্যাস
বদলান। তাহলে দৈত্যের মতো সুবিশাল ফাস্টফুড
ইন্ডাস্ট্রিকে অস্বীকার করার শক্তি আপনি নিজেই
অর্জন করতে পারবেন।

[প্রথম আলো, ৭ মে, ২০০১ থেকে সংকলিত]

কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনের আখেরী দোয়ায়
স্রষ্টার কাছে প্রাণের আকুতি ভরা প্রার্থনা সবার :

‘এসেছি তোমার ইচ্ছায়, যাবো তোমার ইচ্ছায়, মধ্যবর্তী সময়টুকুও চলবো তোমার ইচ্ছায়’

“আমরা পৃথিবীতে নিজ ইচ্ছায় আসি নি। পৃথিবী থেকে চলে যাওয়াও আমাদের ইচ্ছায় হবে না। তাহলে মাঝখানের এ সময়টুকু আর কেন নিজ ইচ্ছায় চলতে গিয়ে দুঃখ এবং অশান্তিকে ডেকে আনবো?”

গত ৫ নভেম্বর সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনের আখেরী দোয়া অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে গুরুজীর একথাটিকে গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করেন হলভর্তি প্রায় ৭০০ মানুষ। তিনি আরও বলেন, কোরআনের জ্ঞান লাভ করা, এর মর্মবাণী অনুধাবন করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্যে ফরজ। আর এই মহাথহুের দিক-নির্দেশনার আলোকে জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্যে প্রয়োজন মুক্তমন নিয়ে কোরআনের মর্মার্থ অনুধাবন। এক্ষেত্রে আমাদের মূল বাধা হলো পারিপার্শ্বিক ভ্রান্ত ধারণা। এটি আমাদের মুক্তমন সৃষ্টি হতে দেয় না। যুক্তি-তর্ক মানুষকে বিভ্রান্তির পথে ঠেলে দেয়। মুক্তমন নিয়ে কোরআন অনুধাবনের চেষ্টা করলে প্রতিটি আয়াত নতুন উপলব্ধি নিয়ে আসতে পারে। আর মুক্তমন সৃষ্টি হয় তখনই যখন একজন মানুষ ধ্যানের স্তরে কোরআন শোনেন।

আত্মরুদ্ধি ও আত্মিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় কোরআনের মূল শিক্ষাকে অনুসরণের লক্ষ্যে ৬ষ্ঠ বারের মতো আয়োজিত হয়েছিলো কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনের বিশেষ কর্মসূচি। ধ্যানের স্তরে কোরআনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি ও অনুধাবনের এক অনন্য আয়োজন কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন। একটানা ৮ দিনে প্রতিদিন সাড়ে ৬ ঘণ্টা করে মোট ৪৫ ঘণ্টা ধ্যানের স্তরে পরিপূর্ণ মৌন অবস্থায় তরজমাসহ কোরআন তেলাওয়াত শোনার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় এই কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন। এবার ঢাকার মিরপুর ও উত্তরা শাখাসহ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট ও লামা সেন্টারে একযোগে অনুষ্ঠিত এ আয়োজনে মোট ৫ শতাধিক অংশগ্রহণকারী ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি।

ঢাকায় অনুষ্ঠিত খতমে কোরআনের দুটি ব্যাচেই অংশগ্রহণ করেন মিরপুরের বেগম শামসুন নাহার। তিনি বলেন, কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনে অংশ-গ্রহণ আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম অভিজ্ঞতা। এত দিন শুধু সওয়াবের আশায় কোরআন পড়ে গেছি। অর্থ পড়ার চেষ্টা করলেও তা কঠিন মনে হতো। কিন্তু ধ্যানের স্তরে কোরআন তেলাওয়াত ও তরজমা শুনে বুঝতে পারছি এর মর্মবাণী। জীবনের কথাই বলা হয়েছে কোরআনে। তাই শুধু পড়লেই হবে না, অর্থ বুঝে পড়ে দিক-নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করতে হবে। এখন থেকে প্রতিদিন কোরআনের ২/৩টি করে আয়াত অর্থসহ বুঝে পড়ে মানার চেষ্টা করবো।

প্রথম বারের মতো কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনে অংশ নিয়েছিলেন ১৭৮ ব্যাচের গ্রাজুয়েট তন্ময় আহমেদ। তিনি বলেন, ধ্যানের স্তরে কোরআনকে নতুনভাবে উপলব্ধি করেছি। আগে অত ভালোভাবে

কোরআন পড়ি নি বা বুঝি নি। কোয়ান্টায়নে অংশ নেয়ার ফলে কোরআন সম্পর্কে আরো জানার অগ্রহ বেড়েছে। কোরআনে সৃষ্টির সেবার কথা বলা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের সার্বিক কাজের সাথে কোরআনের নির্দেশনার মিল খুঁজে পেয়েছি। আখেরী দোয়া অনুষ্ঠানটি আমার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। এ অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। এভাবে যে আমি কাদতে পারি তা আমার ধারণায় ছিলো না। আমি আমার নিজের মাঝে বিলীন হয়ে গিয়েছিলাম।

গত বছর আমি বাসায় বসে একই ক্যাসেট শুনে কোরআন খতম করেছিলাম। কিন্তু কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনের সাথে আগের অনুভূতির আকাশ-পাতাল ব্যবধান। কোরআনকে এভাবে কখনও অনুভব করতে পারি নি। এ অনুভূতিকে ধরে রাখতে ও নিজের মধ্যে পরিবর্তন আনতে আখেরী দোয়া অনুষ্ঠানে যে নির্দেশনা পেয়েছি তা বেশ ফলপ্রসূ। আর তা হলো, প্রতিদিন কোরআনের ২/১টি বাণীর আলোকে নিজেকে পর্যালোচনা করা। আর এ কাজে ফাউন্ডেশন প্রকাশিত কণিকা সেট খুবই উপযোগী। এভাবে অনুভূতি ব্যক্ত করলেন ১৮০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট নিগার সুলতানা।

পারিপার্শ্বিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনে অংশ নিয়েছিলেন ১৮০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট গৃহিণী মিসেস নাজমুন নাহার। দোয়ার অনুষ্ঠান তার জীবনের একটি অন্যরকম প্রাপ্তি বলে তিনি জানান।

লামায় ধ্যানঘরে অনুষ্ঠিত খতমে কোরআন কোয়ান্টায়নে অংশ নিয়েছেন সিলেটের গ্রাজুয়েট তুহিন দাস টিটো। ধ্যানঘরে প্রথম বারের মতো অনুষ্ঠিত এ কোয়ান্টায়নে অংশগ্রহণ করাকে তিনি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, কোরআন সম্পর্কে জানার অগ্রহ আমার অনেক দিনের। লামায় প্রথম বারের মতো অনুষ্ঠিত কোয়ান্টায়নে অংশ নিতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি। পরিপূর্ণ মৌনতার মাঝে কোরআন শোনার ফলে এর আবেদনও ছিলো অন্য রকম। অনেক বিষয়ে আমি সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা পেয়েছি। সঠিকভাবে প্রার্থনা করার মতো অনেক আয়াত পেয়েছি। স্রষ্টায় সমর্পণ, মাতা-পিতার প্রতি কর্তব্য, নেতৃত্বের অনুসরণ, পরকালের পাথেয়, মিতব্যয়িতা, সম্পত্তির বন্টন, গীবত বর্জন, সঠিক আচরণসহ ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক জ্ঞান লাভ করেছি। আমি বিশ্বাস করি, নিজের ও মানবতার কল্যাণে এ জ্ঞান আজীবন পাথেয় যোগাবে।



সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত
আখেরী দোয়ায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

তিতুমির কলেজের অনার্সের ছাত্রী ১৭৫ ব্যাচের গ্রাজুয়েট রহিমা সুলতানা উত্তরা শাখায় অনুষ্ঠিত কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, এত দীর্ঘ সময়ব্যাপী কোরআন শোনায় কোনো ক্লান্তি লাগে নি। কোরআন সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা পেয়েছি। ধর্ম সম্পর্কে কেউ কোনো অবজ্ঞিত কথা বললে সেটা কোরআনের সাথে মিলিয়ে দেখছি।

কোয়ান্টায়নে অংশ নিয়েছিলেন কোয়ান্টাম পরিবারের বেশ কয়েকজন অ্যাসোসিয়েটও।

শিক্ষার্থী নুসরাত মাহবুব বলেন, কোয়ান্টায়নে অংশ নেয়ার ফলে কোরআনকে জানার তাগিদ বেড়েছে। কিন্তু কোরআনের বাণীকে হৃদয়ে ধরে রাখা ও অনুসরণ করার ক্ষেত্রে এক বছর অতি দীর্ঘ সময়। তাই শুধু রমজান মাসেই কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনের আয়োজন না করে বছরে দুবার আয়োজন করলে আমরা আরো উপকৃত হতে পারবো। কোয়ান্টাম অ্যাসোসিয়েট ডা. শামীমা আখতারও এবার কোয়ান্টায়নে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বলেন, কোয়ান্টায়নে অংশ নেয়ার ফলে নামাজে তার মনোযোগ অনেক বেড়েছে। কোরআনকে জানার আকুলতা ও সচেতনতা বেড়েছে। আগেও তিনি কোরআন খতম করেছেন। কিন্তু ধ্যানের স্তরে কোরআন শোনার মাধ্যমে কোরআনকে তিনি নতুনভাবে উপলব্ধি করেছেন।

আখেরী দোয়া অনুষ্ঠানে বিশেষ মেডিটেশনের আগে গুরুজী তার বক্তব্যে কোরআন থেকে উপকৃত হওয়ার সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। আর তা হলো, যে মহামানবের মাধ্যমে এ কোরআন প্রচারিত হয়েছিলো, তাঁর জীবন ছিলো এ কোরআনের নির্দেশাবলিরই পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তবায়ন, যা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, দার্শনিক বা মতবাদ প্রবক্তাদের জীবন দৃষ্টান্তে আমরা পাই না। এখানেই কোরআনের গ্রহণযোগ্যতার সবচেয়ে বড় যুক্তি। আবার পবিত্রতা লঙ্ঘন হবে মনে করে কোরআনকে সযত্নে গিলাফ মুড়ে রাখা আর কোরআনকে বুঝে সে আলোকে জীবনকে আলোকিত করা—এ দুইয়ের পার্থক্যও আমাদের কাছে স্পষ্ট হওয়া উচিত। কোরআনের সঠিক মর্যাদা দ্বিতীয় পন্থায়ই আদায় হয়, প্রথমটিতে নয়। সবশেষে গুরুজী আবারও বলেন, যে মহামানবকে স্রষ্টা তাঁর ‘বন্ধু’ বলে সম্বোধন করেছেন, তিনি নিজেকে বিবেচনা করেছেন ‘স্রষ্টার দাস’ হিসেবে। তাহলে সেখানে আমাদের কতটা বিনয়ী হওয়া উচিত তা সহজেই বুঝতে পারি। আর দুনিয়া এবং আখেরাতের সাফল্য নিহিত রয়েছে স্রষ্টার ইচ্ছাতে, নিজেকে সমর্পণ করার মধ্যেই।

□ সাইফুদ্দীন হাওলাদার

কোয়ান্টাম শিশুসদন ॥

আকিকা ও দোয়া অনুষ্ঠানে আনন্দমুখর রাজশাহী সেন্টার

গত ২৬ নভেম্বর, শুক্রবার রাজশাহী সেন্টারে অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম শিশুসদনের প্রথম পাঁচটি শিশুর আকিকা অনুষ্ঠানে অংশ নেন ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট এবং রাজশাহী ও এর আশেপাশের জেলাগুলো থেকে আগত ২৭০০ জন অতিথি। এদের মধ্যে বিভিন্ন সেন্টার ও শাখা-সেলের পরিচালকগণ, কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীলগণ যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন স্থানীয় কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট-অ্যাসোসিয়েটসহ সমাজের বিভিন্ন পেশার সর্বস্তরের মানুষ। তাদের স্বতঃস্ফূর্ত পদচারণায় সেদিন মুখরিত ছিলো কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন রাজশাহী সেন্টার।

অনুষ্ঠানে আগত বেশ কজন স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন। মিসেস সুলতানা শামীম ন্যাশনাল ব্যাংকের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার। ১৭০ ব্যাচের গ্রাজুয়েট। তার পরিবারের সবাই গ্রাজুয়েট। তিনি বলেন, শিশুসদনের এ কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা কিছুটা হলেও ধর্ম নির্দেশিত সৃষ্টির সেবার বিধান অনুসরণ করতে পারছি। এই এতিম শিশুদের সাহায্যের মাধ্যমে

ভিক্ষুককে দান করার চেয়েও বেশি পুণ্য আদায় করা সম্ভব মনে করি। কারণ এতিমদের যারা সাহায্য করে, তাদের ওপর স্রষ্টার সরাসরি অনুগ্রহ বর্ষিত হয়।

মিসেস শিরিনা হক একজন গৃহিণী। ১৮৭ ব্যাচের কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে যমজ দুছেলেকে নিয়ে কোর্স করেছেন। আকিকা অনুষ্ঠানে ছেলেদেরসহ নিয়ে এসেছেন তার বান্ধবী এবং বান্ধবীর ছেলেকেও। কারণ তিনি মনে করেন, তিনি যেভাবে ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে যথাসাধ্য ভালো কাজের সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরেছেন, তার প্রিয়জনরাও যেন একই সুযোগ পায়। তিনি আরও বলেন, ফাউন্ডেশন সুযোগ করে দিয়েছে বলেই এরকম ভাগ্যাহত শিশুদের অনন্য মানুষ হিসেবে গড়ার মহৎ কাজে শরীক হতে পেরেছি। নইলে আমাদের সীমিত সামর্থ্য দিয়ে কখনো এককভাবে এ ধরনের কাজ করতে পারতাম না।

কানিজ ফাতেমা তিতলী এইচ.এস.সি পরিক্ষার্থী। ১৮৭ ব্যাচের গ্রাজুয়েট। তিনি বলেন, একসময় এই শিশুরা হয়তো অভিভাবকহীন ছিলো। কিন্তু আজ এরা পুরো কোয়ান্টাম পরিবারের অভিভাবকত্ব পেয়েছে। ভাগ্যহীনতো নয়ই বরং এরা সৌভাগ্যবানদেরই অন্তর্ভুক্ত। আর এরা সবাই মেয়ে হওয়ায় আমার ভালো লাগাটো আরও বেশি।

তাসনীম রাক্বী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি বিভাগের ছাত্রী। তিনি বলেন, এত বিশাল আয়োজন, এত লোক সমাগম—এসবই খুব ভালো লাগছে। কোয়ান্টামের নিয়মিত অনুষ্ঠানের চেয়ে সম্পূর্ণ অন্যরকম আয়োজন। সুন্দর সাজ-পোশাক এবং সবার হাস্যোজ্জ্বল বিচরণ ঈদের দিনের আনন্দের কথাই মনে করিয়ে দিচ্ছে। গুরুজী-মা-জী এ উপলক্ষে রাজশাহীতে এসেছেন যা আনন্দের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

প্রফেসর জুলফিকার বানু, শেখ বোরহান উদ্দিন পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান। কোয়ান্টাম অ্যাসোসিয়েট হিসেবে তিনি ঢাকার যাত্রীদলের সঙ্গে এই আকিকা অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তিনি বলেন, শিশুসদন প্রতিষ্ঠা এবং এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের যারা উদ্যোক্তা, তারা নিঃসন্দেহে তাদের মহানুভবতার জন্যে প্রশংসার দাবিদার। মানুষকে সচেতন করতে পারলে নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামর্থ্যকে একত্র করেই যে এরকম কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা যায়, এখানে তার দৃষ্টান্ত পেলাম। এ



শিশুসদনের ভাগ্যবান পাঁচ শিশু— যাদের আকিকা সম্পন্ন হলো

অভিজ্ঞতা আমার ভবিষ্যত কর্ম পরিকল্পনায় কাজে লাগবে।

গৃহিণী রেশমা তার দুজন পরিচিতাকে নিয়ে এসেছিলেন এ অনুষ্ঠানে। মিসেস রেহানা এবং মিসেস রাহেলা রহমান। তারা দুজনই প্রথমবারের মতো এসেছেন ফাউন্ডেশনে। তারা বলেন, বাচ্চাদের কথা শুনেছি সবসময়। আজ অনেকক্ষণ ধরে দেখলাম। এখানে এসে, আপ্যায়নে অংশ নিয়ে খুব ভালো লাগছে। সুস্বাদু রান্না খেয়ে বরকতের অনুভূতি পেলাম। ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে সহযোগিতা করার ব্যাপারে আমরা এখন খুবই আগ্রহবোধ করছি।

লায়লা আরজুমান্দ রাজশাহী কলেজের পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্রী। তিনি বলেন, আমার সহপাঠীকে নিয়ে এসেছি। আমার মনে হয় অ্যাসোসিয়েটদের ব্যাপক অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে— এরকম অনুষ্ঠান আয়োজনের ফলে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রমে তাদের অংশগ্রহণের আগ্রহ বেড়ে যায়।

প্রফেসর মাহবুবা ইয়াসমীন রাজশাহীর একটি বেসরকারী কলেজের সহকারী অধ্যাপক। তিনি তার সহকর্মীদের নিয়ে এসেছেন এ অনুষ্ঠানে। তিনি বলেন, এত বিপুল সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণে আয়োজিত হচ্ছে এ অনুষ্ঠান, অথচ কোনো বিশৃঙ্খলা নেই, হটগোল নেই। এটা বিস্মিত হবার মতো একটি ব্যাপার।

এডভোকেট নাসরীন আক্তার মিতা বলেন, আজকের অনুষ্ঠানে কোয়ান্টাম অ্যাসোসিয়েট এবং অতিথি এসেছেন প্রচুর। যাদের অধিকাংশই সমাজের সচেতন শিক্ষিত অংশের প্রতিনিধিত্ব করছেন। ফলে আকিকা অনুষ্ঠানটি একটি উপলক্ষ হলেও এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে ফাউন্ডেশনের ভাবমূর্তির প্রতি।

ব্যাপক এ আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্যে রাজশাহী সেন্টারের প্রতিবেশী ও স্থানীয়রা আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেন। প্রায় ২৭০০ মানুষের আপ্যায়নের জন্যে নিজেদের বাড়ির ছাদ ও জমিতে ফেটি স্টেশন নির্মাণ এবং আলো ও পানি সরবরাহ করে সহযোগিতা করেন প্রতিবেশীরা।

স্থানীয় সিপাইপাড়া জামে মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা মো. শামসুদ্দীন মাজাহেরী শিশুসদন প্রতিষ্ঠা এবং এরকম অনুষ্ঠান আয়োজনের মহতী উদ্যোগের জন্যে ফাউন্ডেশনের প্রশংসা করেন। শিশুসদনের বাচ্চাদের কল্যাণ ও অনুষ্ঠানটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্যে পরম করুণাময়ের সাহায্য কামনা করে সিপাইপাড়া জামে মসজিদে জুমআ নামাজের পর ও পুলিশ লাইন জামে মসজিদে আসর নামাজের পর বিশেষভাবে দোয়া করা হয়।

□ রাবিয়া নাজরীন



আকিকা অনুষ্ঠানে গুরুজী ও মা-জীর সাথে সবাই দোয়ায়
শামিল হয়েছেন



সুস্বাদু খাবার গ্রহণে ব্যস্ত আকিকা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত
অতিথিদের একাংশ

প্রশ্ন : আমার আত্মীয় পরিমণ্ডলে সম্প্রতি যে বিয়েগুলো হয়েছে তা খুব ধুমধাম, হৈচৈ-এর মধ্য দিয়ে হয়েছে। বিষয়টি এমন যে, একটি বিয়ের জন্যে একাধিক ব্যয়বহুল অনুষ্ঠান এবং খরচের প্রতিযোগিতা করাটা যেন বাধ্যতামূলক। কিন্তু আমাদের এত আর্থিক সামর্থ্য নেই। তাহলে আমাদের কি হীনম্মন্যতায় ভোগা উচিত?

উত্তর : আপনাদের হীনম্মন্যতায় ভোগার কিছু নেই, বরং হীনম্মন্যতায় ভুগবে তারাই যারা এ ধরনের অপচয়ে লিপ্ত। কারণ বিয়ে জীবনের একটি সহজ, স্বাভাবিক ঘটনা। একটি স্বাভাবিক ঘটনাকে আকাশকুসুম মনে করা এবং এর জন্যে অপচয়ে মত্ত হওয়া অবদ্য ছাড়া আর কিছু নয়। বরং এই খরচ, ধুমধাড়া, অপচয় শুধু অকল্যাণই বয়ে আনে। যে বিয়েতে ধুমধাড়া-অপচয় যত বেশি, সে বিয়েতে সুখের পরিমাণ তত কম।

আসলে বিশ্ব পুঁজিবাদী চক্র নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থেই ভোজন, বিনোদন এবং জৈবিক চাহিদা পূরণকে জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রচার করতে মিডিয়াকে ব্যবহার করছে। এজন্যেই মিডিয়াতে বিয়েকে কাল্পনিক এক বিশাল ব্যাপার হিসেবে চিত্রিত করা হয়। যেমন ‘রাজা বানকে আনারে, মুঝে লেকে যানারে, ছম ছমাহম ছম’- বিয়ের প্রসঙ্গে হিন্দি সিনেমার এ গানটিতে যে উচ্ছ্বাস ও মোহময় কল্পনা ফুটে উঠেছে, বাস্তব জীবনেও তা-ই হবে এমন অলীক কল্পনা করতে গিয়েই বিয়ে সংক্রান্ত অবদ্য বা ভ্রান্ত ধারণায় আক্রান্ত হই আমরা। বিয়ের জন্যে খরচের প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠা তার মধ্যে প্রথম। একটি মাত্র বিয়ের জন্যে প্রচুর অর্থব্যয়ে একাধিক অনুষ্ঠান আয়োজনের পাশাপাশি পোশাক ও অলঙ্কার কেনাকাটা করতে গিয়ে হয় টাকার শ্রাদ্ধ। ঋণ করে হলেও বিয়ের এই ফুটানি করতে গিয়ে অনেক পরিবার দুর্দশায় নিপতিত হয়।

ইদানিং বিয়ের খরচে নতুন সংযোজন হলো হীরা। “হীরা চিরকালের”- এ জাতীয় বিজ্ঞাপন দিয়ে বহুজাতিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান হয়তো এটা বোঝাতে চায় যে, হীরা ছাড়া বিয়ে যেন সম্পূর্ণ হয় না এবং হীরা বিয়ের বন্ধনকে চিরস্থায়ী করে। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, যে সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য সমাজে ৫০ এর দশক থেকে বিয়েতে অপরিহার্য অনুযজ হলো হীরা, সেখানেই অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় বিয়ে বিচ্ছেদের হার এসময়ই সবচেয়ে বেশি। এস্ট্রোলজি গবেষণার একটি ফলাফল হচ্ছে, শতকরা ৯৯ ভাগ ক্ষেত্রে বিয়েতে হীরকের প্রভাব অশুভ। আর এর ব্যাখ্যা হলো, প্রতিটি পাথরের একটি দ্রব্যগুণ আছে যা একজন মানুষের মানসিকতার ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তেমনি হীরকের মনোদৈহিক প্রভাব হলো তা অহমকে বৃদ্ধি করে। যা পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও সমঝোতার মনোভাব- যা একটি সুখী বিয়ের জন্যে অপরিহার্য- তার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

আসলে বিয়ে একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনা যার মাধ্যমে দুজন নর-নারীর জৈবিক চাহিদা পূরণের ব্যাপারটিই সর্বজন গ্রহণযোগ্যতা পায়। একে মহিমাম্বিত করতে গিয়ে খরচের প্রতিযোগিতায় মত্ত হওয়া আহাম্মকিরই লক্ষণ।

প্রশ্ন : আমাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অধিকাংশ বিষয়ে মতের মিল থাকলেও কিছু কিছু বিষয়ে অমিলও রয়েছে। তবে সম্পর্ক সবচেয়ে খারাপ হয় তখন, যখন আমার স্ত্রীর মা-বাবা, বোনেরা এসব ব্যাপারে নাক গলান। কারণ এটা আমার খুবই অপছন্দ।

উত্তর : স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে তৃতীয় কাউকে জড়ানোর চেয়ে ক্ষতিকারক আর কিছু নেই। কারণ তৃতীয় কাউকে জড়ানো মানেই স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মূল ভিত্তি অর্থাৎ

অবদ্য সংক্রান্ত প্রশ্ন উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

বিয়ে একটি সাধারণ ও স্বাভাবিক ঘটনা যার মাধ্যমে দুজন নর-নারীর জৈবিক চাহিদা পূরণের ব্যাপারটিই সর্বজন গ্রহণযোগ্যতা পায়। একে মহিমাম্বিত করতে গিয়ে খরচের প্রতিযোগিতায় মত্ত হওয়া আহাম্মকিরই লক্ষণ।

পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের ভিত নড়বড়ে হওয়া। আর ভুল বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে বা স্ত্রী তার স্বামীকে যেভাবে বুঝতে পারেন বা সমস্যার মূলকে খতিয়ে দেখতে পারেন, অন্য কারো পক্ষে সেভাবে সম্ভব নয়। ফলে ভুল-বোঝাবুঝির নিরসন না হয়ে এতে বরং জটিলতা বাড়ে।

একসাথে থাকতে গেলে মতবিরোধ হতেই পারে। এ বিরোধ যদি ছোটখাটো বিষয় নিয়ে হয়, তাহলে নমনীয় হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। যেমন, আপনার স্ত্রী যদি বলেন, অমুক আসবাবটা এভাবে রাখতে হবে, তখন আপনার পছন্দ না হলেও আপনি তা মেনে নিন। কিন্তু বিরোধ যখন বড় কোনো বিষয় নিয়ে হয়, যেমন, আপনার স্ত্রী আপনাকে বললো কাউকে খুন করতে বা ঘৃষ খেতে, তখন তা আর মতপার্থক্য নয়, তা হলো চৈতন্যগত পার্থক্য। চৈতন্য ব্যাপারে ছাড় দেয়া যায় না, কিন্তু ছোটখাটো ব্যাপারে ছাড় দেয়াই উত্তম।

আর পার্থক্যের বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলতে হলে সবচেয়ে ভালো হলো সরাসরি কথা বলা এবং তা হওয়া উচিত নেতিবাচক আবেগে মন তিক্ত হওয়ার আগেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। অবশ্য বলাটা হতে হবে সহজভাবে, মিষ্টতার সাথে, প্রজ্ঞার সাথে এবং স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করে। এক্ষেত্রে ততটুকু সময়ই অপেক্ষা করা যেতে পারে যতটুকু সময়ে অপর পক্ষ গামা লেভেল থেকে আলফা লেভেলে আসবে। এর বেশি নয়।

আর এই সরাসরি কথা বলা শুধু স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রেই নয়, অন্য যে-কোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যখনই সরাসরি কথা বলা হয়, তখনই অহেতুক জটিলতা সৃষ্টির আগেই সম্পর্ক সহজ-স্বাভাবিক হয়।

প্রশ্ন : আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। আমার মেয়ে বন্ধু যেমন আছে তেমনি ছেলের বন্ধুও আছে। তারা আমার সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। শুধু আমার নয়, অন্য মেয়েবন্ধুদেরও সাহায্য করে। তাহলে তারা কি আমার বন্ধু নয়?

উত্তর : ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বিপরীত লিঙ্গের মধ্যে বন্ধুত্বের ব্যাপারে অগ্রহ সৃষ্টির কারণ মিডিয়ার প্রভাব। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ বিপরীত। গত ৫০ বছরে ইউরোপ, আমেরিকার সমাজবিজ্ঞানীদের শত শত গবেষণার ফলাফল এ তথ্য। বন্ধুত্বের নামে গুরু হয়, এক সময় তা প্রেম বা কামের ফসল হিসেবে দৈহিক সম্পর্কে গড়ায়।

সাধারণভাবে মেয়েরা যেহেতু সহজ-সরল, ছেলেরা বন্ধুত্বের টোপ ফেলে তাকে পটাত থাকে। যে মেয়ে এরকম ফাঁদে পড়েছে, তাকেই কাদতে হয়েছে। কারণ দু-চারজন বান্দে আমাদের দেশের মেয়েরা বিবাহ বহির্ভূত দৈহিক সম্পর্কে এখনো সেভাবে অভ্যস্ত নয়। তাই কেউ সহযোগিতা করলেই সে বন্ধু হয়ে যায় না। নিঃস্বার্থ বন্ধু বা সহযোগী পাওয়া এত সহজ নয়।

যারা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরিয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে সহযোগিতা কর্মজীবনে কতটা থাকে। বন্ধুকে চাকরির ইন্টারভিউয়ের কথা বলে নি যাতে প্রতিযোগী কম হয়। এক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ার সময় বাবা মারা যান। সংসারের পুরো দায়িত্ব পড়ে তার ওপর। একটি প্রতিষ্ঠানে চাকরি নেয়। বন্ধুরা ক্লাসে তার প্রস্তুতি দিয়ে দিতে। পরবর্তী ৪ বছরের মধ্যে তার পদোন্নতি হলো। এর মধ্যে যে বন্ধু সহযোগিতা করতো, সে-ও একই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করলো। কিন্তু সুযোগ-সুবিধা-পদবী তার বন্ধুর চেয়ে কম হওয়ায় চাকরি ছেড়ে দিলো। তার মনে হয়েছিলো এরকম অপমানের চাকরি করার চেয়ে ঘরে শুয়ে থাকাও অনেক ভালো।

মেয়েরা একটু হাসি দিলেই দশজন ছেলে সেবা করার জন্যে এক পায়ে খাড়া হয়ে যায়। নোট যোগাড় করা, ফটোকপি করে দেয়ার জন্যে মেয়েরাও অনেক সময় ছেলের সাথে সম্পর্ক রাখে। ক্লাস টেন-এর এক ছাত্র নিজে এস.এস.সি পরীক্ষা দেয় নি। কিন্তু তার প্রেমিকার জন্যে রাত জেগে নোট করে দিয়েছে। সেই নোট পড়ে প্রেমিকা A+ পেয়ে গেছে। ছেলেরদের এরকম সহযোগিতা দেখলে বুঝতে হবে নিশ্চয়ই কোনো স্বার্থ আছে। সুযোগ পেলে আসল রূপ দেখাবে।

ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, সহপাঠীর সাথে সহজ সুসম্পর্ক থাকবে। সুসম্পর্ক মানে প্রেম বা বন্ধুত্ব নয়।

প্রশ্ন : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে আজকাল সহপাঠী বা বিভিন্ন ক্লাসের শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্কে জড়ানোর প্রবণতা খুব বেশি। ভালো রেজাল্‌থারীরাও এর বাইরে নয়। যা দেখে অন্যরা বিভ্রান্ত হয়।

উত্তর : যে ভালো রেজাল্‌থারীদের প্রেম করতে দেখে অন্যরা বিভ্রান্ত হয় তারা আসলে প্রেম করে না। প্রেমের নামে কিছু ঘোরামুরি, ফুর্তি করে। আর যেটাকে প্রেম বলা হচ্ছে, তা-ও আসলে প্রেম নয়, কাম। কারণ বিপরীত লিঙ্গের মধ্যকার এ আকর্ষণের কারণ জৈবিক ও রাসায়নিক। ছেলে ও মেয়ের দেহের বিশেষ রাসায়নিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং এ থেকে সৃষ্ট গন্ধই একে অপরের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করে। একেক জনের গন্ধের ধরন যে আলাদা তার একটি বাস্তব উদাহরণ হলো- গন্ধ গুঁকে কুকুরের অপরাধীকে শনাক্ত করা। একইভাবে কেউ যখন বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হয় তখন তার প্রেমিক/প্রেমিকার শরীরের বিশেষ গন্ধই তাকে প্রভাবিত করে, তার মেজাজকে বদলে দেয়। কিছু সময় সে হারিয়ে যায়। ফলে দেখা যায়, প্রেমিক-প্রেমিকা যখন মিলিত হয়, তখন সময়ের কোনো হিসেব তাদের থাকে না।

এমনকি যখন আলাদা হয়, তখনও এই স্মৃতি, এই মোহাচ্ছন্নতা থেকে সে মুক্ত থাকতে পারে না। আর এ কারণেই শিক্ষার্থী জীবনে এটি এত ধ্বংসাত্মক। কারণ শিক্ষার্থীর মনোযোগ, সময় কোনো কিছুর ওপরই আর তার নিয়ন্ত্রণ থাকে না।

১৫ থেকে ২২ বছর বয়সটা এমন যখন পৃথিবীর সবকিছুই ভালো লাগে। একটি নেড়ি কুকুর হেঁটে গেলেও মনে হয়, আহা! কত সুন্দর। আর সে জন্যেই এ বয়সেই কিশোর-কিশোরী বা তরুণ-তরুণীদের প্রেমে পড়ার প্রবণতা বেশি হয়। কিন্তু যখন বয়স আরেকটু বাড়তে থাকে, বাস্তবতার মুখোমুখি হতে শুরু করে, তখনই মোহমুক্তি ঘটতে থাকে।

চট্টগ্রাম সেন্টার

খতমে কোরআন

গত ২৩ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর ৭৩ জন সদস্যের উপস্থিতিতে সেন্টারে নবম বারের মতো কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন এবং ২৯ অক্টোবর, শুক্রবার ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় চট্টগ্রাম সেন্টারের সেমিনার হলে। ইফতার মাহফিলে প্রধান অতিথি মওলানা ডা. মাজেদুর রহমান কোরআনের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন এবং আখেরী মোনাজাত পরিচালনা করেন।

পাঁচ দিনব্যাপী কোয়ান্টায়ন

সেন্টারের সেমিনার হলে গত ১৭ অক্টোবর থেকে পাঁচ দিনব্যাপী কোয়ান্টায়ন পূর্বে মেধায়ন, সাফল্যায়ন ও লেখায়ন অনুষ্ঠিত হয়। কোয়ান্টায়ন গুরুর আগে অর্গানাইজার মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন অংশগ্রহণকারীদের মাঝে কোয়ান্টায়নের সুফল নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটির সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন জনাব মোহাম্মদ সেকান্দার।

নবীন বরণ

গত ১৩ অক্টোবর সেন্টারের সেমিনার হলে ১৯১ ব্যাচের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়। অর্গানাইজার মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেনের পরিচালনায় নতুন ৫৫ জন সদস্যসহ প্রায় একশো সদস্যের উপস্থিতিতে উক্ত অনুষ্ঠানে বিভিন্ন আলোচনা ছাড়াও নবীনদের অনুভূতি বর্ণনা, স্টার সাইকির পুরস্কার বিতরণ ও র‍্যাফেল ড্র অনুষ্ঠিত হয়।

মহিলা সেলে আলোচনা সভা

গত ৯ অক্টোবর মহিলা সেলে এক আলোচনা সভায় পারিবারিক মেডিটেশনের গুরুত্ব এবং যাকাত বিষয়ক আলোচনা করেন রেজোয়ান আরা বেগম, শওকত আরা বেগম ও অর্গানাইজার জনাব মোহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন। ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সৈয়দা আমোনা বেগম।

লামা সেন্টার

ধ্যানঘরে খতমে কোরআন

লামাস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন রিসার্চে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হয়েছিলো কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন। ২২ অক্টোবর থেকে ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত ধ্যানঘরে অনুষ্ঠিত এ কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনে ৩৮ জন অংশগ্রহণ করেন।



ধ্যানঘরে খতমে কোরআনের আখেরী দোয়া পরিচালনা করছেন মওলানা ছায়ীদুল হক

ফাউন্ডেশন সংবাদ

রাজশাহী সেন্টার

ইফতার মাহফিল ও আখেরী দোয়া

গত ৩০ অক্টোবর, শনিবার রাজশাহীর ইয়াংকিং কমিউনিটি সেন্টারে ২৩০ জন কোয়ান্টাম থ্রাজুয়েট ও অ্যাসোসিয়েটের অংশগ্রহণে ইফতার মাহফিল ও কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআনের আখেরী দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল মওলানা ছায়ীদুল হক আখেরী দোয়া পরিচালনাসহ কোরআন ও নামাজের মৌলিক শিক্ষা এবং ইসলামে যাকাতের বিধান সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

সিলেট সেন্টার

ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান

গত ১৯ নভেম্বর, শুক্রবার সেন্টারে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এ উপলক্ষে ৭১ জন থ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার ও অ্যাসোসিয়েট জাস্টেড হলিডে রিসর্ট, জাফলং ও শ্রীপুর এলাকা ভ্রমণ করেন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, ভ্রমণ ও যৌথ মেডিটেশনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় এ আনন্দঘন অনুষ্ঠান।



শ্রীপুর পাহাড়ে প্রকৃতির সাথে একাত্মতার মেডিটেশনে নিমগ্ন সবাই

সুনামগঞ্জ সেল

খতমে কোরআন ও ইফতার মাহফিল

ধ্যানের স্তরে কোরআন শোনা ও উপলব্ধির লক্ষ্যে সুনামগঞ্জ সেলে গত ২৩ অক্টোবর থেকে ৩ নভেম্বর ১২ জন থ্রাজুয়েট ও প্রো-মাস্টারের অংশগ্রহণে সম্পন্ন হয় কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন। এছাড়াও বিপুল সংখ্যক থ্রাজুয়েট, প্রো-মাস্টার ও অ্যাসোসিয়েটের অংশগ্রহণে ৩ নভেম্বর বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় ইফতার মাহফিল।

যশোর সেল

ত্রাণ কার্যক্রম

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন যশোর সেলের উদ্যোগে যশোরের কেশবপুর উপজেলার বন্যাদুর্গত বিভিন্ন এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করা হয়। সেলের পরিচালক খোন্দকার সামসুজ্জামান সুজাসহ থ্রাজুয়েট ও অ্যাসোসিয়েটবৃন্দ ত্রাণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন।



পানিবন্দি মানুষের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দিচ্ছেন যশোরের প্রো-কোয়ান্টায়নারা

ইফতার মাহফিল ও আখেরী দোয়া

যশোর সেলে ১৮ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর কোয়ান্টায়নে খতমে কোরআন এবং ১ নভেম্বর আখেরী দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। আখেরী দোয়া অনুষ্ঠানে কোরআন চর্চার গুরুত্ব ও রমজানের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় দায়িত্বশীল মওলানা ছায়ীদুল হক এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন সেলের পরিচালক খোন্দকার সামসুজ্জামান সুজা।

গেণ্ডারিয়া শাখায় ইফতার মাহফিল

গত ৭ নভেম্বর বিকেলে গেণ্ডারিয়া শাখায় ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়। থ্রাজুয়েট ও অ্যাসোসিয়েটসহ ৩৪ জন এতে অংশগ্রহণ করেন।

মতিঝিল শাখায় ইফতার মাহফিল

গত ২০ অক্টোবর বিকেলে মতিঝিল শাখার উদ্যোগে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে যাকাত ও মাটির ব্যাংক বিষয়ে আলোচনা করেন যথাক্রমে বেগম

খাদিজা মাহতাব ও জনাব মাহবুবুল আলম এবং দোয়া পরিচালনা করেন কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ। অনুষ্ঠানে থ্রাজুয়েট ও অ্যাসোসিয়েটসহ ১১০ জন অংশগ্রহণ করেন।

মগবাজার শাখায় ইফতার মাহফিল

গত ২০ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার মগবাজার শাখায় ৫০ জন সদস্যের অংশগ্রহণে ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে মওলানা ছায়ীদুল হক যাকাত ও রমজানের তাৎপর্য বিষয়ে আলোচনা ও দোয়া পরিচালনা করেন।

মাসিক মুক্ত আলোচনায় স্বামী হিরাআনন্দজী মহারাজ

আত্মশুদ্ধি ও সৃষ্টির সেবাই পরম আনন্দের উৎস

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন একজন উদার হৃদয় বিনয়ী ও পরমতসহিষ্ণু মহাপুরুষ। যিনি বলেছেন, “যত মত, তত পথ” অর্থাৎ মতামত যত প্রকার হোক না কেন, তার লক্ষ্য একই। তিনি আরও বলেছেন, ধর্মজগতে উপায় বিভিন্ন হতে পারে, কিন্তু উদ্দেশ্য এক। যারা ধার্মিক তাদের যেমন তিনি ভালবাসতেন, তেমনি যারা ধার্মিক নয়, তাদেরও তিনি ঘৃণা করতেন না। স্রষ্টার রূপ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীদের

বিরোধের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, একটি পূর্ণ সত্যের অংশ বিশেষকে যখন একমাত্র সত্য বলে দাবি করে আমরা চরমপন্থী হই, তখনই এ বিরোধ ঘটে। অথচ স্রষ্টার অনন্তরূপের অসীমতাকে স্বীকার করে নিলেই আর এ বিরোধ থাকে না।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার, কাকরাইলস্থ কোয়ান্টাম মেডিটেশন হলে ‘শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষা’ বিষয়ক



মাননীয় অতিথি স্বামী হিরাআনন্দজী মহারাজকে শুভেচ্ছা উপহার দিচ্ছেন গুরুজী ও ড. পরেশচন্দ্র মণ্ডল

মাসিক মুক্ত আলোচনায় এ কথা বলেন প্রধান অতিথি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিনিধি হিসেবে আমন্ত্রিত স্বামী হিরাআনন্দজী মহারাজ। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও শিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মেছিলেন ১৮৩৬ সালের

১৮ ফেব্রুয়ারী পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে। সৎ এবং পুণ্যবান বাবা-মায়ের সন্তান হিসেবে তিনি বেড়ে ওঠেন। মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে রাজি হন নি বলে তার বাবাকে পরিবার-পরিজনসহ কামারপুকুর গ্রাম ছেড়ে ভিন্ন গ্রামে নির্বাসনে যেতে হয়।

মমতা ও সেবার বাণী প্রচার করেছেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নিচ নির্বিশেষে সবার প্রতি একই মমতা ও মর্যাদার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেছেন তিনি। তেমনি তিনি বলেছেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। তাই তার যোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ গুরু রামকৃষ্ণের নামে যে সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা করেন সেই রামকৃষ্ণ মিশন মানুষের ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বাণী প্রচারের পাশাপাশি সৃষ্টির সেবার কাজেও সদা তৎপর।

একবার এক জমিদারের সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে যাওয়ার সময় তিনি দেখলেন এক গ্রামের লোকদের খাবার নেই। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাদের সাথে বসে পড়লেন এবং জমিদারকে বললেন, এদের অনু-বস্ত্রের ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত তিনি তীর্থে যাবেন না। অতএব জমিদার বাধ্য হলেন সে ব্যবস্থা নিতে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন একজন একনিষ্ঠ সাধক। স্রষ্টাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তিনি বিভিন্ন সাধনায় নিমগ্ন হয়েছেন। কোনো সাধনার উপলব্ধিতে



মাসিক মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখছেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বামী হিরাআনন্দজী মহারাজ

পৌছতেই তার সময় লাগতো না। তিনি যদিও প্রচলিত শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু ব্যাকুলতা এবং বিশুদ্ধ হৃদয়ের শক্তি দিয়ে তিনি পৌছতে পারতেন যে কোনো সাধনার নির্যাস গ্রহণের ক্ষমতায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, সংসার, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-পরিজন সবই আছে। কিন্তু এই বাইরের জগতের পরও যে অন্তর্জগত আছে, যে আত্মা আছে, সে আত্মার উন্নতির জন্যে যদি কিছু করা না হয়, তাহলে সবই শূন্য। আর তা সম্ভব ধ্যানের স্তরে পরমসত্ত্বার উপলব্ধির মাধ্যমে এবং সে উপলব্ধি যার এসেছে তিনিই পেয়েছেন অনন্ত আনন্দের সন্ধান।

□ রাবিয়া নাজরীন

ঈদ মোলাকাতের আনন্দে শামিল সবাই

কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের জন্যে ঈদের দিনটি সবসময়ই একটু বেশি আনন্দঘন। কারণ গুরুজীর সাথে সপরিবারে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগ নিয়ে আসে এ দিনটি। বরাবরের মতো এবারও গত ১৫ নভেম্বর পবিত্র ঈদুল ফিতরের দিন বিশেষ ঈদ



ঈদ মোলাকাতের সাংবাদিক কাজী রওনাক হোসেনের সঙ্গে কোলাকুলি করছেন গুরুজী

মোলাকাত উপলক্ষে মুখরিত হয়ে ওঠে গুরুজীর চামেলীবাগস্থ বাসভবনের সুপারিসর হলরুমটি।

ঈদের নামাজের পর সকাল ১০টা থেকেই থাজুয়েটার তাদের পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-বন্ধুদের নিয়ে দলে দলে আসতে থাকেন এবং বেলা ১টা পর্যন্ত প্রায় ১২ শতাধিক নারী-পুরুষ অংশগ্রহণ করেন এ প্রোথামে। গুরুজী ও মা'জী সবাইকে অভ্যর্থনা জানান ও সবার সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। শাখা ও সেলের পরিচালকগণ গুরুজী ও মা'জীর সাথে নতুনদের পরিচয় করিয়ে দেন। গুরুজীর সাথে কোলাকুলি করার সুযোগ কেউ-ই হাতছাড়া করতে চান নি। আর এ কোলাকুলি থেকে বাদ যায় নি শিশুরাও। তাদের চাঞ্চল্যে ভরপুর ছিলো পুরো অনুষ্ঠানটি। আপ্যায়ন পূর্বে ছিলো সুস্বাদু মোরগ পোলাও ও জর্দার পরিবেশনা।

ঈদে সাম্যের বাণী ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে পূর্ণতা এনে দিয়েছে এ অনুষ্ঠানে সব ধর্মাবলম্বীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি। নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর-বৃদ্ধ— সব বয়সের, সব বর্ণের, সব ধর্মের মানুষের উপস্থিতির এ যেন এক মিলন মেলা। সবার চোখ-মুখ থেকে অকৃত্রিম খুশি উপচে পড়ছিলো। উপস্থিত সবাই নিজেদের মধ্যেও ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করছিলেন। চমৎকার আনন্দঘন কিছু মুহূর্তের স্মৃতি নিয়ে এবং আগামী ঈদে আবারও এ মিলন মেলায় শরীক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে

সবাই ফিরে যান যার যার গন্তব্যে।

□ নাজমুন নাহার

কর্মজীবনে মেডিটেশন বিষয়ে আলোচনা

গত ১৮ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার মৌসুমী ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের উদ্যোগে ঢাকার একটি কমিউনিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় কিউট শীতকালীন বিক্রয় সম্মেলন। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রায় দুশতাধিক বিক্রয়কর্মীর অংশগ্রহণে দিনব্যাপী এ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন কোয়ান্টাম বুলেটিন সম্পাদক ও মৌসুমী ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ। অনুষ্ঠানে ‘কর্মক্ষেত্রে সফলতা লাভে মেডিটেশনের গুরুত্ব’ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন কোয়ান্টাম বুলেটিনের সহ-সম্পাদক রাবিয়া নাজরীন এবং ‘তরুণ বয়সে রক্তদানের গুরুত্ব’ সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট রক্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. মুন্সী হাবীবুল্লাহ। এ উপলক্ষে আয়োজিত রাড ক্যাম্পে প্রতিষ্ঠানের অর্থস্বার্থক কর্মী রক্তদান করেন।



বক্তব্য রাখছেন জনাব কাজী মাহতাব উদ্দিন আহমদ (মাঝে)। পাশে রাবিয়া নাজরীন ও ডা. মুন্সী এম. হাবীবুল্লাহ